নিশঙ্ক জীবনের গল্প
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর
জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস
নাঙ্গা তলোয়ার
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
জীবনভিত্তিক উপন্যাস

(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
জীবনভিত্তিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড একত্রে)

মূলঃ
এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদঃ
মাওলানা আলমগীর হোসাইন
উস্তাদ ঃ জামিয়াতুস সুন্নাহ
শিবচর, মাদারীপুর

IBF
ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন
(মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধভাবে ইসলামকে সর্বস্তরে পৌঁছানোর একটি প্রয়াস)
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ০১৯১৫৫২৭২২৫, ০১৮১৯৪২৩৩২১

প্রকাশক: কে এম জসিম উদ্দিন
প্রকাশকাল: আগস্ট – ২০০৯
রমাদান – ১৪৩০
প্রচ্ছদ: আমিনুল ইসলাম আমিন
শিল্পায়ন আর্ট গ্যালারী, ঢাকা
মুদ্রণ: মাসুম আর্ট প্রেস, ৩৬, শ্রীশদাশ লেন, ঢাকা

ISBN - ৯৮৪ - ৩২ - ১৮১৮ - ৩

মূল্য ঃ ২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা) মাত্র
U.S. $. 4 only.

পরিবেশক
আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫

উৎসর্গ

তাঁদের প্রতি
যাঁদের সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়,
ইসলামের সত্যবাণী
উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্বময়।

ভূমিকা

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) ইসলামের ঐ তলোয়ারের নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'সাইফুল্লাহ্' – 'আল্লাহর তরবারী'– উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি নাম করা ঐ সকল সেনাপতি সাহাবীদের অন্যতম যাঁদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌঁছতে পেরেছে। শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়; বিশ্ব সমরেতিহাসও হযরত খালিদ (রা)-কে শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের কাতারে গণ্য করে থাকে। প্রখ্যাত সমরবিদ, অভিজ্ঞ রণকুশলী এবং স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর রণকৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব এবং বিচক্ষণতার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রতিটি রণাঙ্গণে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোম সম্রাট এবং তার মিত্র গোত্রসমূহের সৈন্য ছিল ৪০ হাজারের মত। শত্রুর সৈন্য সারি সুদূর ১২ মাইল প্রলম্বিত, এর মধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল না। অপরদিকে, মুসলমানরা (শত্রুবাহিনীর দেখাদেখি) নিজেদের সৈন্যদের ১১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তাও প্রতি দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

শত্রুসৈন্যের বিন্যস্ত সারিও বৃহদাকার ছিল। সৈন্যরা একের পর এক সাজানো ছিল। একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানো। যেন একটি প্রাচীরের পিছনে আরেক প্রাচীর খাঁড়া। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য বিন্যাসের গভীরতা ছিল না বললেই চলে।

ইতিহাস মূক। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা– ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) যে সফল রণ-কৌশল অবলম্বণ করেছিলেনতা আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে তা ট্রেনিং দেয়া হয়।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশী হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে। এমন ঘটনাও তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে ঘটেছে যে, তিনি সরকারী নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এছাড়া হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। যে কোন পাঠক শ্রোতাই তাতে চমৎকৃত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি এতটুকু বিচলিত কিংবা ভগ্নাহত হননি। খলিফার নির্দেশের সাথে সাথে সেনাপতির আসন থেকে নেমে গেছেন সাধারণ

সৈনিকের কাতারে। সেনাপতি থাকা অবস্থায় যেমন শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সৈনিক অবস্থায় তার থেকে মোটেও কম করেননি। ইয়ারমুক যুদ্ধশেষে হযরত ওমর (রা) এক অভিযোগে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে মদীনায় তলব করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতির সাথে 'অসেনাপতিসুলভ' আচরণ করলেও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর প্রতিক্রিয়া এমন শান্ত ছিল যে, হযরত উমর (রা)-কে এর জন্য একটুও চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি অবনত মস্তকে খলিফার নির্দেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেন। প্রদত্ত শাস্তি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-বরখাস্তের দরুণ দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু তাই বলে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি টুশব্দটি করেননি। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কল্পনাও মাথায় আনেননি। নিজস্ব বাহিনী তৈরী করেননি। পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। তিনি এমন কিছু করতে চাইলে পুরো সেনাবাহিনী থাকত তাঁর পক্ষে। জাতির চোখে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতোমধ্যে দু'টি বিশাল সমরশক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এক ছিল পরাক্রমশালী ইরানী শক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপর পরাক্রমশালী রোম শক্তি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) তাদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি খলিফার সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়ান না। তিনি নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে মাননীয় খলিফার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর পরিচয়, ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান এবং বর্তমান মুসলমানরা তাঁর থেকে কি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে—বক্ষমান উপন্যাসে পাঠক তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।) মাঝে মাঝে এমন স্থানে এসে হোচট খেয়েছি যে, কোন্‌টা বাস্তবভিত্তিক আর কোন্‌টা ধারণা নির্ভর—তা শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। এ কারণে মতান্তর ঘটবে; আর তা ঘটাই স্বাভাবিক। তবে এ মতবিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ ঘটনায় গিয়ে প্রকাশিত হবে মাত্র।

যে ধাঁচে এ বীরত্ব-গাঁথা রচিত, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বললে বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী ভরপুর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে 'ঐতিহাসিকতার পথ্য' গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত ঝাণ্ডা। পূর্বপুরুষের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্যরস উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারের প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্যজাত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান

প্রকাশকের মিনতি

╠► সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি এটি আমাদের একটি আনন্দঘন আয়োজন। মজাদার পরিবেশনা। ইতিহাসের উপাদান, সাহিত্যের ভাষা আর উপন্যাসের চাটনিতে ভরপুর এর প্রতিটি ছত্র। শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী ঝরঝরে বর্ণনা আর রুচিশীল উপস্থাপনার অপূর্ব সমন্বয় আপনার হাতের এই *নাঙ্গা তলোয়ার*।

╠► পাঠক অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। লাভ করবেন অনাবিল আনন্দ। তুলবেন তৃপ্তির ঢেকুর। নাঙ্গা তলোয়ারের ১ম ও ২য় খণ্ডের আত্মপ্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমরা এ ব্যাপারে গভীর আশাবাদী।

╠► *শমশীরে বে-নিয়াম*-এর ভাষান্তর *নাঙ্গা তলোয়ার*, মূল লেখক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ। পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই লেখকের সাথে বাংলাদেশের পাঠকবৃন্দকে নতুন করে পরিচয় করানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ইতোমধ্যে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত হাতের একাধিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলার জনগণ এমন ঔপন্যাসিক পেয়ে বড়ই গর্বিত এবং আনন্দিত। এর জলন্ত প্রমাণ হলো – তাঁর কোন উপন্যাস ছেপে বাজারে আসতে দেরী, ছাপা ফুরাতে দেরী না।

╠► এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ-এর এমনি একটি অনবদ্য উপন্যাস *শমশীরে বে-নিয়াম* যা এখন বাংলায় অনূদিত হয়ে *নাঙ্গা তলোয়ার* নামে আপনার হাতে।

╠► সবটুকু মেধা, যোগ্যতা, অধ্যাবসায় সেঁচে পাঠকের রুচিসম্মত মুক্তা-মানিক্য উপহার দিতে আমরা একটুও কার্পণ্য করিনি। ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে যাবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছি। পাঠক এ গ্রন্থ হতে জানতে পারবে মর্দে মুজাহিদ সাহাবী (রা)দের ঈমানদীপ্ত চেতনা, হযরত খালিদ (রা)-এর দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বগাঁথা। এবং লাভ করবেন মুসলিম মানসের দৃঢ়চেতা মনোবল। পাঠক সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে। অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য পাবে বাস্তবতা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

সূচিবিন্যাস

পৃষ্ঠাঙ্ক

॥ এক ॥

সুন্দর-সুরম্য নগরী তায়েফ। বাগিচাঘেরা লোকালয়। সবুজ-শ্যামলিমায় ভরপুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক। ফুরফুরে শীতল স্নিগ্ধ বায়ুরা মর্মর আওয়াজ তুলে সর্বদা সেখানে নেচে বেড়ায়। সুকণ্ঠ পাখিরা শিস দিয়ে যায়। ইথারে-পাথারে কম্পন জাগে। আকর্ষণীয় ও মোহময় হয়ে ওঠে পরিবেশ। কলোলিত এবং মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

সারি সারি কাঁদি ঝুলানো খর্জুর বিথীকায়। থোকা থোকা সুস্বাদু আঙ্গুর মাচায় মাচায়। ফুলের সৌরভ আর ফলের ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ। ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকারা উল্লাসে গুঞ্জরিত। বাতাসে বাতাসে ফুল-ফলের আকুল করা কাঁচা ঘ্রাণ। আকাশের পাখিরা উড়ার পথে এখানে এসে থমকে দাঁড়ায়। ব্যস্ত মুসাফিরের দৃষ্টিও এখানে এসে ক্ষণিকের জন্য আটকে যায়। কলোলিত মুকুলিত মুখরিত এই উদ্যানে এলে চরম দুঃখীও তার দুঃখ ভুলে যায়। বিরহী হৃদয়ে সান্ত্বনা পায়। বিধবা চোখে আলো দেখে। ইয়াতীমের মুখে হাসি ফোটে। হতাশা দূর হয়। বিষাদিত হৃদয়ে হর্ষের তরঙ্গ ওঠে। অশ্রুসজল চোখের পাতায় আনন্দধারা খেলা করে। মলিন ঠোঁটে জাগে হাসির আভা। চেহারার কালো আবরণ দূর হয়ে প্রফুল্লতা ঝিকমিক করে।

তৎকালে তায়েফ ছিল ভূ-স্বর্গ। মরুভূমির শোভা। চারদিকে অথৈ বালুর পাহাড় আর সারি সারি টিলা অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তায়েফ যেন কণ্ঠাহারের লকেট। এই ভূস্বর্গটি আরবের বিখ্যাত যুদ্ধবাজদের দখলে ছিল। এখানেই ছিল দুর্ধর্ষ ছাকীফ গোত্রের হেডকোয়ার্টার। বসতির কাছেই ছিল গোত্রীয় উপাসনালয়। বনু ছাকীফ, হাওয়াযিন সহ আরো কয়েকটি গোত্রের দেবতা 'লাত'-এর মূর্তি এখানে স্থাপিত ছিল। এটা মূলত কোন আকৃতিগত প্রতীমা ছিল না; বরং একটি প্রশস্ত চত্বর ছিল মাত্র। মানুষ এ প্রান্তরের চত্বরকেই দেবতা মনে করে তার পূজা-অর্চনা করত।

উপাসনালয়ে অত্র এলাকার সন্ন্যাসীও থাকত। মানুষ তাকে খোদা এবং দেবতা 'লাত'-এর দূত মনে করত। সন্ন্যাসীর কাজ ছিল শুভাশুভ নির্ণয়ের মাধ্যমে অনাগত বিপদ থেকে মানুষকে সতর্ক করা। সে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকত। কালে ভদ্রে হয়ত কেউ তার দেখা পেত। উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকজন ছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে তার দেখা হত না। ভাগ্যক্রমে কেউ তাকে দেখলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হত। যেন সে স্বয়ং খোদাকেই দেখার দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। দেবতা তায়েফে থাকায় মানুষের দৃষ্টিতে তায়েফের এক ভিন্ন মর্যাদা ছিল। সবাই এ ভূমিকে পবিত্রভূমি

বলে সম্মান করত।

মাত্র এক মাস পূর্বে তায়েফে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছিল। স্বাগতিক এলাকার সর্বোচ্চ নেতা মালিক বিন আওফ তার গোত্রের অনুরূপ আরেকটি শক্তিশালী গোত্র হাওয়াযিন এবং আরো কয়েকটি গোত্রের নেতৃবৃন্দকে এক বিরাট ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেছিল। আনুষ্ঠানিক মনোজ্ঞ করতে বাছাই করা সুন্দরী নর্তকী এবং শিল্পীদের আনা হয়েছিল। তাদের নৃত্য নৈপুণ্য এবং সুর-লহরী শ্রোতাদের দারুণ মুগ্ধ ও তন্ময় করেছিল। সে রাতে মদের বোতল একের পর এক শুধু খালিই হচ্ছিল।

শ্রোতা মাতানো রাতের সে অনুষ্ঠান মালিক বিন আওফের অঙ্গুলি হেলনে থমকে গিয়েছিল। বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ আলোচনা-সমালোচনা এবং পর্যালোচনার পর সে রাতে এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, আচমকা আক্রমণ করে তারা রাসূল (স.) এবং মক্কার মুসলমানদের চিরদিনের জন্য খতম করে দিবে। বয়োবৃদ্ধ এক নেতা দুরায়দ বিন ছম্মাহ সেদিন আহ্বান করেছিল—চল, দেবতা লাতের নামে শপথ করি যে, মক্কার মূর্তিবিনাশী মুহাম্মদ এবং তার চেলা-চামুণ্ডাদের খতম করেই তবে আমরা স্ত্রীর সামনে যাব।

ত্রিশ বছর বয়সী মালিক বিন আওফ সেদিন আবেগে ফেঁটে পড়ছিল। সে বড় দৃঢ়তার সাথে বলেছিল, এবারের বাহুজাতিক বাহিনী মক্কায় মুসলমানদের অজ্ঞাতেই তাদের টুটি চেপে ধরবে।

সে রাতে মালিক বিন আওফ, দুরায়দ বিন ছম্মাহ এবং অন্যান্য গোত্রের নেতৃবৃন্দ এলাকার সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল। তারা সন্ন্যাসীর কাছে দু'টি বিষয় জানতে চেয়েছিল।

১. মক্কায় গিয়ে মুসলমানদের অজ্ঞাতে তাদের টুটি চেপে ধরা তাদের পক্ষে সম্ভব কি-না?

২. আচমকা এবং অকল্পনীয় হামলা মুসলমানদের শির-দাঁড়া ভেঙ্গে দিবে কি-না?

সন্ন্যাসী তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত ও অনুপ্রাণিত করেছিল যে, আপনাদের পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথার্থ। আপনারা সাহস করে এগিয়ে যান। স্বয়ং দেবতা লাতের আশীর্বাদ রয়েছে আপনাদের সাথে। সন্ন্যাসী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদের এটাও জানিয়েছিল যে, "মুসলমানরা আপনাদের আগমনের খবর তখন টের পাবে যখন তারা আপনাদের তলোয়ারে কচুকাটা হতে থাকবে।"

মাত্র এক মাস পরে তায়েফের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরো এলাকায় ভীতি ও আতঙ্ক ছেয়ে গিয়েছিল। দেবতা লাতের আশীর্বাদ নিয়ে এবং জ্যোতিষীর কথা

বিশ্বাস করে হাওয়াযিন, ছাকীফ এবং অন্যান্য গোত্রের যে সমস্ত সৈন্য মক্কায় আক্রমণ করতে গিয়েছিল তারা মক্কার অদূরে হুনায়ন উপত্যকায় মুসলমানদের হাতে চরম মার এবং নাকানি-চুবানি খেয়ে ফিরে আসছিল। পলায়নপরদের অগ্রভাগে বহুজাতিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মালিক বিন আওফ ছিল। সে তায়েফের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে আগেভাগে তায়েফে চলে এসেছিল। ওদিকে মুসলিম বাহিনী রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে তায়েফ অভিমুখে দ্রুত আসছিল।

"তায়েফবাসী" তায়েফের রাস্তায় রাস্তায় আতঙ্কিত আওয়াজ অনুরণিত হয়, "মুসলমানরা আসছে... তায়েফ অবরোধ হবে... প্রস্তুতি নাও... তরি-তরকারি এবং খেজুর যত পার মজুদ কর। পানির নিরাপদ ব্যবস্থা কর।"

মালিক বিন আওফ ছিল সবচে আতঙ্কিত। তায়েফ হাত ফস্কে যাওয়ার দৃশ্য তার চোখে ভাসতে থাকে। পরাজয় এবং পশ্চাদপসারণের আঘাত তো ছিলই। তারপরে আরো বড় আঘাত পায় শহরে প্রবেশ করার সময়। এ সময় তায়েফের নারীরা মালিকের বিজয় গাঁথা এবং বীরত্বের গীত গাওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি ঘৃণার নজরে তাকায়। বেগে আসা সৈন্যদেরকে নারীরা তীব্র ভর্ৎসনাও করছিল।

"স্ত্রী-কন্যারা কোথায় যাদেরকে তোমরা সাথে নিয়ে গিয়েছিলে?" নারীরা সৈন্যদেরকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল—"সন্তানদেরও কি মুসলমানদের দিয়ে এসেছ?" এটাও ছিল নারীদের একটি তীক্ষ্ণ খোঁচা।

মালিক বিন আওফ তায়েফ পৌঁছেই জরুরী বৈঠক আহ্বান করল। সেনাপতি, উপসেনাপতি এবং ইউনিট কমান্ডাররা এসে আসন গ্রহণ করল। মালিক বিন আওফ সভাপতির আসনে সমাসীন। কিন্তু ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং আতঙ্কিত। কারো কোন মতামত আহ্বান ছাড়াই নিজেই নির্দেশ দিলো যে, অপরাপর গোত্রদেরও শহরে এনে রক্ষা কর। মুসলমানরা এল বলে... মালিক একটুও বিশ্রাম নেয় না। এসেই তায়েফের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাথে নিজেও বিভিন্ন কাজে শরীক হল। উপসেনাপতি এবং কমান্ডাররা পিছু হটা সৈন্যদের সমবেত করার কাজে লেগে গেল।

সারাদিনের বিভিন্ন কর্ম-ব্যস্ততায় মালিক বিন আওফ ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে। ক্লান্তি আর অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে তার শরীর। অবসন্ন দেহটাকে এক প্রকার টেনে নিয়ে শয্যায় ছুড়ে মারে। সবচে সুন্দরী এবং মায়াবী স্ত্রীকে ডেকে পাঠালো। স্ত্রী সাথে সাথে এসে হাজির হলো।

"আপনি না এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মক্কার মূর্তি-বিনাশী মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের খতম করেই তবে স্ত্রীদের মুখ দেখাবেন?" স্ত্রী তাকে বলে,

"আপনি বিজয়ের পরিবর্তে পরাজয়ের কলঙ্ক মাথায় তুলে এনেছেন। আপনার কসম এবং ওয়াদা অনুযায়ী আমার অস্তিত্বই এখন আপনার জন্য হারাম।"

"তুমি আমার স্ত্রী।" মালিক বিন আওফ রাগের স্বরে বলে—"আমার নির্দেশ অমান্যের সাহস করো না। আমি যেমনি ক্লান্ত তেমনি উদ্বিগ্নও। এখন তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। আমার সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী তুমিই।"

"আমারও আপনার প্রয়োজন।" স্ত্রী বলে—"কিন্তু আমার এ মুহূর্তে দরকার এক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন পুরুষের। আমি ঐ মালিকের প্রয়োজন অনুভব করি, যে এখান থেকে এই অঙ্গীকার করে গিয়েছিল যে, মুসলমানদেরকে মক্কার মাটিতেই খতম করে ফিরব।... সে মালিক এখন কোথায়?... সে মারা গেছে। ঐ মালিক বিন আওফকে আমি চিনি না, যে নিজ গোত্রসহ অন্যান্য মিত্রগোত্রের হাজার হাজার নারী-সন্তানকে শত্রুর তলোয়ারের নীচে রেখে অন্দর মহলে এসে বসে আছে এবং এক নারীকে ডেকে বলছে, আমি তোমাকে চাই।"

মালিকের এ সুন্দরী স্ত্রীর কণ্ঠ উচ্চ হয়ে আবেগের আতিশয্যে রীতিমত কাঁপতে থাকে। সে মালিকের পালঙ্ক থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং বলে-"আজ রাতে আমি কেন, কোন স্ত্রীই তোমার শয্যায় আসবে না। আজ রাতে তোমার কোন স্ত্রীকে ঐ সমস্ত নারীদের করুণ ফরিয়াদ এবং বুক ফাটা আর্তনাদ স্বস্তির সাথে ঘুমাতে দিবে না। যারা মুসলমানদের হাতে বন্দী...একটু ভাব...কল্পনা কর ঐ সমস্ত বিপন্ন নারী এবং নব তরুণীদের দুর্দশার দৃশ্য, যাদেরকে তুমি মুসলমানদের হাতে উঠিয়ে দিয়ে এসেছ। এখন তাদের গর্ভে জন্ম নিবে মুসলিম সন্তান। ছোট ছোট সন্তান যারা তাদের কব্জায় রয়েছে, তারাও হয়ে যাবে মুসলমান।"

মালিক বিন আওফ পাহাড় সম বিপদ অতিক্রম করে যাওয়ার মত দুর্বার সাহসী লোক ছিল। যৌবনের উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দমিয়ে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার যে আহ্বান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব এবং রণাঙ্গনের অভিজ্ঞ সৈনিক মান্যবর গুরু দুরায়দ বিন ছম্মাহ করেছিল তা সে সেদিন বড় অপমানজনকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আজ সেই একই প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মালিক বিন আওফ নিজ স্ত্রীর সামনে অবনত মস্তকে উপবিষ্ট। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে কেউ পানির ছিটা দিয়েছে। তার পৌরুষ আপনাতেই স্তিমিত হয়ে যায়।

"তুমি মুসলমানদের খতম করতে গিয়েছিলে মালিক!" স্ত্রী এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকে, যেন এই মুহূর্তে মালিকের মত বাহাদুর এবং সাহসী স্বামীর কোন মূল্য নেই তার কাছে। সে আরো বলে, "মুসলমানদের খতম করতে গিয়ে তুমি তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে এসেছ।"

"সন্ন্যাসী বলেছিল..." মালিক মুখ তুলে বলে।

"কোন্ সন্ন্যাসী?" স্ত্রী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—"যে মন্দিরে বসে শুভাশুভ নির্ণয় করে? তোমার মত মানুষ নিজের ভাগ্য নিজের হাতে রাখে। নিজের ভাগ্য নিজ হাতে তৈরী করে আবার নষ্ট করে।...তুমি সন্ন্যাসীর কাছে কৈফিয়ত চাওনি, তার ভাগ্যশর কেন মিথ্যা বলল?"

মালিক বিন আওফ উঠে দাঁড়ায়। নিঃশ্বাসের দ্রুত উত্থান-পতন হয়। চোখে নেমে আসে রক্তের ধারা। সে দেয়ালে ঝুলানো তলোয়ার নামিয়ে আনে এবং স্ত্রীকে কোন কিছু বলা ছাড়াই হন্‌হন্ করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তায়েফের আকাশেও রাত এসেছিল। কিন্তু সেখানকার মানুষের তৎপরতা ও ছোটাছুটি দেখে দিনের মতোই মনে হচ্ছিল। বাইরে থেকে খবর আসছিল, মুসলমানরা তায়েফ অভিমুখে দ্রুতগতিতে আসছে। সকলে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কর্মব্যস্ত। খাদ্য এবং পানির সুব্যবস্থা ছিল প্রধান চ্যালেঞ্জ। অনেকে পানি সংরক্ষণের জন্য হাউস তৈরী করছিল।

সকল তৎপরতা এবং হৈ চৈ মাড়িয়ে মালিক হেটে চলছিল। মানুষ অধিক কর্মব্যস্ততার দরুণ খেয়ালই করতে পারল না যে, তাদের মাঝ দিয়ে তাদেরই সেনাপতি অতিবাহিত হলেন।

॥ দুই ॥

যে সন্ন্যাসী হাওয়াযিন এবং ছাকীফদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তারা এক প্রকার অজান্তেই মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে সক্ষম হবে, সে মন্দিরের খাস কামরায় শায়িত। গভীর নিদ্রায় বিভোর। তার নিদ্রা হরণের দুঃসাহস কারো ছিল না। অন্দরমহলের কোন এক সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত কক্ষে সে নিদ্রা যেত। মন্দিরের অন্য কর্মচারীরা বাইরের সাইডের কোন কামরায় থাকত। কারো পদশব্দে তাদের নিদ্রা টুটে যায়। তাদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল, যেন বাইরের কেউ সন্ন্যাসীর অন্দরমহলে তার অনুমতি ব্যতীত যেতে না পারে। পদশব্দ ভেসে এলে দু'তিন কর্মচারী উঠে বাইরে আসে। একজনের হাতে জ্বলন্ত ছিল মশাল।

"মালিক বিন আওফ!" এক কর্মচারী মালিকের গমন পথে দাঁড়িয়ে বলে—"গোত্রপতি কি ভুলে গেছে যে, ঐ স্থান থেকে সামনে কেউ অগ্রসর হতে পারে না?...আমাদের সাথে কথা বলুন মালিক!"

" তোমরাও কি ভুলে গেছ, কোন নেতার গতিরোধ করলে তার পরিণতি কি হয়? মালিক বিন আওফ তলোয়ারের বাটে হাত রেখে বলে—"আমি সন্ন্যাসীর কাছে যেতে চাই।"

"সন্ন্যাসীর অভিশাপের কথা মনে করেন মালিক!" এক কর্মচারী বলে—

"সন্ন্যাসীকে তুমি বাহ্যদৃষ্টিতে শয্যায় শায়িত দেখলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন লাত দেবতার দরবারে। এমতাবস্থায় তার কাছে গেলে তোমার... ।"

মালিকের মানসিক অবস্থা এত বিধ্বস্ত ছিল যে, তার অন্তরে তখন সন্ন্যাসীর কোন মান-মর্যাদা ছিল না। পূর্বেকার ভীতি এবং শ্রদ্ধাবোধও ছিল না। কারণ, একে তো শোচনীয় পরাজয় বরণ করে এসেছে। দ্বিতীয়ত, তার সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী তাকে চরম ভর্ৎসনা করেছে। মালিক খপ করে মশালধারী কর্মচারীর হাত ধরে বসে এবং চোখের পলকে মশাল ছিনিয়ে নিয়ে সোজা সন্ন্যাসীর কামরায় চলে যায়। কর্মচারীরাও তার পিছন পিছন ছুটে আসে কিন্তু ততক্ষণে সে সন্ন্যাসীর খাস কামরায় পৌঁছে যায়।

সন্ন্যাসী বাইরের চেচামেচিতে জেগে যায়। নিজের কামরায় মশালের আলো দেখে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে। মালিক বিন আওফ কামরায় প্রবেশ করে মশাল সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে।

"শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী!" মালিক বিন আওফ বলে—"আমি জানতে এসেছি যে..."

"আমাদের পরাজয়ের কারণ কী" সন্ন্যাসী তার কথা পূর্ণ করে বলে—একটি 'হাম' কুরবানী দেয়ার কথা বলছিলাম না?"

"হ্যাঁ, সন্ন্যাসী!" মালিক বিন আওফ বলে, "আপনি তো এ কথাও বলছিলেন যে, 'হাম' পাওয়া না গেলে গোত্রের লোকদের রক্ত এবং জান কুরবান করতে। আমার আরো মনে আছে, আপনি বলছিলেন, 'হাম' অন্বেষণে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।...'মুসলমানদের এখন যুদ্ধ-প্রস্তুতি নেই'-একথাও আপনি বলছিলেন।"

"তুমি কি দেবতার কাছে কৈফিয়ত তলব করতে এসেছ, শত্রুরা কেন তোমাদের পরাজিত করল?" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করে—"আমি বলছিলাম কেউ যেন রণাঙ্গনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে।...তোমার সৈন্যরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি? তোমার সেনাদের মাঝে নিজ নিজ স্ত্রী-পরিজনদের রক্ষা করারও আত্মমর্যাদাবোধ নেই।"

"আমি জানতে চাই, আপনি কি করলেন? মালিক বিন আওফ জিজ্ঞাসা করে, "যদি সবকিছু আমাদেরই করতে হয়, তবে আপনার অবদান কি রইল? আপনি কেন এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, মুসলমানদের ঐ সময় খবর হবে, যখন তোমাদের তলোয়ার তাদের শাহরগ স্পর্শ করবে? আপনি কি আমাদের সাথে প্রতারণা করেননি? এটা কি সত্য নয় যে, মুহাম্মাদের ধর্মই বাস্তব যিনি আপনার ভাগ্য গণনা ভুয়া প্রমাণ করে দিয়েছে? সন্ন্যাসী না হলে আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলতাম।...এখন তায়েফ পানে ভয়ঙ্কর বিপদ ধেয়ে আসছে। দেবতা অধ্যুষিত এ বসতি আপনি রক্ষা করতে সক্ষম? মুসলমানদের উপর আপনি গযব নাযিল

করতে পারবেন?”

“প্রথমে একটি কথা শুনে নাও আওফের পুত্র!” সন্ন্যাসী বলে—“সন্ন্যাসীকে দুনিয়ার কোন শক্তি হত্যা করতে পারে না। সন্ন্যাসীর আয়ু শেষ হলে সে দেবতা লাতের অস্তিত্বের মাঝে একাকার হয়ে যায়। বিশ্বাস না হলে তলোয়ার চালিয়ে পরীক্ষা করতে পার।...দ্বিতীয় কথা এটাও মনে রেখ, মুসলমানরা তায়েফ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলেও এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।”

॥ তিন ॥

যে সময় মালিক বিন আওফ সন্ন্যাসীর কক্ষে প্রবেশ করছিল ঠিক ঐ সময় এক মানব ছায়া উপাসনালয়ের পিছনের প্রাচীরের পাশে ঘুর ঘুর করছিল। সে যেই হোক না কেন, নিজের জীবনকে চরম ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করছিল। মালিক বিন আওফ কেবল নেতা হওয়ার প্রভাবে রাতে সন্ন্যাসীর কক্ষ পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। মন্দিরটি প্রায় এক শতাব্দীর প্রাচীন ছিল। পিছনের প্রাচীরে ছোট ফাটল দেখা দিয়েছিল। প্রাচীরের ও পাশে পায়চারী রত মানবরূপী ছায়া ঐ ফাটলে নিজেকে ঠেলে দিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকে পড়ে। মন্দিরের খাস কামরা পর্যন্ত যেতে পথিমধ্যে উঁচু উঁচু ঘাস এবং ইতস্তত ঝোপ-ঝাড় ছিল। ছায়াটি ঐ ঘাস এবং ঝোপ-ঝাড়পূর্ণ এলাকা বিড়ালের মত এমন নিঃশব্দে অতিক্রম করে যে, তার পদশব্দ কিংবা হাল্কা খস্‌খস্‌ আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল না।

ছায়াটি যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে চলে। ঘাস এবং ঝোপ-ঝাড় অধ্যুষিত এলাকা পেরিয়ে সে ঐ চত্বরে উঠে পড়ে যেখানে মন্দিরটি শতাব্দীর স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চাৎ দিকের দরজার একটি পাল্লা উই পোকায় খাওয়া ছিল। ছায়াটি নিঃশব্দে ঐ দুর্বল পাল্লা গলিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সামনে গাঢ় আঁধার কুণ্ডলী পাকিয়েছিল। মানবরূপী ছায়া এখানে এসে জুতা খুলে ফেলে এবং বিড়ালের মত পা টিপে টিপে সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

ঘোরতর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে এমন স্বাচ্ছন্দে চলে, যেন ইতোপূর্বে কখনও এখানে এসেছিল। ছায়াটি অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হয়ে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়ে পৌঁছে। এ সময় তার কানে সন্ন্যাসী এবং আরেকজনের তর্ক-বিতর্ক এবং আলোচনার আওয়াজ ভেসে আসে। সন্ন্যাসীর সাথে আলাপরত লোকটি ছিল মালিক বিন আওফ। ছায়াটি চমকে থেমে যায়। সন্ন্যাসীর কক্ষ হতে বের হওয়া মশালের আলো সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল।

মালিক বিন আওফ লৌহবৎ দৃঢ়তা নিয়ে গেলেও সন্ন্যাসীর কথায় এতই প্রভাবিত হয় যে, মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। মালিক চলে যেতেই নিকটবর্তী কোথাও লুকিয়ে থাকা ছায়াটি সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্ন্যাসী তখনও পর্যন্ত খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। সে হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। তার চোখের সামনে এক তরুণী দাঁড়িয়েছিল। তরুণী তার অপরিচিত ছিল না। ভাল করেই সে তাকে চিনত। যে ছায়ামূর্তিটি সন্ন্যাসীর সামনে এসে তরুণীরূপে প্রকাশিত হয় সে ঐ ইহুদি নারী ছিল, যাকে এক বয়োবৃদ্ধ ইহুদি সন্ন্যাসীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেছিল। সাথে সাথে স্বর্ণের দু'টি টুকরোও তাকে দিয়েছিল। এটা ছিল সন্ন্যাসীর পুরস্কার বা কাজের প্রতিদান। আর সে কাজ এই ছিল যে, যে করেই হোক হাওয়াযিন ও ছাকীফদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করা যে, তাদের হাতেই মুসলমানদের ধ্বংস নিহিত। তাদের তলোয়ারে ইসলাম এবং মুসলমান চিরদিনের জন্য চিহ্নিচহ্ন হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ ইহুদি তরুণীকে এক রাতের জন্য সন্ন্যাসীর কাছে রেখে গিয়েছিল। এই সুসংবাদ শোনার আশায় সে তায়েফে অপেক্ষমাণ ছিল যে, হাওয়াযিন, ছাকীফ এবং তাদের মিত্রগোত্রগুলো ইসলামকে মুসলানদের রক্তনদীতে চিরতরে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিধি বাম! মালিক বিন আওফ নিজেই অবনত মস্তকে তায়েফে ফিরে আসে। তার পিছু পিছু হতাশ-অবসন্ন সৈন্যরাও পা টেনে টেনে দু'চারজন করে তায়েফে এসে পৌঁছতে থাকে। বৃদ্ধ ইহুদির কোমর বয়সের আধিক্যে ন্যুজ হয়ে গিয়েছিল। মালিককে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে দেখে তার কোমর যেন পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। তার ভাঙ্গা কোমরের উপর শেষ ভারী পাথর ঐ ইহুদি তরুণী এনে চাপিয়ে দেয় যাকে সে উপঢৌকন স্বরূপ সন্ন্যাসীর কাছে এক রাতের জন্য রেখে এসেছিল।

"আমি এটা ভেবে বিস্মিত যে, আপনার মত অভিজ্ঞ এবং ঝানু লোক পর্যন্ত ধোঁকা খেয়েছেন?" তরুণী ইহুদিকে বলে—"নরপিশাচ সন্ন্যাসীর একটি কথার উপরেও আমার আস্থা নেই। আমি অযথা আপনার নির্দেশে আমার কুমারিত্ব বিসর্জন দিলাম।"

"আমার নির্দেশে নয় পাগলী!" বৃদ্ধ ইহুদি সান্ত্বনার স্বরে বলে—"ইহুদিবাদের খোদার নির্দেশে। তোমার কৌমার্য বিসর্জন বৃথা যাবে না।"

এ ইতিহাস ইহুদিবাদে প্রাচীনকাল থেকে সংরক্ষণ হয়ে আসছে যে, তারা সর্বদা যুদ্ধের ময়দান এড়িয়ে চলে। তারা শৌর্য-বীর্য দ্বারা কাজ নেয় না; বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থাই তাদের প্রধান কৌশল। তারা পর্দার অন্তরালে কূটচাল চালতে অত্যন্ত পারঙ্গম। তাদের কূটচাল দু'ভাইকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে তারা অগাধ ধন-দৌলতের সাথে তাদের কন্যাদের নারীত্বকে সফল যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। ইহুদি সমাজ এবং ধর্মে নারীর ইজ্জত সম্ভ্রমের কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু এই তরুণীকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সে বৃদ্ধ ইহুদির প্রতি বারবার মারমুখী হয়ে উঠছিল এবং বলছিল, মুসলমানরা পরাজিত এবং পরাভূত হলে সে গর্বের সাথে বলত, সে এই বিরাট লক্ষ্য সাধনে নিজ কুমারিত্ব বিসর্জন দিয়েছে। সাথে সাথে সে এ অভিযোগও করে যে, সন্ন্যাসী তার সাথে প্রতারণা করেছে।

রাতে বৃদ্ধ ইহুদি গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলে তরুণী উঠে পড়ে। খঞ্জর বের করে বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ফেলে। অতঃপর পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে আসে।

গভীর রাতে গতিরোধ করে তাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করার কেউ ছিল না যে, তার পরিচয় কী? গন্তব্য কোথায়? সে রাতে সারা তায়েফবাসী বিনিদ্র ছিল। স্ত্রীরা তাদের পরাজিত স্বামীদের ভর্ৎসনা করছিল আর যাদের স্বামী ফেরে না তারা গুণগুণ করে কাঁদছিল। অলি-গলিতে লোকের যাতায়াত ছিল অবাধ। তরুণী জনতার মাঝ দিয়ে লাতের মন্দিরে গিয়ে পৌঁছে। তার চোখে ছিল খুনের নেশা। সে তৎকালের ঐ সকল মহিলার অন্তর্গত ছিল যাদের দেহে বীরত্ব টগবগ করত। সে উপাসনালয়ের পিছনের দেয়ালের ফাটল গলিয়ে ভিতরে চলে যায়।

আমি জানতাম আমার যাদু একটি বারের জন্য হলেও তোমাকে আমার কাছে আনবে।" সন্ন্যাসী আনন্দে গদগদ হয়ে বলে—"এস, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়।"

তরুণী আস্তে আস্তে এগিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

"যাদু নয়, প্রতিশোধ বল"—প্রতিশোধের যাদু আমাকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে।

"কি আবোল-তাবোল বলছ তরুণী!" সন্ন্যাসী কান্নার চেয়েও করুণ মুচকি হেসে বলে—"মালিক বিন আওফ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও?...সে তো চলে গেছে। সে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। লাতের জ্যোতিষীকে হত্যা করার দুঃসাহস কোন মানুষের হতে পারে কি?"

"হ্যাঁ" তরুণী বলে—"একজন মানুষ আছে, সে লাতের সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে পারে। লোকটি লাতের পূজারী নয়। আর সে আমিই। ইহুদিবাদের খোদা আমার পূজ্য।"

তরুণী এরপর চোখের পলকে বস্ত্রের অভ্যন্তর হতে খঞ্জর বের করে এবং সোজা সন্ন্যাসীর বক্ষে স্থাপন করে হৃদপিণ্ড এ ফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। সন্ন্যাসীর আর্তনাদ যাতে বাইরে না যায় তার জন্য তরুণী জ্যোতিষীর মুখ এঁটে ধরে। তরুণী বক্ষ থেকে খঞ্জর বের করে সন্ন্যাসীর শাহরগ কেটে দেয়। তরুণী জিঘাংসা চরিতার্থ করে স্থিরচিত্তে সন্ন্যাসীর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে এবং যে পথে ভিতরে

ঢুকেছিল সে পথ দিয়ে উপাসনালয়ের চত্বর থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যায়।

মালিক বিন আওফ শয্যায় মাথা ঝুঁকিয়ে বসা ছিল। সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীও ছিল তার পাশে বসা। এ সময় ভৃত্য এসে জানায় যে, এক অপরিচিত নারী এসেছে। তার পোষাক রক্ত-রঞ্জিত এবং তার হাতে খুনে ভরা একটি খঞ্জরও আছে। মালিক বিন আওফ এ সংবাদে জেগে ওঠে। সে চমকে উঠে বলে, তাকে ভিতরে নিয়ে এস। ভৃত্য চলে যায়। মালিক এবং তার স্ত্রীর দৃষ্টি দরজা মাঝে আটকে যায়।

তরুণী দরজায় এসে দাঁড়ায় এবং বলে—"যে কাজ আপনি করতে পারেন নি তা আমি করে এসেছি। আমি সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছি।"

মালিক বিন আওফ থ মেরে যায়। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক এবং উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। সে মুহূর্তে তলোয়ার তুলে নেয় এবং খাপ ছুড়ে ফেলে তরুণীর উদ্দেশে পা বাড়ায়। তার স্ত্রী দৌড়ে উভয়ের মাঝে এসে দাঁড়ায়।

"তরুণী যা করেছে ঠিকই করেছে।" স্ত্রী তার গতিরোধ করে বলে—"তোমাকে যে ভুয়া আশ্বাস দিয়েছিল এবং মিথ্যা ইশারার কথা বলেছিল সে মারা গেছে। ভালই হয়েছে।"

"তুমি জান না আমাদের দিকে কি মহাবিপদ ধেয়ে আসছে।" মালিক বিন আওফ বলে।

"এর জন্য আপনাদের কোন বিপদ হবে না।" ইহুদি তরুণী বলে—"জ্যোতিষী আপনাকে বলেছিল না যে, সন্ন্যাসীকে কোন মানুষ হত্যা করতে পারে না এবং তার জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে এলে সে দেবতা লাতের অস্তিত্বের মাঝে একাকার হয়ে যায়?...আপনার হিম্মত থাকলে মন্দিরের কর্মচারীদের গিয়ে বলুন, সন্ন্যাসীর লাশকে দেবতার মাঝে একাকার করে দিতে। তার শবদেহ বাইরে ফেলে রাখুন, শকুন-কুত্তা কিভাবে তার দেহ ছিড়ে-ফেড়ে খায় দেখবেন।"

মালিক বিন আওফের স্ত্রী মালিকের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে নেয় এবং পালঙ্কে ছুড়ে ফেলে।

"বাস্তবতা অনুধাবন কর আওফের পুত্র!" স্ত্রী তাকে বলে—"নিজের ভাগ্য ঐ ব্যক্তির হাতে সঁপে দিও না, এক সামান্য নারীর হাতে যে নিহত হয়েছে।" এরপর সে ভৃত্যকে ডেকে বলে—"তরুণীটি আমাদের মেহমান। তার গোসল এবং আরামের ব্যবস্থা কর।"

মালিক বিন আওফের চেহারা থেকে আতঙ্কের চিহ্ন মুছে যেতে থাকে। স্ত্রী তার চিন্তা-চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টি করে দেয়।

পর প্রভাতে মালিকের কাছে দু'টি খবর আসে। একটি হলো, রাতে সন্ন্যাসী খুন হয়েছে। মন্দির কর্মচারীরা বলছে, রাতে মালিক বিন আওফ ছাড়া আর কেউ সন্ন্যাসীর কক্ষে যায়নি। কেউ যাওয়ার সাহসও করতে পারে না। মন্দির কর্মচারীরা এটা রাষ্ট্র করে দেয় যে, জ্যোতিষীকে মালিক বিন আওফ নিজে হত্যা করেছে, নতুবা ভাড়াটে দিয়ে সে হত্যা করিয়েছে।

মালিক বিন আওফের জন্য দ্বিতীয় খবর এই ছিল যে, মুসলমানরা তায়েফ অভিমুখে আসতে আসতে কোন্‌দিকে যেন চলে গেছে। এ সংবাদ মালিকের ধড়ে প্রাণ এনে দেয়। সে তৎক্ষণাৎ দু'তিন অশ্বারোহীকে হুনায়ন টু তায়েফ রুটে পাঠিয়ে দেয়। এরপর সে উপাসনালয়ে গিয়ে হাজির হয়। অনেক কষ্টের পর সে উত্তেজিত লোকদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে, শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীকে হত্যা করার দুঃসাহস সে করতে পারে না। জনতা জানতে চায়, তাহলে হত্যাকারী কে? এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক। মালিক বিন আওফ তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে শীঘ্রই খুনীকে চিহ্নিত করা হবে। মালিক চাইলে তরুণীর কথা বলে দিয়ে নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে পারত। কিন্তু সে এখনই তরুণীকে সামনে আনতে চায় না। সে মানুষের দৃষ্টি এদিক থেকে ফিরিয়ে মুসলমানদের দিকে করে দেয়, যারা তায়েফ অবরোধ করতে দ্রুতগতিতে আসছিল। সে ক্ষণিকের জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে যায় এবং কর্মচারীদের সাথে দ্রুত সমঝোতা করে ফেলে।

"লাতের পূজারীগণ!" এক বৃদ্ধ কর্মচারী বাইরে এসে সমবেত জনতার উদ্দেশে বলে—"আমাদের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীকে কেউ হত্যা করেনি। যাকে তোমরা নিহত দেখতে পাচ্ছ, তিনি মূলত দেবতা লাতের অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে লীন করে দিয়েছেন। দেবতা লাতের নির্দেশে এখন থেকে আমি সন্ন্যাসী। যাও, স্বীয় ভূখণ্ডকে আসন্ন শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা কর।"

মালিক বিন আওফ মন্দিরের ঝামেলা চুকিয়ে ঘরে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর তার প্রেরিত দূতরা ফিরে আসে। তারা এসে তাকে জানায় যে, হুনায়ন থেকে তায়েফের পথে মুসলমানদের কোন নাম-গন্ধ নেই।

মালিক বিন আওফ নিজেকে ধোঁকার মাঝে রাখে না। সে অন্যান্য নেতাদের জানায় যে, মুহাম্মাদ শত্রুদের এমনিতেই ক্ষমা করে না। সে কোন পন্থায় অবশ্যই পাল্টা হামলা চালাবেই। সে ঘোষণা করে দেয়, শহর প্রতিরক্ষায় যেন বিন্দুমাত্র গাফলতি ও ত্রুটি প্রদর্শন না করা হয়।

॥ চার ॥

গোয়েন্দারা মালিক বিন আওফকে সত্য সংবাদই দিয়েছিল যে, তায়েফের রাস্তায় মুসলমানদের কোন নাম-নিশানা নেই। কিন্তু মুসলমানরা তুফানের গতিতে তায়েফ অভিমুখে ঠিকই ধেয়ে আসছিল। সৈন্যরা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে ভিন্ন রাস্তা ধরে চলছিল। পরিবর্তিত রাস্তা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। তারপরেও রাসূল (সা.) এ রাস্তা এ জন্য অবলম্বন করেন যে, বিপরীত যে স্বল্পদূরত্বের রাস্তাটি ছিল তা বিভিন্ন পাহাড়, প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। ছোট-বড় অনেক পাহাড়ী খাদও ছিল এ রাস্তায়। রাসূল (সা.) কমান্ডারদের সতর্ক করে বলেছিলেন, হুনায়নের প্রথম অভিজ্ঞতা ভুলো না। মালিক বিন আওফ বড়ই দুর্ধর্ষ। তিনি আরো বলেন, তায়েফ পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই একটা ফাঁদ। শত্রুর উদ্দেশে ওঁৎ পেতে থাকার জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। মালিক বিন আওফ আবার ফাঁদ পাততে পারে, যেমনটি হুনায়ন উপত্যকায় পেতে হযরত খালিদ (রা.)-কে তীর মেরে চালনী করে দিয়েছিল।

তায়েফে যেতে রাসূল (সা.) যে পথ ধরেন তা মুলীহ্ উপত্যকার মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গিয়ে করণ উপত্যকার সাথে মিলেছিল। রাসূল (সা.) সৈন্যদেরকে করণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে না নিয়ে তায়েফের উত্তর-পশ্চিমে সাত মাইল দূরে নাখিব এবং সাবেরা এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। এলাকাটি ছিল অনেকটা সমতল এবং উন্মুক্ত। এখানে পাহাড় এবং প্রান্ত ছিল না বললেই চলে। মুজাহিদ বাহিনী ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ৮ম হিজরীর ১৫ শাওয়াল ঐ এলাকা দিয়ে তায়েফের নিকটে গিয়ে পৌছায়, যা ছিল তায়েফবাসীদের ধারণা ও চিন্তার বাইরে। মুজাহিদ বাহিনীর চলার গতি যথেষ্ট দ্রুত ছিল। অগ্রভাগে যথারীতি বনু সালীম ছিল। আর তাদের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)। আশা অনুযায়ী তায়েফের নিকট পর্যন্ত কোন শত্রুসৈন্য নজরে পড়ে না। ঐতিহাসিকদের মতে এর কারণ এই ছিল যে, উন্মুক্ত প্রান্তরে লড়ার ঝুঁকি নেয়ার সাহস মালিক বিন আওফের ছিল না।

হুনায়ন যুদ্ধে বনু হাওয়াযিন অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ছাকীফ গোত্রও লড়েছিল। কিন্তু যে ঘোরতর যুদ্ধের সম্মুখীন বনু হাওয়াযিন হলো, বনু ছাকীফ তেমনটি হলো না। তারপরেও বনু ছাকীফ পিছু হটে এসেছিল। রাসূল (সা.)ও এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক ছিলেন যে, বনু ছাকীফের মনোবল চাঙ্গা এবং তারা ক্লান্তও নয়। তারা নিজ ভূখণ্ড রক্ষার দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যাবে।

এটা কার ভুল ছিল তা জানা যায় না যে, মুসলমানরা নগর প্রাচীরের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে এসে দাঁড়ায়। তারা সেখানে সেনাছাউনী তৈরীরও পরিকল্পনা করে। কিন্তু

হঠাৎ প্রাচীর ফেঁড়ে বনু ছাকীফের উদয় হয় এবং তারা মুসলমানদের উপর মুষলধারে তীরবর্ষণ করে। অতর্কিত এ আক্রমণে অনেকে আহত এবং অনেকে শহীদ হন। মুসলিম বাহিনী পিছু হটে আসে। রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে অবরোধের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে পুরো নগরের অবরোধ সম্পন্ন করেন। যে পথে শত্রুর পলায়নের বেশী আশঙ্কা ছিল ঐ পথে তিনি অধিক সৈন্য মোতায়েন করেন।

শহরের প্রতিরক্ষা বড়ই মজবুত ছিল। ছাকীফ গোত্র ছিল পূর্ণ প্রস্তুত। তীর চালাচালি ছাড়া দুর্ভেদ্য কেল্লার বিরুদ্ধে মুসলমানদের আর কিছু করার ছিল না। মুজাহিদরা এ নির্ভীক সাহসিকতাও প্রদর্শন করে যে, তারা নগর প্রাচীরের নিকটে গিয়ে বনু ছাকীফের ঐ সমস্ত তীরন্দাজদের প্রতি তীর ছুঁড়ে, যারা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তীর ছুড়ছিল। বনু ছাকীফ প্রাচীরের উপরে এবং নিজেদের আড়াল করার সুব্যবস্থা থাকায় তাদের তীর মুসলমানদের বেশী ক্ষতি করতে থাকে। মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে আবার পিছে ফিরে আসতে থাকে। মুসলমানদের আহতের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। কমান্ডার হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বনু ছাকীফের তীরে শহীদ হয়ে যান।

৫/৬ দিন এভাবে গড়িয়ে যায়। ইসলামী ইতিহাসের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত সালমান ফার্সী (রা.)ও সৈন্যদের সাথে ছিলেন। খন্দক যুদ্ধে যে দৈর্ঘ্য পরিখা খনন করা হয়েছিল তা হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এরই সমর বিচক্ষণতা ছিল। ইতোপূর্বে আরবরা পরিখার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে অবগত ছিল না। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) ৫/৬ দিনেও অবরোধ কার্যকর না হতে দেখে তিনি শহরে পাথর নিক্ষেপের জন্য মিনজানিক পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র-তৈরী করান। কিন্তু এতেও কাজ হয় না।

হযরহ সালমান ফার্সী (রা.) বৃহদাকার একটি চামড়ার ঢাল তৈরী করান। কয়েকজন লোক লাগত তা নড়াচড়া করতে। এ ঢালের সুবিধা এই ছিল যে, অনেকে এর ছত্রছায়ায় নিরাপদে কেল্লার দরজা পর্যন্ত চলে যেতে পারত। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) নির্মীত ঢালটি ছিল একটি গাভীর চামড়া দ্বারা তৈরী। একদল সৈন্য এই ঢালের ছত্রছায়ায় কেল্লার সবচে বড় দরজার দিকে এগিয়ে যায়। শত্রু পক্ষের অসংখ্য তীর এসে ঢালের পিঠে বিদ্ধ হতে থাকে। সৈন্যদের কোন ক্ষতি হয় না। এতে শত্রুরা শিউরে ওঠে। তারাও দ্রুত নব পলিসি গ্রহণ করে। মুসলমানরা চামড়ার বৃহৎ ঢাল নিয়ে যখন কেল্লার প্রাচীরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এ সময় বনু ছাকীফ প্রাচীরের উপর থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার, জ্বলন্ত লৌহটুকরা এত বেশি নিক্ষেপ করে যে, স্থানে স্থানে ঢালের চামড়া পুড়ে যাওয়ায় তা তীর থেকে

হেফাজতের আর উপযুক্ত থাকে না। আরবদের জন্য এই চর্মঢাল নতুন আবিষ্কার হওয়ায় এবং তা প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় সৈন্যরা ঢালটি অকুস্থলে ফেলে সৈন্যশিবিরে দৌড়ে চলে আসে। বনু ছাকীফ এই সৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ করলে অনেকে আহত হন।

আরো দশদিন গত হয়। অবরোধ এবং প্রতিরক্ষার ফলাফল এই এসে দাঁড়ায় যে, মুসলমানরা তীর নিক্ষেপ করতে করতে সামনে অগ্রসর হত এবং একটু পরে তীর খেতে খেতে পিছে ফিরে আসত। তবে মুসলমানদের অনমনীয় মনোভাব এবং হার না মানার দৃঢ়তা দেখে বনু ছাকীফের মাঝে এক অজানা আতঙ্ক ও ভীতি ছেয়ে গেল। আর এ কারণেই তারা বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার সাহস করে না। পরিশেষে একদিন রাসূল (সা.) সাধারণ সভা আহ্বান করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে রাসূল (সা.) উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অবরোধের সফলতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় বের করতে তিনি অভিজ্ঞ কমান্ডারদের পরামর্শ আহ্বান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) অবরোধ তুলে নেয়ার ব্যাপারে অভিমত পোষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও অবরোধ তুলে নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, মক্কার দিকে নজর দেয়ার খুবই প্রয়োজন ছিল তাঁর। মাত্র কদিন আগে মক্কা বিজয় হয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, এ সময়ে দীর্ঘদিন তায়েফে অবস্থান করলে মক্কায় শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারী। ৮ম হিজরীর ৪ জিলক্বদ। এ দিনে তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়। অবরোধ প্রত্যাহার হওয়ায় বনু ছাকীফদের মাঝে আনন্দ প্রতিক্রিয়া পড়ার দরকার ছিল। কিন্তু বাস্তবে হয় এর বিপরীত। তাদের মাঝে নতুন এই উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয় যে, মুসলমানরা এখন চলে গেলেও যে কোন সময় আবার আসতে পারে এবং তখন এমন প্রতিশোধ নিবে যে, ইট থেকে ইট পৃথক করে ফেলবে। খোদ মালিক বিন আওফের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসে। জ্যোতিষীর মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী এবং হুনায়নে মুসলমানদের অগ্নিঝরা আক্রমণ তাঁকে নিজের আকীদা-বিশ্বাস দ্বিতীয়বার নিরীক্ষণ করতে বাধ্য করে।

অবরোধ তুলে মুসলমানরা ২৬ ফেব্রুয়ারী যাঅরানা নামক স্থানে গিয়ে পৌছে। হুনায়ন যুদ্ধের গনীমতের মাল রাসূল (সা.) এখানে জমা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধলব্ধের মধ্যে ৬ হাজার নারী, বাচ্চা এবং হাজার হাজার উট, বকরী ছিল। যুদ্ধ সাজ-সরঞ্জামও ছিল প্রচুর। রাসূল (সা.) এ সমস্ত নারী, বাচ্চা

এবং উট, বকরী সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

মুজাহিদ বাহিনী যাঅরানা থেকে রওনা হওয়ার উপক্রম এমন সময় হাওয়াযিন গোত্রের কতিপয় নেতা রাসূল (সা.)-এর সকাশে এসে ঘোষণা করে যে, হাওয়াযিনের সমস্ত গোত্র ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করেছে। সাথে সাথে তারা যুদ্ধ সম্পদ হিসেবে যা ছেড়ে গিয়েছিল তা ফেরৎ দানেরও আহ্বান জানায়। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, সহায়-সম্পদ তোমাদের বেশী প্রিয়, নাকি স্ত্রী-স্বজন? নেতারা উত্তরে জানায়, স্ত্রী-পুত্র ফেরৎ পেলেই তারা সন্তুষ্ট। সহায়-সম্পদ মুসলমানরা ভোগ করুক।

রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে হাওয়াযিনদের স্ত্রী-বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিতে বলেন। সাহাবায়ে কেরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ফিরিয়ে দেন।

হাওয়াযিনদের ধারণায় ছিল না যে, রাসূল (সা.) এমন অভাবিত উদারতা প্রকাশ করবেন কিংবা সৈন্যরা প্রাপ্ত মালে গনিমতের অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলমানদের এই অসাধারণ উদারতার ফল এই হয় যে, হাওয়াযিনরা ইসলামকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে। হাওয়াযিন নেতারা গোত্রের নারী ও শিশুদের আজাদ করে নিয়ে যায়। মুসলমানদের বিশাল এই উদারতার ঢেউ তায়েফের কেল্লা পার হয়ে মালিক বিন আওফের খাস মহলে গিয়েও পৌছে। মুসলিম বাহিনী যাঅরানা ছাড়ার আগেই একদিন মালিক বিন আওফ রাসূল (সা.)-এর সামনে এসে হাজির হয় এবং কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়।

আরব ভূখণ্ড হতে দেবতা লাতের প্রভুত্ব এবং খোদাত্ব চিরদিনের জন্য মুছে যায়।

॥ পাঁচ ॥

ইসলাম সীমিত পরিমণ্ডলে অবস্থান করাকালীন তার শত্রুও ছিল ধারে-কাছের। মক্কায় থাকা অবস্থায় কুরাইশরা আর মদীনায় চলে গেলে মক্কাবাসী ও তার আশে-পাশের গোত্রসমূহ। মদীনার পর ইসলাম মক্কায়ও ছড়িয়ে পড়লে এবং বৃহত্তর মক্কা-মদীনার সিংহভাগ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে গেলে অর্থাৎ ইসলাম একটি বৃহৎ শক্তি ও ধর্মে রূপ নিলে এবং আরব ভূখণ্ডে এর বিরোধিতা করার মত কেউ না থাকলে আরব ভূখণ্ডের বহু দূর-দূরান্তের রাষ্ট্রগুলো ইসলামের নতুন শত্রুতে পরিণত হয়। এর প্রধান কারণ ছিল ইসলামের ক্রম বিস্তার। ইসলামের এহেন দ্রুত প্রচার-প্রসার দেখে দূর-দূরান্তের রাজা-বাদশাহদের মসনদ কেঁপে উঠে। অবশ্য ইতোমধ্যে মুসলমানরাও বিপুল সমর শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে সমরশক্তির অবদান ছিল না; বরং খোদ ইসলামের মধ্যেই এমন এক আকর্ষণ ও সম্মোহনী শক্তি ছিল

যে, যে-ই আল্লাহ্‌র কালাম শুনত মুসলমান হয়ে যেত।

মুসলমানরা তাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছিল। চৌকস গোয়েন্দারা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করত। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে এক গোয়েন্দা টিম এসে রাসূল (সা.)-কে এ রিপোর্ট প্রদান করে যে, রোমীয়রা সিরিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করছে। যার অর্থ হচ্ছে, তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। ক'দিন পর আরেক গোয়েন্দা জানায়, রোমীয়রা কিছু সৈন্য উরদুন অভিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছে।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দ অক্টোবর মাস। ভরা গ্রীষ্ম মৌসুম। চামড়া দগ্ধকারী লু-হাওয়া অনবরত বয়ে চলছে। দিনের বেলায় রৌদ্রের প্রখর তাপে অল্পক্ষণ অবস্থানও অসম্ভব ছিল। এমনি প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, রোমক বাহিনী এখানে এসে আমাদের উপর আক্রমণ করার আগেই আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের গতিরোধ করব।

রাসূল (সা.)-এর এই ঘোষণায় ইসলাম বিদ্বেষী কুচক্রী মহল স্বরূপে ময়দানে আবির্ভূত হয়। তারা বিভিন্ন প্রোপাগাণ্ডা এবং গুজব ছড়াতে চেষ্টা করে। মুসলমানরা যাতে মদীনা হতে না বের হয় তার জন্য এই বিদ্বেষী মহল নানা অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল কিছু নামধারী মুসলমান। এরা বাহ্যিকভাবে নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও আসলে তারা ছিল কাফের। বিভীষণ কপটচারী। মুসলমানরা যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করলে এই ঘৃণ্য মুনাফিক শ্রেণী তাদেরকে এই বলে হীনবল ও আতঙ্কিত করে যে, চলতি আবহাওয়ার মধ্যে যুদ্ধযাত্রা করলে প্রখর গরম এবং পানির স্বল্পতায় পথিমধ্যেই সবাই মারা পড়বে। যুদ্ধবিরোধী এ অপতৎপরতার সাথে ইহুদীবাদের গভীর যোগসাজোশ ছিল। দাবার গুটি মূলত এদের হাতেই ছিল। পর্দার অন্তরাল হতে কলকাঠি এরাই নাড়াত।

মুনাফেক এবং ইহুদীবাদের প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও মুসলমানদের সিংহভাগ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল (সা.) সার্বিক প্রস্তুতি নিতে বেশী দিন ব্যয় করেন না। অক্টোবরের শেষ দিকে রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে যে সেনাবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করার জন্য চূড়ান্তভাবে তৈরী হয় তার সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। দশ হাজার ছিল আরোহী। এই মুজাহিদ বাহিনীতে মদীনা ছাড়াও মক্কা এবং যে সমস্ত গোত্র আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসন্ন যুদ্ধ ছিল মক্কা-মদীনা বনাম বিশাল রোম শক্তির অসম লড়াই। জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামরিক বাহিনী ছিল মুজাহিদ বাহিনীর এবারের প্রতিপক্ষ।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী রওনা হয়ে যায়। সূর্যের তীব্র উত্তাপে ভূ-পৃষ্ঠ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছিল। বালু এত গরম ছিল যে, উট-ঘোড়ার পা ঝলসে যাচ্ছিল। এ বছর আরবে দুর্ভিক্ষ এবং মঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যার ফলে খাদ্য রসদেও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। পানিও ছিল কম। মুজাহিদরা এই তীব্র গরমের মাঝেও শুধু এ আশঙ্কায় পানি পান করতেন না যে, না জানি পানি এখান থেকে কত দূরে। কিছুদূর গিয়েই মুসলমানদের ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে যায়। পানির অভাবে গলা শুকিয়ে কাষ্ঠ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও তাদের মুখে আল্লাহ্‌র নাম জারী ছিল এবং তারা এমন প্রত্যয়দীপ্ত ছিল যা লেখা কিংবা মৌখিক বর্ণনার উর্ধ্বে। কল্পনায় তার একটি নমুনাচিত্র ধারণ করা যেতে পারে মাত্র। নতুবা শব্দের গাঁথুনীতে কাগজের পিঠে তার স্বরূপ তুলে ধরা সত্যই দুরূহ, অসম্ভব। তাদের এহেন বর্ণনাতীত ত্যাগ-তিতীক্ষার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ্ পাকই দিতে পারেন। কোন মানুষের পক্ষে তার বিনিময় দেয়া সম্ভব নয়। চরম প্রতিকূল এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও মুজাহিদ বাহিনী তীব্র প্রেরণা এবং আরাধ্য সাধনার মন্ত্রে উজ্জিবীত হয়ে আসমান-জমিনের উত্তপ্ত অঙ্গারের বুক চিরে চিরে চলতে থাকে।

দীর্ঘ প্রায় ১৪ দিন পর মুজাহিদ বাহিনী সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা তাবুকে গিয়ে পৌছে। ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় প্রকাশ করে লেখেন, প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী যে পথ ১৪ দিনে অতিক্রম করে, স্বাভাবিক অবস্থা এবং আবহাওয়া অনুকূল থাকার সময়েই এতদিন লাগত এ পথ অতিক্রম করতে। এ পথটি ১৪ দিন সফরের হওয়ায় রসিক মুসাফিররা একে 'চৌদ্দ মঞ্জিল' বলত। কোন কোন ঐতিহাসিক এই চৌদ্দ মঞ্জিলকে ১৪ দিন বলে অভিহিত করেছেন। মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌছলে এক গোয়েন্দা এসে সংবাদ দেয় যে, শত্রু সেনাদের যে বাহিনীটি উরদুন অভিমুখে রওনা হয়ে যায় তারা এখন দেমাস্কে অবস্থান করছে।

রাসূল (সা.) সৈন্যদেরকে তাবুকে ক্যাম্প স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং করণীয় নির্ধারণে জরুরী পরামর্শ করতে কমান্ডারদের ডেকে পাঠান। সকলের ধারণা ছিল, রাসূল (সা.) তাবুক হতে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিবেন এবং দেমাস্ক বা দেমাস্কের আশে-পাশে চূড়ান্ত লড়াই সংঘটিত হবে। রাসূল (সা.) উপস্থিত কমান্ডারদের সামনে পরিস্থিতি তুলে ধরে পরামর্শ আহ্বান করেন। রোমকদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য—এমন বিশ্বাস মাথায় রেখে সবাই পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু

রাসূল (সা.) সকলকে বিস্ময়ের ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে দিয়ে জানান যে, সৈন্য তাবুক থেকে সামনে অগ্রসর হবে না।

ঐতিহাসিকদের অভিমত, সামনে অগ্রসর না হওয়ার এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাসূল (সা.)-এর প্রভূত সমর-বিচক্ষণতা কাজ করেছিল। রাসূল (সা.) মদীনা ত্যাগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, রোমকদের গতিরোধ করা হবে। তিনি নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে এত দূরে এবং তীব্র গরমের মাঝে লড়াই শুরু করতে চান না। তিনি উল্টো হিরাক্লিয়াসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন যে, সে চাইলে নিজ ভূখণ্ড ছেড়ে তাবুকে এসে লড়াই করতে পারে। মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে গিয়েছিল। তাদের অন্তরে কোন বিভ্রান্তি কিংবা কোন ভীতি ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ সব সময় পেশীশক্তির দাপটে হয় না। বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ এবং কুশলী নীতি অনেক সময় গ্রহণ করতে হয়। রাসূল (সা.) এখানে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগান। রোমকরা যাতে মদীনায় যেতে না পারে তার জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, অত্র এলাকার যারা রোমকদের অধীনে ছিল তাদেরকে নিজেদের অধীনে আনতে প্রতিনিধি দল গঠন করেন। ৪টি উল্লেখযোগ্য স্থানে এই প্রতিনিধি দল পাঠানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়। আকাবা তথা ঈলা, মুকন্যানা, আজরুহ এবং যারবা। রাসূল (সা.) যুদ্ধের পরিবর্তে বন্ধুত্বের শর্তাবলী নির্ধারণ করে এ সমস্ত স্থানে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। একটি শর্ত এই ছিল যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে জোরপূর্বক যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হবে না। আরেকটি শর্ত ছিল, তাদের প্রতি কেউ চড়াও হলে তাদের প্রতিরোধ করাকে মুসলমানরা দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে জ্ঞান করবে। এর বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের থেকে কর আদায় করবে।

সর্বপ্রথম ঈলার অনুগত নেতা নিজেই এসে রাসূল (সা.)-এর বন্ধুত্বের পয়গাম কবুল করে এবং নিয়মিত কর প্রদানের শর্তও মেনে নেয়। এর পরে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরো দু'টি শক্তিশালী গোত্র মুসলমানদের সাথে মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং করারোপের শর্তও মেনে নেয়।

'আল যাওফ' নামে একটি স্থান ছিল। তৎকালে তাকে 'দাওমাতুল জানদাল' বলা হতো। ভয়ঙ্কর মরুভূমি অধ্যুষিত ছিল এ এলাকা। সে সময়কার বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এ স্থানে এমন বালুর টিবি এবং প্রশস্ত প্রান্তর ছিল যাকে অজেয় মনে করা হতো। দাওমাতুল জান্দালের শাসক ছিল উকায়দর বিন মালিক। তার রাষ্ট্রের অবস্থান একটি অজেয় এলাকায় থাকায় সে নিজের এলাকাকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় মনে করত। রাসূল (সা.) উকায়দর বিন মালিকের কাছে যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন তিনি এ জবাব নিয়ে ফিরে আসেন যে, উকায়দর বন্ধুত্বের রাখি-বন্ধনও গ্রহণ করেনি আবার কর দিতেও সম্মত নয়। বরং সে প্রকাশ্যে ঘোষণা

করেছে যে, মুসলমানদেরকে সে বড় শত্রু বলে মনে করে এবং ইসলামের ক্ষতি সাধনে সে কোন ত্রুটি করবে না।

রাসূল (সা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-কে তলব করে বলেন, ৪০০ অশ্বারোহী নিয়ে যাও এবং উকায়দর বিন মালিককে জীবিত ধরে আন।

উকায়দর দরবারে সর্বোচ্চ মসনদে আসীন। তার পশ্চাতে বিবস্ত্রপ্রায় দু'তরুণী দাঁড়িয়ে পাখা টেনে বাতাস করছিল। অন্যান্য বাদশার মত উকায়দরের চেহারাও ঝলকিত এবং প্রতাপদীপ্ত।

'ইবনে মালিক!" এক সিনিয়র মন্ত্রী এবং সিপাহসালার দাঁড়িয়ে বলে—"আপনার রাজত্ব দীর্ঘজীবী হোক। ঈলা, যারবা, আজরুহ এবং মুকনানার গোত্রসমূহ মুসলমানদের সাথে মিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার খবর আপনি শুনেছেন কি? আজ তারা মিত্রত্ব বরণ করেছে আর ক'দিন পরে শোনা যাবে তারা কুরাইশী মুহাম্মাদের ধর্মমতও মেনে নিয়েছে।"

"সম্মানিত মন্ত্রী কি এই পরামর্শ দিতে চাচ্ছেন যে, আমরাও মুসলমানদের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে যাই?" উকায়দর বিন মালিক বলে—"এমন কোন পরামর্শ আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।"

"না, ইবনে মালিক! আমি সে পরামর্শ দিচ্ছি না। আমার উদ্দেশ্য হলো"—প্রবীণ মন্ত্রী বলে, "বয়স বেশী হওয়ায় আমার চোখ যা দেখেছে তা আপনার চোখ দেখেনি। আমি বিশ্বাস করি, আপনি মুসলমানদের সবচে বড় দুশমন। কিন্তু আমার কাছে লাগছে, আপনি শত্রুকে এত তুচ্ছ জ্ঞান করছেন যে, তারা বাস্তবে আমাদের উপর আক্রমণ করলে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে আপনি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন না।"

"পবিত্র ক্রুশের শপথ!" উকায়দর বিন মালিক বলে—"আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থানই আমাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে। মুসলমানরা এখানে আসার দুঃসাহস করলে এখানকার ভয়ঙ্কর মরুর তীক্ষ্ণার্ত বালুরাশি তাদের দেহের রক্ত চুষে নিবে। দাওমাতুল যান্দালের চারপাশে যে সমস্ত বালু ও মাটির টিলা রয়েছে খোদা এগুলোকে আমার রাজত্বের অতন্দ্র প্রহরী রূপে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এগুলো অক্ষুণ্ন থাকতে কেউ আমাদের পরাভূত করতে পারবে না।"

উকায়দারের দরবারে যখন এই আলোচনা চলছে, তখন হযরত খালিদ বিন ওলিদ (রা.) চারশ জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে অর্ধেক পথ চলে এসেছেন। পরের দিনই তারা ঐ মরুভূমিতে প্রবেশ করেন ঐতিহাসিকগণ যাকে অজেয় লিখেছেন। এখানে পা দিয়েই মুজাহিদদের চেহারা বালুর ন্যায় শুষ্ক হয়ে যায়। অশ্বের ক্ষীণ

গতিই বলে দিচ্ছিল, এই পথচলা এবং তৃষ্ণা তাদের সহ্যসীমার বাইরে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব তাদের অন্তরে নয়াপ্রাণ সঞ্চার করেছিল।

দাওমাতুল জান্দাল অত্যন্ত মনোলোভা এবং চিত্তাকর্ষক নগরী ছিল। নগরের চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। হযরত খালিদ (রা.) শ্বাসরুদ্ধকর সফর শেষে এই নগর প্রাচীরের কাছে গিয়ে পৌছান। তিনি অশ্বারোহীদেরকে একটি প্রশস্ত নিম্নবর্তী এলাকায় লুকিয়ে রাখেন। সৈন্যদের শারীরিক অবস্থা এত নাজুক ও দুর্বল ছিল যে, কমপক্ষে একদিন একরাত তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে পুরো প্রস্তুত এবং সতর্কাবস্থায় রাখেন।

ইতোমধ্যে সূর্য অস্ত যায়। রাত ক্রমে ঘনীভূত হতে থাকে। শশী দূর আকাশের গায়ে ভেসে ভেসে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে চমকাতে থাকে। মরুভূমির চাঁদের আলো অত্যন্ত নির্মল, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এক সৈন্যকে সাথে নিয়ে নগর প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হন। তিনি ইতোমধ্যে হাল্কা জরিপ চালিয়ে দেখেন যে, এত বড় শহর অবরোধ করতে মাত্র ৪০০ সৈন্য যথেষ্ট নয়। উর্ধ্বে তাদের অন্তরীণ কিংবা নজরবন্দী করা সম্ভব মাত্র। দ্বিতীয় আরেকটি পথ ছিল সরাসরি তাদেরকে লড়ার আহ্বান জানানো।

হযরত খালিদ (রা.) কেল্লার ফটকের কিছু দূরে একটি উঁচু স্থানে বসে থাকেন। চাঁদের আলো এত স্বচ্ছ ছিল যে, প্রাচীরের উপর থেকে হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখা যাবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

হঠাৎ কেল্লার ফটক নড়ে চড়ে ওঠে। দরজার পাল্লা ক্রমেই ফাঁক হয়ে দু'টি দু'দিকে সরে যায়। কেল্লার ফটক এখন উন্মুক্ত। হযরত খালিদ (রা.) ফটক উন্মুক্ত দেখে মনে করেন, হয়ত উকায়দার সসৈন্যে বেরিয়ে আসছে এবং তাদের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু উকায়দারের পেছনে মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহী বের হয়। তারা বেরিয়ে যেতেই ফটক বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় হযরত খালিদ (রা.) এর মনে পড়ে যায় যে, তাবুক থেকে রওয়ানার সময় রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, "শিকাররত অবস্থায় তোমরা উকায়দারের সাক্ষাৎ পাবে।"

উকায়দার বিন মালিক অত্যন্ত শিকার প্রিয় ছিল। শিকারই ছিল তার শখ। তার এই শিকারপ্রিয়তা এত খ্যাতি লাভ করে যে, যেন তার জন্মই হয়েছে শিকারের জন্য। মরু এলাকায় শিকারের সময় ছিল রাত। দিনের বেলায় পশু-প্রাণী লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং আত্মগোপন করে থাকত। ভরা পূর্ণিমা রাত ছিল শিকারের মোক্ষম সময়। রাসূল (সা.) শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে শত্রুর আচার-আচরণ এবং অভ্যাস সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে উকায়দার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছিলেন।

উকায়দার বিন মালিক কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে বেরিয়ে গেলে হযরত খালিদ (রা.) তার উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাচাই করেন। তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে, উকায়দার এখনও জানতে পারেনি যে, ৪০০ মুসলমান তার শহরের নিকটে পৌছে গেছে। আর সে আমোদ-প্রমোদের সাথে শিকার করতে যাচ্ছে। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত ক্রলিং করে করে সাথীকে নিয়ে পিছনে সরে আসেন। উকায়দার অশ্বারোহীদের নিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেলে হযরত খালিদ (রা.) দৌড়ে লুকানো সৈন্যদের কাছে আসেন। তিনি তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য বাছাই করে নেন। অবশ্য সবাই পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তিনি বাছাই করা এই সৈন্যদেরকে নিজের নেতৃত্বে নিয়ে উকায়দারের পথে রওনা হয়ে যান। হযরত খালিদ (রা.) এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন যে, তিনি উকায়দারকে শহর থেকে এত দূরে যাওয়ার সুযোগ দেন যেখানে তাদের উপর আক্রমণ হলে শহরে তার আওয়াজ পৌছবে না।

রাতের পিনপতন নীরবতার মধ্যে এত বেশী ঘোড়ার আওয়াজ চেপে রাখা অসম্ভব ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উকায়দার এবং তার সাথীরা টের পেয়ে যায় যে, তাদের পিছনে অশ্বারোহী আসছে। উকায়দারের ভাই হাসসানও তাদের সাথে ছিল। সে বলে, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি, এরা কারা। সে ঘোড়া ঘুরাতেই হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে একযোগে আক্রমণের নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর সৈন্যদের হুঙ্কার থেকেই উকায়দার বুঝতে পারে যে, আক্রমণকারীরা মুসলমান। হাসসান বর্শার সাহায্যে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মারা যায়।

উকায়দার অশ্বারোহীদের থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে উকায়দারের গতিরোধ করে দাঁড়ান। উকায়দার এমন হতভম্ব হয়ে যায় যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে সে রাস্তা হতে এক পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে। হযরত খালিদ (রা.) অস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত করলেন না এবং ঘোড়ার গতিও রোধ করলেন না। তিনি নিজ ঘোড়াকে উকায়দারের ঘোড়ার পাশ দিয়ে নিয়ে যান এবং পাশ অতিক্রমের সময় উকায়দারের কোমরে হাত দিয়ে শূন্যে উঁচিয়ে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যান।

উকায়দার বিন মালিকের শিকার সঙ্গী এবং বডিগার্ডরা যখন দেখল যে, তাদের নেতা বন্দী এবং তার ভাই মৃত তখন তারা হযরত খালিদ (রা.) বাহিনীর মোকাবিলার পরিবর্তে পলায়নের রাস্তা খুঁজে নিল। স্থানটি গভীর-অগভীর গর্ত এবং টিলা অধ্যুষিত হওয়ায় পলায়নের জন্য বেশ উপযোগী ছিল। ফলে কিছু

লোক আহত হলেও সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। নগরে প্রবেশ করেই তারা দরজা বন্ধ করে দিলো।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) উকায়দারকে আটকে রাখেন এবং কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থামান। তিনি উকায়দারকে জানান, তার পলায়নের সকল পথ রুদ্ধ। কোন সম্ভাবনা নেই। এরপর তিনি তাকে ঘোড়া থেকে নামান এবং নিজেও নেমে আসেন।

"তুমি নিজেকে অজেয় মনে করতে?" হযরত খালিদ (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ, আমি নিজেকে একজন অজেয় হিসেবেই মনে করতাম।" উকায়দার বলে—"কিন্তু আপনার নামটা তো এখনও জানতে পারলাম না।"

"খালিদ!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন—"খালিদ বিন ওলীদ।"

"হ্যাঁ, উকায়দার বলে—"এ নামটা আমি আগেও শুনেছি।...খালিদের পক্ষেই এখানে আসা সম্ভব।"

"না উকায়দার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় ঈমান এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অনাবিল বিশ্বাস লালন করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই এখানে আসতে পারে।"

"আমার সাথে কেমন আচরণ করা হবে?" উকায়দার জানতে চায়।

"তোমার সাথে ঐ আচরণ করা হবে না, যা তুমি আমাদের রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতের সাথে করেছিলে"—হযরত খালিদ (রা.) আরো বলেন—"আমাদের পক্ষ হতে উত্তম ব্যবহারের ব্যাপারে নিশ্চিত থাক ইবনে মালিক! আমরা রোমীয় এবং হিরাক্লিয়াসের প্রেরিত হলে আমরা বলতাম, ধন-দৌলত, শহরের সুন্দরী যুবতী এবং শরাবের ড্রাম আমাদের হাতে তুলে দাও। প্রথমে আমোদ-প্রমোদ করতাম এরপর হিরাক্লিয়াসের নির্দেশ মান্য করতাম।"

"হ্যাঁ। উকায়দার বলে—"আপনারা রোমীয় হলে এমনই করতেন। তারা ঠিক এমনটিই করে থাকে। এমন কোন উপঢৌকন নেই যা আমি হিরাক্লিয়াসকে দেইনি। ওলীদের পুত্র! রোমীয়দের সন্তুষ্ট রাখা আমার অস্তিত্বের জন্য অনিবার্য ছিল।"

"রোমীয়রা এখন কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"বিপদের মুহূর্তে এখন তাদেরকে ডাকতে পার? আমরা তোমার সাহায্য করতে আসব। বন্দী হিসেবে নয়; একজন অতিথি হিসেবে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর কাছে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। জোর করা হবে না।

আমরা শক্রতা নয়; বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে এসেছি। আমাদের রাসূল (সা.)-এর সামনের গিয়ে অবশ্যই তোমার ভুল ভাঙ্গবে যে, এতদিন তুমি যাকে শত্রু মনে করতে তিনি শত্রু নন, বন্ধুর যোগ্য।"

উকায়দার বিন মালিকের মুখ যেন বোবা হয়ে যায়। তার মুখ থেকে কোন কথা সরে না। তার ঘোড়া লক্ষ্যহীনভাবে কোথাও ঘুরছিল। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে উকায়দারের ঘোড়া খুঁজে আনার নির্দেশ দেন। তারা ঘোড়া নিয়ে এলে হযরত খালিদ (রা.) উকায়দারকে তার ঘোড়ায় আরোহণ করান এবং সবাইকে তাবুক অভিমুখে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

তাবুক পৌঁছে হযরত খালিদ (রা.) উকায়দারকে রাসূল (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করেন। রাসূল (সা.) তার সামনে সন্ধির শর্তসমূহ পেশ করেন। কিন্তু এমন কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শর্ত ছিল না, যার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের প্রতি ইশারা ছিল না। তার সাথে মেহমানের মত আচরণ করা হয়। তার উপর কোনরূপ চাপ প্রয়োগ করা হয় না। এই শর্তটি তার খুব মনঃপুত হয় যে, মুসলমানরা তার হেফাজত করবে। উকায়দার কর প্রদানের শর্ত মেনে নিয়ে মিত্রতার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। "কেবল মুসলমানরাই আমার সাহায্য করতে পারে"—চুক্তি স্বাক্ষরের পর সে মন্তব্য করেছিল।

উকায়দার বিন মালিক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে মুসলমানদের কর প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি গোত্রপতি নিজেরাই রাসূল (সা.)-এর কাছে আসে এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপভাবে অনেক দূর-দূরান্তের এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারে চলে আসে এবং সকল গোত্র মুসলমানদের মিত্রগোত্রে পরিণত হয়। এদের অধিকাংশ ইসলামও গ্রহণ করে।

এ বিপুল কূটনৈতিক বিজয়ের পর রোমীয়দের সাথে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাদের অগ্রযাত্রার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়; হিরাক্লিয়াসের জন্য এখন এই আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে রওনা হলে পথের আশে-পাশের গোত্রগুলো তাদের মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার অনেক পূর্বেই মরু এলাকায় খতম করে দিবে।

রাসূল (সা.) মুজাহিদ বাহিনীকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।

৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম সৈন্যরা মদীনায় এসে উপস্থিত হন।

॥ ছয় ॥

নয়া ধর্মমত এবং সমর শক্তির দিক থেকেও ইসলাম এমন এক মহাশক্তিতে রূপ নেয় যে, রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূত যেখানেই যেত তাকে রাষ্ট্রীয়

অতিথি মনে করা হত এবং তার বয়ে আনা বার্তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হত। রাসূল (সা.) মৌখিক দাওয়াতের পাশাপাশি দূরদেশের রাজন্যবর্গের উদ্দেশে দাওয়াতনামা প্রেরণ করতে শুরু করেন। এদের অনেকে ছিল ঔদ্ধত্য, অহংকারী এবং অবিবেচক। তাদের প্রতি রাসূল (সা.)-এর পত্র এ অর্থের হত যে, ইসলাম গ্রহণকে এড়িয়ে যদি সে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চায়, তবে তা পরীক্ষা করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, যুদ্ধে পরাজিত হলে তখন বিনা শর্তে মুসলমানদের পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন গত্যন্তর থাকবে না।

রাসূল (সা.) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে এমনি এক প্রতিনিধি দল ইয়ামানের উত্তরে নামরানে প্রেরণ করেন। বনূ হারেছা বিন কা'ব সেখানকার অধিবাসী ছিল। তারা রাসূল (সা.)-এর পত্রের জবাব দেয় ঠাট্টা-বিদ্রূপাচ্ছলে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) তাদের বিদ্রূপের সমুচিত জবাব দিতে ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ৪০০ অশ্বারোহীর এক সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ইয়ামান রওনা হন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম লেখেন, রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে যাবার সময় বলে দেন যে, তাদেরকে আক্রমণের জন্য নয়; বরং পয়গাম দিয়ে পাঠানো হচ্ছে মাত্র। যেহেতু বনূ হারেছা অবাধ্য প্রকৃতির তাই তাদেরকে পরপর তিনবার দাওয়াত দিতে হযরত খালিদ (রা.)-কে বিশেষভাবে বলে দেয়া হয়। এরপরও যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে; বরং রক্তপাতের পথই বেছে নেয় তখনই কেবল তাদের উপর চড়াও হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

হযরত খালিদ (রা.) এমন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সেখানে গিয়ে পৌছান এবং যে অবস্থায় তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন তাতে বনূ হারেছা ভীষণ প্রভাবিত হয়। ফলে তারা কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই এক প্রকার বিনা বাক্য ব্যয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। হযরত খালিদ (রা.) সাথে সাথে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন ধারা ও আহকাম শিক্ষা দিতে থাকেন। ইতিহাস হযরত খালিদ (রা.)-কে কেবল সমর শাস্ত্রবিদ এবং প্রথম শ্রেণীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করলেও নাযরানে এসে তিনি দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত শুধু ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষায় লিপ্ত থাকেন। যখন তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, এখানকার লোকদের অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল হয়ে গেছে তখন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের দিকে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁর সাথে বনূ হারেছার নেতৃস্থানীয় কিছু লোকও ছিল। তারা রাসূল (সা.)-এর হাতে হাত রেখে পুনঃ ইসলামের উপর বাইয়াত করেন। রাসূল (সা.) তাদের মধ্য হতে একজনকে 'আমীর' নিযুক্ত করেন।

ইসলামের শত্রুরা যখন মর্মে মর্মে অনুধাবন করল যে, মুসলমানদেরকে রণাঙ্গনে পরাজিত সম্ভব নয় এবং তারা এটাও হৃদয়াঙ্গম করল যে, ইসলাম মানুষের রক্ত-মাংসের সাথে মিশে গেছে তখন তারা ইসলামের বিরোধিতায় নয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামের মূলোৎপাটনে এবারের নীলনক্সা প্রণীত হয়। রাসূল (সা.)-এর রেসালাত ও নবুওয়াতের সফলতা দেখে শত্রুপক্ষও বেছে নেয় এ পন্থা। কিছু লোক হুট করে নবুওয়াতের দাবী করে বসে। বনূ আসাদের 'তুলাইহা', বনূ হানীফার মুসায়লামা এবং ইয়ামানের আসওয়াদ আনাসী ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মূল নাম ছিল আকীলা বিন কা'ব। কিন্তু অত্যধিক কালো বর্ণের হওয়ায় লোকে তাকে 'আসওয়াদ' বলে ডাকতে থাকে। আরবিতে আসওয়াদ মানে কালো। অতঃপর এ নামেই সে পরিচিতি লাভ করে। ইয়ামানের পশ্চিম অঞ্চলে 'আনাস' গোত্রের নেতা ছিল সে। এ হিসেবে তাকে 'আসওয়াদ আনাসী' বলা হয়। ইতিহাসেও সে এ নামে স্থান পেয়েছে। সে মন্দিরের জ্যোতিষীও ছিল। কুচকুচে কালো হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝে এমন আকর্ষণ ছিল যে, মানুষ তার ইশারা পর্যন্ত মেনে নিত অবলীলাক্রমে। তার দেহে মুষ্টিযোদ্ধার মত বিশাল শক্তি থাকায় মহিলারা তার কৃষ্ণবর্ণকে অপ্রিয় জ্ঞান না করে বরং আরো কাছে ভিড়ত। তার সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেশার চেষ্টা করত। মন্দিরে থাকার দরুণ সে এই বিশাল জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি লাভ করে। কারণ, তৎকালে মানুষ জ্যোতিষীকে দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট এবং দূত মনে করত।

ইয়ামানের অধিকাংশ এলাকার লোক ইসলামের ছায়াতলে এসে গিয়েছিল। আসওয়াদের গোত্রেও ইসলাম ঢুকে পড়েছিল। আসওয়াদ ইসলামের বিরোধিতায় টু শব্দটি পর্যন্ত করল না। যেন জনতার সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, আসওয়াদ নিজেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

তৎকালে ইয়ামানের শাসক ছিল হাসান নামক এক ইরানী। ইরানের সম্রাট ছিল খোসরু পারভেজ (কিসরা)। রাসূল (সা.) দূর দেশে যাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত পত্র পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ইরানের সম্রাট ছিল অন্যতম। তার কাছে পত্র দিতে রাসূল (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) ইরানপতিকে পত্র হস্তান্তর করলে সে দরবারের দোভাষীকে তার অনুবাদ করে শোনাতে নির্দেশ দেয়।

পত্রের বিবরণ তাকে জানানো হলে সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে সে পত্র টুকরো টুকরো করে বর্জ্যদানিতে নিক্ষেপ করে এবং পত্রবাহক হযরত

আব্দুল্লাহ (রা.)-কে দরবার থেকে বের করে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদীনা ফিরে এসে রাসূল (সা.)-কে জানান যে, ইরান সম্রাট তাঁর পত্র টুকরো টুকরো করে ফেলে দিয়েছে।

পত্র টুকরো করে ইরান সম্রাটের ক্রোধ প্রশমিত হয় না। ইয়ামান ছিল ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আর সেখানকার গভর্নর ছিল বাযান। ইরান সম্রাট বাযান বরাবর এ নির্দেশ প্রেরণ করে যে, হিজাজে (আরবে) মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি রয়েছে। সে নিজেকে নবী বলে দাবী করে। তাকে পারলে জীবিত নতুবা তার মাথা কেটে এনে আমার সামনে পেশ কর।

বাযান পত্র পেয়েই দু'জন লোকসহ পত্র মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। এ দু'পত্রবাহকের উদ্দেশ্য কি ছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর রয়েছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, রাসূল (সা.)-কে জীবিত ধরতে কিংবা হত্যা করে তাঁর মস্তক আনতে বাযান ঐ দু'ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিল। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেন, বাযান ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে এতই প্রভাবিত ছিল যে, রাসূল (সা.)-কে ইরানপতির মতিগতি সম্পর্কে অবগত করাই ছিল বাযানের উদ্দেশ্য। তবে সকল ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে, বাযানের প্রেরিত দু'ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে যায় এবং ইরান সম্রাট যে পত্র বাযানের বরাবর লিখেছিল তা তাঁকে পেশ করে।

রাসূল (সা.) পত্র পড়ে একটুও বিচলিত হন না। তিনি পত্র থেকে মুখ তুলে মুচকি হেসে বলেন, ইরান সম্রাট গতকাল রাতেই নিজ পুত্র শেরওয়াহ-এর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। আজ সকাল থেকে ইরানের সম্রাট শেরওয়াহ।

"গতরাতের হত্যার খবর এত দ্রুত এখানে কিভাবে পৌছল?" বাযান কর্তৃক প্রেরিত দু'জনের একজন জিজ্ঞাসা করে এবং বলে—"এটা কি আমাদের সম্রাটের সুস্পষ্ট অবমাননা নয় যে, এই ভুল খবর ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইরান সম্রাট তার পুত্রের হাতে নিহত?"

"আমার আল্লাহ্ই এ খবর জানিয়েছেন"—রাসূল (সা.) বলেন, "যাও, বাযানকে গিয়ে বল, তার সম্রাট এখন আর খসরু নয়; শেরওয়াহ"। রাসূল (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ হতে এটা জেনেছিলেন।

বাযানের দূত ফিরে গিয়ে তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তিন-চারদিন পর বাযান ইরান সম্রাট শেরওয়াহ-এর পত্র পায়। পত্রে লেখা ছিল, খসরুকে অমুক রাতে হত্যা করা হয়েছে। এটা ঐ রাতই ছিল, যে রাতের কথা রাসূল (সা.) বলেছিলেন। এর কিছুদিন পর বাযান ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত রাসূল (সা.)-এর পত্র পান। বাযান পূর্ব হতে প্রভাবিত ছিল। রাসূল (সা.)-এর 'ইলহাম'

তাকে আরো বেশী প্রভাবান্বিত করে। রাসূল (সা.) তাকে এটাও জানান যে, ইসলাম গ্রহণের পরেও সে যথারীতি ইয়ামানের শাসক থাকবে। তার ভূখণ্ডের নিরাপত্তা মুসলমানরা নিশ্চিত করবে।

বাযান ইসলাম গ্রহণ করে এবং যথারীতি ইয়ামানের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থাকে। অল্প কিছুদিন পরে সে মারা যায়। রাসূল (সা.) এরপরে ইয়ামানকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র শাসক নির্ধারণ করেন। বাযানের পুত্র শাহারকে রাসূল (সা.) সান'আ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।

এই গুজব ডাল-পালা মেলে বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে যে, আসওয়াদ আনাসী 'মাজহাজ' এলাকায় চলে গেছে। খবান নামক এক গুহায় বর্তমানে সে অবস্থান করছে। ক'দিন পর আবার এই গুজব ডানা মেলে সারা ইয়ামানে উড়ে বেড়ায় যে, আসওয়াদ গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং খোদা তাকে নবুওয়াত প্রদান করেছে। এখন সে আর পূর্বের আসওয়াদ আনাসী নয়; 'রহমানুল ইয়ামান'। সংবাদদাতার কণ্ঠে কোনরূপ সন্দেহের সংমিশ্রণ ছিল না। সে পুরো দৃঢ়তার সাথে সংবাদ পরিবেশন করে ফেরে যে, আসওয়াদ নবুওয়াত লাভ করেছে। সে তাকে নবী বলে মেনে নিয়েছে।

"গিয়ে দেখে এস"—সংবাদদাতা এ সংবাদ বলে বেড়াতে থাকে—"বিশ্বাস না হলে মাজহাজে নিজে গিয়ে দেখে এস। রহমানুল ইয়ামান মৃতকে জীবিত করেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে পুষ্পে পরিণত করেন। ...চল, ভাই সবাই চল। আত্মার মুক্তির লক্ষ্যে চল।"

যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের গায়েও গুজবের বাতাস লেগেছিল। সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে তারাও ইয়ামান অভিমুখে ছুটে চলে। পূর্বে আসওয়াদ জ্যোতিষী থাকায় মানুষ প্রথম থেকেই মনে করত যে, দেবতার পক্ষ হতে সে কোন অলৌকিক শক্তিপ্রাপ্ত। ফলে সে নবুওয়াত দাবী করাতে মানুষ তৎক্ষণাৎ তার দাবী সত্য বলে মেনে নেয়।

খবান গুহার সামনে সর্বক্ষণ মানুষের প্রচণ্ড ভীড় লেগে থাকে। উপচে পড়া জনতা আসওয়াদকে এক নজর দেখার জন্য ভীষণ উদগ্রীব ছিল সে দিনের বেলায় সামান্য সময়ের জন্য গুহা হতে বের হতো এবং গুহার নিকটবর্তী একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে কুরআনের আয়াতের মত কিছু আরবি বাক্য শুনাত। সে দাবী করে জানাত যে, তার কাছে এক ফেরেশতার গমনাগমন হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত এ ফেরেশতা তাকে একটি করে আয়াত এবং সেই সাথে কিছু গোপন তথ্য জানিয়ে যায়।

আসওয়াদ উৎসুক জনতাকে কিছু অলৌকিক কারসাজিও দেখায়। জ্বলন্ত মশাল মুখে পুরে আবার জ্বলন্ত অবস্থায় তা বের করত। একটি মেয়েকে শূন্যে লটকে রাখে। এমনি আরো কতিপয় ভেল্কিবাজী দেখায় যা মানুষ দেখে তাকে মোজেযা বলত। তার ভাষা যেমন ছিল আবেগী তেমনি কণ্ঠও ছিল বেশ সুরেলা। তার কথার প্রতিটি বর্ণে আকর্ষণ ছিল, যা শ্রোতাকে দারুণ মুগ্ধ করত।

আসওয়াদ ইয়ামানবাসীদের হৃদয় এ শ্লোগানের মাধ্যমে সহজেই জয় করে নেয় যে, ইয়ামানের মালিক ইয়ামানবাসী। এটা কোন করদ রাজ্য নয়। ইতোপূর্বে ইয়ামান এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইরানীদের শাসনাধীন ছিল। ইয়ামানের শাসক বাযান ইসলাম কবুল করলে ইরানীদের প্রভাব লুপ্ত হয়ে ইয়ামান হিজাযী মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে। এ ছাড়া এখানে ইহুদি, নাসারা এবং অগ্নি-উপাসকরা বাস করত। এরা ইসলামের বিপর্যয় কামনা করত। তারা আসওয়াদ আনাসীর নবুওয়াতের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পর্দার অন্তরালে কলকাঠি নাড়ায়।

আসওয়াদ তার নবুওয়াতের সত্যতা একটি গাধার মাধ্যমে পেশ করত। তার সামনে একটি গাধা আনা হতো। সে গাধাকে নির্দেশ দিত-"বসো"। গাধা বসে যেত। এরপর বলত—"আমার সামনে মস্তক অবনত কর"—গাধা সেজদার ভঙ্গিতে মাথা নোয়ায়ে দিত। গাধার উদ্দেশে তার তৃতীয় নির্দেশ ছিল—"আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বস"—গাধা অমনিই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ত।

ইয়ামানবাসী অতি অল্প সময়ে আসওয়াদ আনাসীকে নবী বলে মেনে নেয়। আসওয়াদ তার ভক্তবৃন্দকে সৈন্যদের মত সুসংগঠিত ও বিন্যস্ত করে ফেলে। সে এ ভক্তবাহিনীকে নিয়ে প্রথমে নাযরান অভিমুখে রওয়ানা হয়। সেখানে হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রা.) এবং হযরত আমর ইবেন হাজম (রা.) রাসূল (সা.) এর পক্ষ হতে শাসক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আসওয়াদের সাথে বিরাট বাহিনী ছিল। বিশাল এ বাহিনী নাযরানে প্রবেশ করলে সেখানকার অধিবাসীরাও তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহরূপ ধারণ করে যে, মুসলিম শাসকদের জন্য পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে দেখে তারা প্রশাসনিক ভবন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

আসওয়াদ আনাসী প্রথম চোটেই বিজয় হাতে পেয়ে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এদিকে তার সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। নাযরানে রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে সে এবার সান'আর দিকে মনোযোগ দেয়। বাযানের পুত্র শাহার ছিল সেখানকার শাসক। সৈন্যসংখ্যা সীমিত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

তার উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায় সৈন্যরা দৃঢ়তার সাথে লড়ে যায়। কিন্তু এ জন্যে শাহারকেও যেহেতু একজন সাধারণ সৈন্যের মত লড়তে হচ্ছিল তাই তিনি এক সময় শহীদ হয়ে যান। তার মৃত্যুতে সৈন্যরাও ভেঙ্গে পড়ে। আসওয়াদ যুদ্ধ জিতে নেয়।

আসওয়াদের মোকাবিলায় ঐ সকল ইয়ামানীও যোগ দেয়, যারা মুসলমান ছিল না। কিন্তু পরাজয়ের অবস্থায় কেবল মুসলমানদের জীবন হুমকির সম্মুখীন ছিল। আসওয়াদ বাহিনীর হাতে তাদের মৃত্যু অনিবার্য ছিল। আসওয়াদের হাত থেকে কোন মুসলমান রেহাই পেত না। ফলে মুসলমানরা সুকৌশলে রণাঙ্গন হতে কেটে পড়ে এবং সোজা মদীনায় গিয়ে পৌছে।

আসওয়াদ আনাসী দুর্বারগতিতে সামনে এগুতে থাকে। হাজরে মওত, বাহরাইন, এহসা এবং আদন পর্যন্ত সমগ্র এলাকা এক এক করে অধিকার করে সে পুরো ইয়ামানের বাদশা হয়ে যায়।

ইসলামের বিরুদ্ধে এটা ছিল এক খোলা চ্যালেঞ্জ। উত্তর দিক হতে রোমীয়দের আক্রমণের আশংকা সবসময় বিদ্যমান ছিল। এদের প্রতিরোধে রাসূল (সা.) এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর মাত্র ২২ বছর বয়সী পুত্র হযরত উসামা (রা.) ছিলেন এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ইতোপূর্বে হযরত যায়েদ (রা.)ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

স্বঘোষিত এক ভণ্ড নবী হতে ইয়ামানকে মুক্ত করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রয়োজন ছিল। মুসলমানদেরও ছিল তেমন বাহিনী। কিন্তু এ বিশাল বাহিনী প্রস্তুত ছিল রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। রোমীয়দের উপর হামলা স্থগিত রেখে ইয়ামানে এ বাহিনী পাঠানো হলে রোমীয়রা এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে খোদ মদীনায় হামলা করতে পারে। তাহলে এটা হবে মারাত্মক বিপর্যয় এবং ভরাডুবি। তাই এ পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়া হয়। রাসূল (সা.) এ বিকল্প চিন্তাও করেন যে, যারা অসহায় হয়ে আসওয়াদের আনুগত্য স্বীকার করেছে, আসওয়াদকে মসনদচ্যুত করতে তাদেরকেই কৌশলে ব্যবহার করতে হবে। কমান্ডারগণ রাসূল (সা.)-এর এই বিকল্প প্রস্তাব সমর্থন করেন। এ লক্ষ্যে কয়েকজন বিচক্ষণ লোক ইয়ামানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাসূল (সা.)-এর তীক্ষ্ণ নির্বাচনী দৃষ্টি হযরত কায়েস বিন হুরায়রা (রা.)-এর উপর গিয়ে পড়ে। রাসূল (সা.) তাকে ডেকে নিয়ে ইয়ামানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝিয়ে দেন। সাথে সাথে এটাও বলে দেন যে, তাকে খুব সতর্ক এবং গোপনে সেখানকার মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে গোপনে একদল

জানবাজ মুজাহিদ তৈরী করতে হবে, যারা ভণ্ড নবী এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ ডুবন্ত স্বঘোষিত বাদশাহকে গদীচ্যুত করবে। রাসূল (সা.) কায়েস বিন হুরায়রা (রা.)-কে আরো বলেন যে, তাকে ইয়ামানে যাবার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে এবং সুদূর ইয়ামান পর্যন্ত তাকে এমনভাবে পৌছতে হবে যেন কেউ না দেখতে পায়।

এই গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাসূল (সা.) আরো পদক্ষেপ নেন। তিনি ওবার বিন ইয়াহনাস (রা.)-কে একটি পত্র দিয়ে ইয়ামানে গিয়ে পত্রটি ইয়ামানের ঐ সমস্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শুনাতে বলেন, যারা পরিস্থিতির চাপে পড়ে আসওয়াদ আনাসীর বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাকে আরো বলে দেন, পত্রটি পাঠ মাত্রই নিশ্চিহ্ন করে দিবে। বাকী যা কিছু করার তা হযরত কায়েস বিন হুরায়রা করবে।

আসওয়াদ আনাসী সান'আতে হামলা করলে সেখানকার গভর্নর শাহার বিন বাযান মোকাবিলা করেন। কিন্তু লড়তে গিয়ে তিনি শহীদ হয়ে যান। আযাদ নামে তার এক যুবতী স্ত্রী ছিল। তার এই স্ত্রী আসওয়াদের হস্তগত হয়। আযাদ অসাধারণ রূপবতী ইরানী কন্যা ছিল। আযাদ আসওয়াদকে স্বামী হিসেবে বরণ করতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু আসওয়াদ জোরপূর্বক তাকে স্ত্রী করে নেয়। আযাদ তাকে প্রচণ্ডরূপে ঘৃণা করত, যার ফলে সে বন্দী হয়ে যায়। এক দুর্বল নারীর পক্ষে কিছু করারও ছিল না। আসওয়াদ অত্যন্ত নারীমোদী ছিল। তার অন্দর মহলে কম করে হলেও বিশ রূপসী সব সময় শোভা বর্ধন করত। বিভিন্ন স্থান থেকে হাদীয়া হিসেবেও তার কাছে অসংখ্য তরুণী আসত। সে সর্বক্ষণ নারী এবং মদের নেশায় বুদ হয়ে থাকত।

রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত হয়ে হযরত কায়েস বিন হুরায়রা (রা.) অত্যন্ত সংগোপনে এবং বেশ-ভূষা বদল করে অবশেষে সান'আ পৌছান। আসওয়াদ সান'আ দখল করে তাকে রাজধানী করেছিল। ওদিকে ওবার বিন ইয়াহনাস (রা.) এক মুসলিম নেতার কাছে পত্র নিয়ে পৌছে যান। ঐ মুসলিম নেতা তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, যারা অন্তর থেকে আসওয়াদের আনুগত্য স্বীকার করেনি এমন কয়েকজন মুসলিম নেতাকে দলে ভিড়ানো মোটেও ব্যাপার নয়। তবে কথা হল, এতে আসওয়াদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সে কেবল বাদশা নয়। ইয়ামানবাসী তাকে নবী বলে মান্য করে।

সান'আ এসে হযরত কায়েস বিন হুরায়রা (রা.) এমন এক স্থানে এসে আস্তানা গাড়েন, যেখানে রাসূল প্রেমিক মুসলমান বিদ্যমান ছিল। তারাও ঐ

জবাব দেয় যা মুসলিম নেতৃবৃন্দ দিয়েছিল। তবে তারা এমন কোন কথা বলে না যে, তারা এই যোগসাজোশে শরীক হবে না। তারা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলে যে, তারা সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে আস্থাভাজন মুসলমানদেরকে এক প্লাটফর্মে এনে সুসংঘবদ্ধ করে তুলবে।

"আমরা এই মিথ্যুক নবীর ভবলীলা সাঙ্গ করতে অধিক অপেক্ষা করতে পারি না।"—এক মুসলমান মন্তব্য করে। "সময় যত বয়ে যাচ্ছে তার গ্রহণযোগ্যতাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা করা যায় না?"

"কে হত্যা করবে?"—আরেক মুসলমান জিজ্ঞাসা করে। "আর কোথায়-ই বা তাকে হত্যা করা হবে? সে তো অন্দর মহল থেকে বের-ই হয় না। আর এটাও জানা কথা যে, তার বাসভবনের চারপাশে কড়া ও নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে।"

"আমাদের মধ্য হতে কেউ তার জীবন বাজি রাখার সংকল্প করতে পারে না?" হত্যা পরামর্শদাতা জিজ্ঞাসা করে।

যাকে হত্যা করা হবে তার কাছেই যদি না পৌঁছা যায় তবে এভাবে জীবন খোয়াবার কি অর্থ হতে পারে?"—অপর মুসলমান পাল্টা প্রশ্ন করে, অতঃপর বলে—"মোটকথা গোপনে আমাদের এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কমপক্ষে বিদ্রোহের একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে তার ঝুঁকি নিতেই হবে।"

আসওয়াদ আনাসী ইয়ামান অধিকার করে সর্বপ্রথম এই পদক্ষেপ নেয় যে, ইরানের শাহী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের যে সমস্ত লোকজনকে আসওয়াদ সানআয় পায়, সবাইকে বিভিন্ন পন্থায় লাঞ্ছিত-অপদস্ত করেছিল। তাদের অবস্থা কেনা গোলামের চেয়েও করুণ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আসওয়াদের রাজত্বে সবচে বড় যে দুর্বলতা ছিল তা হলো, তার অধীনে অভিজ্ঞ কোন সেনাপতি এবং কোন সুদক্ষ প্রশাসকও ছিল না। তারপরে এ আশংকাও তার সবসময় ছিল যে, মুসলমানরা যে কোন আক্রমণ করতে পারে। তার নিজেরও সমরজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। এই দুর্বলতা ও শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে তাকে বাধ্য হয়ে ইরানীদের সাহায্য নিতে হয়।

তার দপ্তরে ৩টি নাম জমা পড়ে। ১. গভর্নর বাযানের সময়কার প্রখ্যাত ইরান সেনাপতি কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুছ। ২. ফিরোজ ও ৩. দাজওয়াহ। এ দু'জন প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলো। ফিরোজ ইতোপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সঠিক অর্থে এবং আন্তরিকভাবেই সে মুসলমান ছিল। আসওয়াদ কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুছকে সেনাপ্রধান পদে নিয়োগ দেয়। আর ফিরোজ ও

দাজওয়াহকে মন্ত্রী বানায়। তিনজনই আসওয়াদের সর্বাত্মক আনুগত্যের শপথ করে এবং তাকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে, তারা যে কোন অবস্থায় তার অনুগত থাকবে।

একদিন ফিরোজ বাইরে কোথাও পায়চারি করছিল। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক এসে তার পথ আগলে ধরে এবং তার দিকে সাহায্যের আশায় হাত বাড়িয়ে দেয়।

"তোমাকে দেখে অক্ষম মনে হয় না"—ফিরোজ তাকে বলে। "যদি তোমার মাঝে কোন অক্ষমতা থেকে থাকে তবে সে অক্ষমতা একমাত্র এটাই যে, তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ এবং ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই।"

"তুমি ঠিকই ধরেছ"—ভিক্ষুক তার প্রসারিত হাত ধীরে সরিয়ে এনে বলে—"আমার অসহায়ত্ব এটাই যে, আমার আত্মমর্যাদা বলতে যা ছিল তা আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।...আর আমার ধারণা মিথ্যা না হলে বলবো, আমার মত তোমার মাঝে এই অসহায়ত্ব বর্তমান। ভিক্ষার জন্য আমি হাত বাড়াইনি। আমার হারানো আত্মমর্যাদাবোধ ফেরৎ চাচ্ছি মাত্র।"

"তুমি পাগল না হয়ে থাকলে তোমর মনের কথা খুলে বল"—ফিরোজ ভিক্ষুকবেশীকে বলে।

"আমার অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর নাম রয়েছে, তুমি যার প্রেমিক"। ভিক্ষুক ফিরোজের চোখে চোখ রেখে বলে—"আসওয়াদ আনাসীর শরাব তোমার পেটে জায়গা না পেয়ে থাকলে আমার এ ধারণা মিথ্যা নয় যে, তুমি অন্তরে পাথর চাপা দিয়ে আসওয়াদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছ।"

ফিরোজ এদিক-ওদিক চায়। সে বুঝে ফেলে ভিক্ষুকবেশী মদীনার একজন মুসলমান। কিন্তু এ আশংকাও সে উড়িয়ে দিতে পারে না যে, লোকটি আসওয়াদের ঝানু গোয়েন্দাও হতে পারে, যে কৌশলে তার মনোভাব যাচাই করছে।

"ঘাবড়িয়ো না ফিরোজ!" ভিক্ষুক বলে—"আমি তোমার প্রতি আস্থাশীল। তুমিও আমার উপর আস্থা রাখ। আমি তোমাকে আমার নাম জানিয়ে দিচ্ছি...কায়েস বিন হুরায়রা...। আমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) প্রেরণ করেছেন।"

"সত্যিই কি আল্লাহ্‌ রাসূল (সা.) তোমাকে আমার কাছে প্রেরণ করেছেন?" ফিরোজ আবেগের সাথে জানতে চায়।

"না", হযরত কায়েস (রা.) বলেন—"রাসূলুল্লাহ (সা.) এ কথা বলেছিলেন যে, সেখানে গেলে আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের দেখা পেয়ে যাবে।"

"তুমি কিভাবে জানলে আমি খাঁটি মুসলমান?" ফিরোজ জিজ্ঞাসা করে।

"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) এর নাম শুনে রাসূল-প্রেমিকদের চোখে যে চমক সৃষ্টি হয় তা আমি তোমার দু'চোখে দেখেছি।" হযরত কায়েস (রা.) বলেন—"তোমার চোখে সে চমক কিছুটা বেশী দেখা যায়।"

ফিরোজ হযরত কায়েস (রা.)-কে এখন চলে যেতে বলে। সে হযরত কায়েস (রা.)-কে আরেক স্থানের ঠিকানা দিয়ে বলে, যেন আগামীকাল সূর্য ডোবার কিছু পূর্বে এই ঠিকানায় এসে ভিক্ষা চাইতে থাকে।

পরের দিন গোধূলী লগ্নে ফিরোজ ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ফিরোজের ইশারায় হযরত কায়েস (রা.) ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে ফিরোজের পিছনে পিছনে হাত লম্বা করে চলতে থাকে।

"আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে জানিয়ে দাও যে, তাঁর নামে জীবন উৎসর্গকারী এক ব্যক্তি আসওয়াদ আনাসীর ছত্রছায়ায় রয়েছে"—ফিরোজ চলার গতি পূর্ববত রেখে কোনদিকে না তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে—"আর আমি ভেবে পাই না যে, বিশাল সমরশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা.) ইয়ামানে এখনও হামলা করছেন না কেন?"

"হিরাক্লিয়াসের বাহিনী উরদুনে আমাদের মাথার উপর দাঁড়ানো।"—হযরত কায়েস (রা.) বলেন, "আমাদের বাহিনী রোমীয়দের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। আমরা দু'জনই কি পুরো সৈন্যের কাজ করতে পারি না?"

"তুমি ভেবে দেখেছ, আমাদের মত দু'জন আর কিইবা করতে পারে?" ফিরোজ জিজ্ঞাসা করে।

"হত্যা"—হযরত কায়েস (রা.) জবাব দিয়ে বলেন, "এ প্রশ্ন না করলে খুশী হব যে, আসওয়াদকে কিভাবে হত্যা করা যেতে পারে। চাচাত বোন আযাদের কথা তুমি বেমালুম ভুলে গেছ?"

ফিরোজ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে। আচমকা তার চেহারায় ভিন্ন রংয়ের স্ফুরণ ঘটে। যেন হঠাৎ রক্ত টগবগিয়ে ওঠে।

"অমানিশার ঘোরে তুমি আমাকে আলোর ঝিলিক দেখিয়েছ"—ফিরোজ বলে, "হত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আমার চাচাত বোনের নাম উচ্চারণ করে তুমি আমার মিশন সহজ করে দিয়েছ। এ কাজ আমি সম্পন্ন করবই।... তুমি নিজের কাজে মনোযোগ দাও।... এখন যাও কায়েস। জীবিত থাকলে পরে আবার সাক্ষাৎ হবে ইনশাআল্লাহ্‌।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ফিরোজের অন্তরে আসওয়াদের প্রতি যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল এবং যে ঘৃণা এতদিন চাপা ছিল তা উথলে ওঠে। সে আসওয়াদ আনাসীর ইরানী সেনাপতি কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুছ এবং মন্ত্রী দাজওয়াহকে

নিজের সমমনা ও সাথী বানিয়ে নেয়। আসওয়াদকে হত্যা করা এক মন্ত্রীর জন্যও সহজসাধ্য ছিল না। আসওয়াদের নিরাপত্তাকর্মী ও দেহরক্ষী বাহিনী সর্বক্ষণ তার চারপাশে থাকত। অনেক ভেবে-চিন্তে এই তিন ইরানী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আযাদকে এই কাজে শরীক করা হবে তবে সে নিজে হত্যা করবে না।

আযাদের সাথে যোগাযোগও সহজ ছিল না। এরই মধ্যে আসওয়াদের কেমন যেন সন্দেহ হয়ে যায় যে, তিন ইরানী তাকে অন্তর থেকে সমর্থন করে না। সে তাদের উপর আস্থা কমিয়ে দেয়। ইতোপূর্বে আযাদ আর ফিরোজের মধ্যে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি।

আযাদ পর্যন্ত পৌঁছার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন নারীর। একজন মন্ত্রীর জন্য একটি মেয়েলোক যোগাড় করা কোন কঠিন কাজ ছিল না। ফিরোজ মহলের আধা বয়স্কা এক মহিলাকে তলব করে। সেও মুসলমান ছিল। ফিরোজ তাকে নিজের বাড়িতে কাজের প্রস্তাব দেয়। সে চাইলে ফিরোজ তাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে পারে। ফিরোজ তাকে কিছু টোপও দেয়। সে তাকে জানায় যে, বর্তমানে তার থেকে যত কাজ নেয়া হচ্ছে এত কাজ নেয়া হবে না। মহিলা সহজেই রাজি হয়ে যায়। ফিরোজ সেদিনই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।

একদা আযাদ একাকী বসা ছিল। সে সর্বক্ষণ ক্রুদ্ধ ও অগ্নিশর্মা থাকত। পরিত্রাণের কোন পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় ফিরোজের সদ্য নিয়োগকৃত বুয়া তার কাছে আসে।

"আমি কাজের বাহানায় এখানে এসেছি"—চাকরানী বলে, "কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এসেছি আপনার কাছে।...রহমানুল ইয়ামানের বর্তমান মন্ত্রী আপনার চাচাত ভাইয়ের সাথে কখনো আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে?"

"তুমি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছ?" আযাদ রাগান্বিত কণ্ঠে বলে।

"না"—চাকরানী বলে, "আমার ব্যাপারে এই সন্দেহ রাখবেন না যে, আমি ঐ ভণ্ড নবীর গোয়েন্দা। আসওয়াদের প্রতি আমার অন্তরে ততখানি ঘৃণা যতখানি আপনার অন্তরে রয়েছে।"

"আমি বুঝতে পারছি না তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?" আযাদ বলে।

"ফিরোজ আমাকে পাঠিয়েছে"—চাকরানী বলে।

"ফিরোজের নামও আমি শুনতে চাই না"—আযাদ বলে, "তার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু থাকলে সে ঐ ব্যক্তির মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করত না, যে তার চাচাত বোনকে বিধবা করে তাকে জোরপূর্বক স্ত্রী বানিয়েছে।"

আযাদ শাহী খান্দানের মহিলা ছিল। চাকর-চাকরানী সম্পর্কে তার যথেষ্ট

অভিজ্ঞতা রয়েছে। এতটুকু কথায় আযাদ নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এই পরিচারিকা গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি। আযাদ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ফিরোজ তার জন্য কি বার্তা প্রেরণ করেছে? পরিচারিকা জানায় যে, তিনি একবার আপনার সাথে দেখা করতে চান মাত্র। আযাদ তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানের কথা জানিয়ে বলে, ফিরোজকে রাতে এখানে আসতে বলবে।

"তবে আমাদের মাঝে একটি দেয়ালের পার্থক্য থাকবে।"—আযাদ বলে, "দেয়ালের এক স্থানে একটি বাতায়ন আছে। এখানে একটি খাম্বাও আছে। ফিরোজ এই খাম্বার অপর দিকে মুখ করে কথা বলতে পারে।"

পরিচারিকা আযাদের বার্তা ফিরোজকে পৌছে দেয়।

ঐ দিন রাতেই ফিরোজ মহলের পার্শ্বস্থ দেয়ালের ঐ স্থানে পৌছে যায় যেখানে খাম্বাবিশিষ্ট ছোট বাতায়ন ছিল। আযাদ ফিরোজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

"তোমার প্রেরীত পরিচারিকার উপর আমার অগাধ আস্থা এসে যায়"—আযাদ কথা শুরু করে, "তা তোমার প্রতি কিভাবে আস্থা রাখতে পারি? আমার বিশ্বাস হয় না যে, তুমি আমাকে ঐ বর্বর-জংলী থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছ।"

"তবে কি তুমি ঐ বর্বরের সাথে সুখেই আছ?" ফিরোজ জিজ্ঞাসা করে।

"তার মত ঘৃণ্য দ্বিতীয় আর একটিও আমার চোখে পড়েনি"—আযাদ বলে, "এখানে তোমার বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। তাড়াতাড়ি বল, এতদিন পর আমার কথা তোমার কেন মনে পড়ল?"

"এ মুহূর্তে আসওয়াদ এদিকে আসার আশংকা রয়েছে?" ফিরোজ জানতে চায়-"না কি সে এখনই তোমাকে...।"

"না"—আযাদ বলে, "প্রহরীদের এসে পড়ার আশংকা করছি আমি। আসওয়াদ এখন মদের নেশায় চুর হয়ে পড়ে আছে। তার অধীনে নারীর সংখ্যা কম নয়।"

"শুধু তোমাকে নয়; পুরো ইয়ামানকে আমি মুক্ত করতে চাই"—ফিরোজ বলে, "কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া আমি সফল হতে পারব না।"

"খুলে বল ফিরোজ!" আযাদ বলে—"আমাকে কি করতে হবে?"

"কোন এক রাতে আমাকে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"—ফিরোজ বলে, "তাহলে প্রভাতে তার লাশ ওখান থেকে বের করা হবে।...বল, পারবে এ উপকারটুকু করতে?"

"আগামীকাল রাতে এই সময়ের কিছু পরে এই দেয়ালের অপর প্রান্তে ঐ

স্থানে আসবে যার কথা তোমাকে বলছি”—আযাদ বলে, “আমার কক্ষ এই দেয়াল সংলগ্ন। অন্য কোন পন্থায় দেয়াল টপকানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। রশি ফেলতে হবে। সাথে করে রশি আনবে। দেয়ালের উপর দিয়ে রশি ছুড়ে দিবে। রশির মাথা আমি এদিকে কোথাও বেঁধে দিব। তুমি রশি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠবে।”

পরবর্তী রাতে ফিরোজ চুপিসারে দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে থাকে। তাকে থেমে থেমে চলতে হচ্ছিল। পাহারাদারদের এড়িয়ে পথ চলতে হয়। অবশেষে সে নির্ধারিত স্থানে এসে পড়ে। সে এসেই রশির একমাথা দেয়ালের উপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। অতি সহজে রশির মাথা দেয়ালের অপর প্রান্তের গিয়ে পড়ে। আযাদ যথাস্থানে অবস্থান করছিল। সে জলদি রশির এ প্রান্ত কোথাও শক্ত করে বেঁধে দেয়। রশি বাঁধা হয়ে যেতেই ফিরোজ রশি বেয়ে বেয়ে এবং দেয়ালের সাথে পা চেপে চেপে দেয়ালের উপর উঠে যায়। এরপর রশি দেয়ালের উপর কোথাও বেঁধে রশি বেয়ে বেয়ে অনায়াসে নীচে নেমে আসে।

আযাদ তাকে নিজ কামরায় নিয়ে যায় এবং অর্ধ রাত পর্যন্ত সেখানেই তাকে লুকিয়ে রাখে। এর পূর্বে বের হলে আসওয়াদের টের পাওয়ার আশংকা ছিল।

“অর্ধেক রাতের পর সে অবচেতন এবং নেশায় বুঁদ হয়ে যায়”—আযাদ আসওয়াদের ব্যাপারে ফিরোজকে জানায়—“লোকটা রীতিমত মানুষরূপী দৈত্য। যে দৈত্য শুধু মদ পিপাসু এবং নারীখোর।... তুমি তার দৈহিক কাঠামো দেখেছো। এত লম্বা-চওড়া শরীরের কাছে তলোয়ারের এক-দু' আঘাত শরাবের এক-দু' চুমুকের মত। তাকে শেষ করা সহজসাধ্য হবে না।”

“নিজেকে শেষ করে হলেও তাকে শেষ করতেই হবে”—ফিরোজ বলে।

আযাদ কক্ষের দ্বার মৃদু উন্মোচন করে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে। পারিচারিক ভবনের মাথায় এক প্রহরী দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। এখন প্রহরীকে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ছায়া দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এখন তার মুখ দরজার অপর দিকে। আযাদ পা টিপে টিপে বের হয়ে আসওয়াদের কক্ষের দরজা খুলে। মৃদু রশ্মি ছড়িয়ে একটি ঝাড়বাতি মিটমিট করে জ্বলছিল। আসওয়াদ শয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে জোরে জোরে নাক ডাকছিল।

ঐতিহাসিক বালাজুরী তৎযুগের দু'হস্তলিপির উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, আযাদ আসওয়াদকে দেখে এত উত্তেজিত হয়ে ফেরে যে, তার চোখ-মুখ দিয়ে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ঠিকরে বের হচ্ছিল। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এটা ছিল দীর্ঘ চাপা ক্ষোভের ভয়াল বিস্ফোরণ এবং একরাশ ঘৃণার স্ফুলিঙ্গ।

“এস ফিরোজ!” সে উত্তেজনায় কম্পিত কণ্ঠে বলে—“সে অচেতন পড়ে

আছে।"

ফিরোজ আযাদের সাথে কামরা থেকে বের হয় এবং পা টিপে টিপে আযাদের পিছু পিছু আসওয়াদের কামরায় গিয়ে প্রবেশ করে। আসওয়াদ জংলী পড়ের মত দীর্ঘদেহী ছিল। কক্ষ ভরপুর ছিল মদ এবং পাপাচারের বিভিন্ন সামগ্রী দ্বারা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, এমনটি কেন হল! আসওয়াদ হঠাৎ জেগে যায়। মন্ত্রী এবং রূপবতী ইরানী স্ত্রীকে দেখে সে থতমত খেয়ে উঠে বসে। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, আযাদের প্রতি তার পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু ফিরোজকে দেখে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

"এ সময় আবার কি মুসিবত এল?" নেশায় ঢুলুঢুলু অবস্থায় আসওয়াদ জিজ্ঞাসা করে।

ফিরোজ এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে না। চোখের পলকে তলোয়ার কোষমুক্ত করে এবং সজোরে আসওয়াদের গর্দান লক্ষ্য করে আঘাত হানে। আসওয়াদ শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে গর্দান বাঁচাতে সক্ষম হলেও ভরপুর আঘাত গিয়ে লাগে তার মাথায়। আসওয়াদের মুখ থেকে এক তীব্র আত্মচিৎকার বেরিয়ে যায়। সে চিৎকার দিয়েই শয্যার অন্য পাশে গড়িয়ে পড়ে।

পরিচারক ভবনে ভারী পদশব্দ শোনা যায়। আযাদ দ্রুত এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রহরী দৌড়ে আসছিল। আযাদ দ্রুত এগিয়ে এসে প্রহরীর পথ আগলে ধরে। কক্ষ থেকে তখনও আসওয়াদের গোঙানীর মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছিল।

"স্বস্থানে ফিরে যাও"—আযাদ প্রহরীকে নির্দেশের ভঙ্গিতে বলে—"রহমানুল ইয়ামানের কাছে ফেরেশতা এসেছে। বর্তমানে ওহী নাযিল হচ্ছে।...যাও, এদিকে আসার প্রয়োজন নেই।"

ঐতিহাসিক বালাজুরী লেখেন, আযাদের কথায় প্রহরী আশ্বস্ত হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে দেয় এবং চলে যায়।

আযাদ প্রহরীকে বিদায় করে এসে দেখে আসওয়াদ নীচের কার্পেটে পড়ে রয়েছে। আর ফিরোজ দ্বিতীয় আঘাত করার জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে। আসওয়াদ কার্পেটে লুটিয়ে পড়ে। তবে তার মাথা পালঙ্কের সাথে লেগে ছিল এবং তা ষাড়ের মত নড়ছিল।

"তুমি তাকে মেরে ফেলতে পারবে না ফিরোজ!" আযাদ সামনে এগিয়ে এসে বলে এবং আসওয়াদের মাথার লম্বা চুল দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে নীচের দিকে টান দেয় এবং নিজে বেড়ে উঠে বসে। যখন আযাদের প্রচেষ্টায় আসওয়াদের গর্দান এমন পর্যায়ে আসে যে, ফিরোজ অতি সহজে তার গর্দানে আঘাত করতে পারে তখন আযাদ বলে—"এবার চালাও ফিরোজ...গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে ফেল।"

ফিরোজ এক কোপে আসওয়াদের গলা কেটে মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফিরোজের সাথী কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুছ এবং দাজওয়াহ এর জানা ছিল যে, আজ রাতে কি ঘটতে যাচ্ছে। ফিরোজ আসওয়াদের দেহ তুলে নেয় এবং সোজা সাথীদ্বয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছে। আযাদ ফিরোজের সাথে সাথে মহল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রহরীরা রহমানুল ইয়ামান-এর হত্যার সংবাদ পেয়েই পুরো মহল ঘিরে ফেলে। শান্ত মহল অল্প সময়েই অশান্ত হয়ে ওঠে। পুরো মহলে হুলস্থুল পড়ে যায়। হেরেমের নারীরা আতংকে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়।

ওদিকে রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত হযরত কায়েস বিন হুরায়রা (রা.) এবং হযরত ওবার বিন ইয়াহনাস (রা.) নেতৃস্থানীয় মুসলমানদেরকে বিদ্রোহের পর্যায়ে রেখেছিলেন। দিন-রাত অবিরাম তৎপরতা চালিয়ে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চাঙ্গা করে রেখেছিলেন।

সোবহে সাদিকের তখনও কিছু সময় বাকী। মহলের ছাদ থেকে আযানের উচ্চকিত ধ্বনি ইথারে-পাথারে আছড়ে পড়ে। খোদ মহলে আযানের ধ্বনি উঠায় লোকজন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। জনতা মহল অভিমুখে ছুটে আসে। আসওয়াদের ফৌজ হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। হুকুমদাতা ছিল কায়েস বিন আব্দে ইয়াগুছ। সেই সর্বাধিনায়ক। সে সৈন্যদেরকে ব্যারাক হতে বাইরে আসতে দেয় না।

আসওয়াদের কর্তিত মস্তক বাইরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মহলের ছাদ থেকে এ আওয়াজ ক্রমেই জোরালো হচ্ছিল-"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র সত্য রাসূল আর আসওয়াদ আনাসী মিথ্যাবাদী।"

আসওয়াদের ভক্তকুল ঘটনার আকস্মিকতায় দারুণ ভড়কে যায়। তাদের চোখে-মুখে নেমে আসে আতংকের পর্দা। ওদিকে মুসলমানরা সশস্ত্র হয়ে চতুর্দিকে বাজের মত ছড়িয়ে পড়ে। তারা ইয়ামানীদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করতে শুরু করে।

মিসরের সাবেক মন্ত্রী মা'আরেফ মুহাম্মদ হুসাইন স্বীয় গ্রন্থ *আবু বকর সিদ্দীকে আকবর* এ ফিরোজের একটি জবানী তুলে ধরেছেন। ফিরোজ বলেছিল:

আসওয়াদের হত্যার পর সেখানকার সকল ব্যবস্থাপনা পূর্ববৎ রাখা হয়। যেমনটি চলছিল আসওয়াদের জীবদ্দশায়। আমরা হত্যার পর সর্বপ্রথম যে কাজ করি তা হলো, হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রা.)-কে ডেকে জামাতের সাথে নামায পড়ানোর অনুরোধ করি।...ইসলামের এক বড় শত্রুকে এভাবে সহজে

নাস্তানাবুদ করতে পেরে আমরা বেজায় খুশি ছিলাম। কিন্তু এ খুশীর হিল্লোল পড়তে না পড়তে খবর আসে যে, রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বেদনাবিধুর এ খবরে সারা ইয়ামানে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ইয়ামানবাসী শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। তাদের আনন্দ সম্পূর্ণ উবে যায়। জনজীবনে অঘোষিত অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং চরম স্থবিরতা নেমে আসে। সব মিলিয়ে শেষ খবরের ফুৎকারে জনতার আশার প্রদীপ দপ করে নিভে যায় এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পাতা সহসা ফিকে হয়ে যায়।"

সান'আবাসীর মুক্তির জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুঃসাহসিক অবদান রাখায় মুসলমানরা ফিরোজকে সান'আর গভর্নরের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ঘটনা এটি। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তায় হযরত কায়েস বিন হুরায়রা (রা.) এবং হযরত ওবার বিন ইয়াহনাস (রা.) এই সুসংবাদ নিয়ে মদীনা পৌঁছে যে, ভণ্ড নবীর ভবলীলা সাঙ্গ এবং বর্তমানে পুরা ইয়ামানে ইসলামের পতাকা শোভা পাচ্ছে। কিন্তু মদীনা তখন ছিল শোকে মুহ্যমান। মাত্র ক'দিন পূর্বে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে মোতাবেক ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল আল্লাহ্র রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছেন।

॥ সাত ॥

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর অগ্নিগোলকে রূপ নেয়। যেখানেই এই খবর পৌঁছে সেখানেই আগুনের শিখা ওঠে। এটা ছিল বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ইসলামের শত্রুরা ময়দান খালি পেয়ে সামনে চলে আসে। বিভিন্নমুখী নাশকতামূলক কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। নেতার দেখাদেখি মুসলমান হওয়া কিছু গোত্রও নড়েচড়ে ওঠে। যারা আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল কম। শুধু মুখে মুখে বা প্রাণ বাঁচাতে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল বেশী। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালে এ শ্রেণী কেবল ইসলামচ্যুতই হয় না; তারা মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেয় এবং মদীনায় হামলা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করতে থাকে।

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী সালতানাতের কর্ণধার ও রাসূল (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত নির্বাচিত হন। তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নেবার পূর্বেই চারদিকে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। যেন আচমকা কোন ঝড়ে আগুনের উপর থেকে ছাই উড়ে গিয়ে নিচের চাপা আগুন বেরিয়ে আসে। সর্বপ্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) বিদ্রোহী কবিলাগুলো বরাবর ধৈর্য ও সহনশীলতার বার্তা প্রেরণ করেন। তাদেরকে ইসলাম বর্জন না করার আহ্বান জানান। দূত সকল স্থান থেকে কেবল এই জবাব নিয়ে ফেরে যে,

আমাদের ইসলাম গ্রহণ রাসূল (সা.)-এর সাথে ব্যক্তিগত চুক্তির ব্যাপার ছিল মাত্র। যখন তিনি নাই তখন সে চুক্তির কার্যকারিতা অটোমেটিক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা কাদের সাথে জুড়ে দিব সে ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার কারো নেই। এটা সম্পূর্ণ আমাদের ইখতিয়ারভুক্ত। এখানে অন্যের হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চার শামিল।

ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করতে যে বিপর্যয় প্রবল তুফানের ন্যায় ধেয়ে আসে তা হলো *ধর্মান্তরিতের ফিৎনা*। এক শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ছেড়ে অন্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুরতাদ হয়ে যেতে থাকে। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই এ ফিৎনা সর্বপ্রথম মাথাচাড়া দেয়। কতিপয় ভণ্ড নবুওয়াতকে সস্তা জনপ্রিয়তার বাহন মনে করে নিজেকে নবী বলে দাবী করে বসেছিল। তিন দুষ্ট চক্র-রোম, ইরান এবং ইহুদীবাদ তাদের মদদ জোগায়। তাদেরকে নিজ দাবীতে অটল এবং ভণ্ডামী জোরে সোরে অব্যাহত রাখতে তারা সাহস, শক্তি, বুদ্ধি, জনবল, প্রচারণা ইত্যাদি পর্যায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। ভণ্ড নবীদের একেক জন ছিল একেক এলাকার। তথাপি তাদের মধ্যে একটি ব্যাপারে অপূর্ব মিল ছিল। অর্থাৎ সকলের মধ্যে একটি গুণ সমভাবে ছিল। প্রত্যেকে ভেল্কিবাজী এবং নজরবন্দীতে পটু ছিল। ইহুদীবাদ হতে সকলে এ বিদ্যাটি রপ্ত করেই তবে মাঠে নামে। কোমলমতি জনগণকে সহজে প্রভাবিত ও তাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করতে 'যাদুনাটক' অব্যর্থ অস্ত্র ছিল। ইতোপূর্বে আসওয়াদ আনাসীর আলোচনা চলে গেছে। সেও ভেল্কিবাজী এবং নজরবন্দীতে পারঙ্গম ছিল। জনতাকে অভিভূত ও প্রভাবিত করতে সে অনেক ভৌতিক কারসাজি জনগণকে দেখাত।

নবুওয়াতের অপর দু'দাবীদার ছিল তোলাইহা এবং মুসাইলামা। নজরবন্দীতে মুসাইলামা যথেষ্ট দক্ষ ছিল। সে অদ্ভুত অদ্ভুত অভূতপূর্ব যাদু প্রদর্শন করত। সে পাখীর দেহ থেকে পাখনা পৃথক করে একহাতে পাখী আর অপর হাতে পাখনা নিয়ে উপরে ছুড়ে দিত। আশ্চর্যজনকভাবে পাখনা পাখীর দেহে গিয়ে স্থাপিত হতো আর পাখী দেহে পাখনা পেয়ে উড়াল দিত।

মুসাইলামা কদাকৃতির মানুষ ছিল। তার চেহারা দেখে মনে হত এটা কোন পশুর চেহারা। মুখাকৃতিও ছিল পশুর মত। দেহ খর্বাকৃতির এবং বর্ণ ছিল পীত। দেখতে কদাকার হলেও দেহে ছিল অসুরের শক্তি। চোখ ছোট ছোট এবং নাক চ্যাপ্টা। সব মিলে এত বেঢপ এবং কুৎসিত ছিল তার চেহারা যে, যে কোন কুদর্শন মানুষও তাকে অপছন্দ করত। তবে সুন্দরী ললনা হোক কিংবা বেয়ারা নারী হোক একবার তার সান্নিধ্যে এলেই তার পরশ ভক্ত হয়ে যেত এবং সে তার অঙ্গুলী হেলনে উঠা-বসা করত।

মুসাইলামা নবী করীম (স.)-এর জীবদ্দশাতেই নবুওয়াতের দাবী করেছিল এবং দু'পত্রবাহকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ভাষায় একটি পত্র লিখেছিল "

"মুসাইলামা রসূলুল্লাহ-এর পক্ষ হতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এর প্রতি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরবার্তা এই যে, আমাকে রেসালাতের সম অংশীদার করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অর্ধ ভূখণ্ড আমার আর বাকী অর্ধাংশ কুরাইশদের। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুরাইশরা ইনসাফ করছে না।"

রাসূল (সা.) পত্র পাঠ করে পত্র বাহকদের কাছে জানতে চান যে, মুসাইলামার এহেন বিচিত্র ও অদ্ভুত বার্তার ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিগত অভিমত কি?

"পত্রে যা লেখা আছে আমরা তা সমর্থন ও স্বীকার করি"—এক পত্রবাহক জবাব দেয়।

"আল্লাহ্র কসম!" রাসূল (সা.) বললেন—"দূত হত্যা অপরাধ না হলে এতক্ষণ তোমাদের কর্তিত মস্তক ধূলায় গড়াগড়ি খেত।"

রাসূল (সা.) মুসাইলামার এই পত্রের জবাব নিম্নরূপ ভাষায় লেখান "

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হতে মিথ্যুক মুসাইলামার প্রতি-

বিশ্বের সমস্ত ভূখণ্ড আল্লাহ্র। তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন।

এরপর থেকে মুসাইলামার নামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যোগ হয় কাজ্জাব তথা মিথ্যুক শব্দটি। ইতিহাসের পাতায়ও সে এ বিশেষণে বিশেষিত।

রাসূল (সা.) এ সময় অন্তিম পীড়ায় শায়িত ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর কাছে ভূখণ্ড দাবী করতে পারে এমন দুঃসাহসী ব্যক্তির অপতৎপরতা এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনই মিটিয়ে দেয়া জরুরী মনে করেন। তাঁর দৃষ্টি নাহারুর রিযাল নামক এক সাহাবীর উপর পড়ে। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের উপর গভীর জ্ঞান রাখতেন। জ্ঞানী এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

রাসূল (সা.) লোকটিকে ডেকে ইয়ামামায় যেতে বলেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন। তিনি আর রিযালকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেন যে, ইয়ামামা থেকে যে কোন মূল্যে মুসাইলামার প্রভাব ও তৎপরতা রুখা চাই। যাতে কোনরূপ রক্তপাত ছাড়াই লোকটি জনমন থেকে হারিয়ে যায় এবং তার দাবীর অসারতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ পালনে আররিযাল ইয়ামামাহ অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

মুসাইলামা বিন হাবীব উরফে মুসাইলামা কাজ্জাব রাতে স্বীয় দরবারে আসীন। শরাব পানের জমজমাট আসর চলছিল। তার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দরবারে বসা। সকলেই মুসাইলামাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে মানত। ইসলামই ছিল তার ধর্মমত। তবে কিছুটা ছাড় ও শিথিলতা প্রদান করেছিল। সে একটি জাল আয়াত বানিয়ে ভক্তদের শুনায় এবং বলে যে, তার উপর ওহী নাযিল হয়েছে যে, এখন থেকে মদ হালাল। এ ছাড়া অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস সামগ্রী ব্যবহারও সে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল।

তার দরবার জান্নাতের সাজে সজ্জিত ছিল। সুন্দরী-রূপসী তন্বী তার ডানে-বামে বসা ছিল। পিছনেও ছিল দু'জন দাঁড়িয়ে। মুসাইলামা কোন ললনার রেশমী চুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কারো নিটোল তুলতুলে রক্তাভ গালে হাত বুলিয়ে এবং কারো উরুতে হাত রেখে কথাবার্তা বলত।

এক ব্যক্তি দরবার কক্ষে প্রবেশ করে। সে না বসে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলের দৃষ্টি তার দিকে ঘুরে যায়। মুসাইলামা তার দিকে তাকানোর আদৌ প্রয়োজন অনুভব করে না। তার জানা ছিল, কারো অনুরোধ ছাড়াই লোকটি বসে পড়বে। কিন্তু আগন্তুক দাঁড়িয়েই থাকে।

"তুমি আমাদের পাহারা দিতে এসেছ?" মুসাইলামা আগন্তুককে বলে, "নাকি আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুমতি ব্যতিরেকে বসাকে তুমি অভদ্রতা মনে করছ?"

"আল্লাহ্‌র রাসূল!" আগন্তুক বলে—"আমি একটি খবর দিতে চাই।...মদীনা হতে একজন লোক এসেছে। সে অনেক দিন থেকে এখানে আছে। যারা ইতোপূর্বে কোন সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিল লোকটি তাদেরকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করছে যে, একমাত্র সত্য রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)। বাকী সমস্ত নবুওয়াতের দাবীদার ভণ্ড এবং মিথ্যুক। আমি নিজ কানে তার কথা শুনেছি। তার নাম নাহারুর রিযাল।"

"নাহারুর রিযাল?" দরবারে উপবিষ্ট দু'ব্যক্তি একযোগে চমকে উঠে নামটি উচ্চারণ করে। অতঃপর একজন বলে—"সে মুসলমানদের রাসূলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। আমি তাকে ভাল করে চিনি। লোকটি বড় বিদ্বান।

"এমন ব্যক্তিকে জীবিত রাখা ঠিক নয়"—দরবারে বসা এক ব্যক্তি গর্জে উঠে বলে।

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" আরেক ব্যক্তি বসা থেকে দাঁড়িয়ে বলে—"আপনি অনুমতি দিলে তার মাথা কেটে এনে আপনার পায়ের কাছে রাখব।"

"না"—মুসাইলামা কাজ্জাব বলে—"সে আলেম হয়ে থাকলে এবং কুরআন

সম্বন্ধে জ্ঞান রাখলে আমি তাকে দরবারে এসে আমাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে আহ্বান করব। আমি তাকে নিহত হতে দিব না।...কাল রাতে তাকে আমার কাছে আনবে। তাকে আমার পক্ষ হতে নিশ্চয়তা দিবে যে, তাকে আর যাই হোক হত্যা করা হবে না।"

আররিযালকে মুসাইলামার জনৈক ব্যক্তি জানায় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল মুসাইলামা বিন হাবীব তার দরবারে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

"সে আমার হত্যার ব্যবস্থা এদিকে কোথাও করতে পারে না?" আররিযাল বলে—"আমি তাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বিশ্বাস করি না। তার নির্দেশ পালন করা আমার পক্ষে জরুরী নয়।"

"সে যেখানে ইচ্ছা তোমাকে হত্যা করাতে পারে" মুসাইলামার দূত বলে—"তার এ শক্তিও রয়েছে যে, তার এক ফুঁ-তে তোমার দেহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। কিন্তু তার ইচ্ছা তোমাকে হত্যা করা নয়; বরং জীবিত রাখা এবং সম্মানের সাথে বিদায় করা।"

মুসলমানরাও আররিযালকে মুসাইলামা কাজ্জাবের দরবারে না যাবার পরামর্শ দেয়।

"এটা আমার জীবন ও মৃত্যুর কোন প্রশ্ন নয়"—আররিযাল বলে—"এটা সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন। এক মিথ্যাবাদীর চোখের সামনে সত্যের পতাকা তুলে ধরতে আমার প্রাণ চলে গেলেও তা বেশী চড়া মূল্যের হবে না।"

"আমি অবশ্যই যাব"—আররিযাল দূতকে জানিয়ে দিয়ে বলে—"আজ রাতেই আসব। মুসাইলামাকে বলবে, সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে যেন নিজ অঙ্গীকার থেকে পিছু না হটে।"

দূত মুসাইলামা কাজ্জাবকে সবকিছু জানায়। আররিযাল ইয়ামামাহ এর কেল্লাতেই থাকত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা তাবারী (রহ.) লেখেন, মুসাইলামা তার বিশেষ মেহমানদের জন্য বড়ই চিত্তাকর্ষক তাঁবু স্থাপন করত। দূর থেকে এটাকে ঘর মনে হত। তাঁবুটি অভ্যন্তর থেকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে এবং রঙ-বেরঙের কাপড় দ্বারা সুসজ্জিত করা হত। মরুভূমির রাতে ঠাণ্ডা ঝরে পড়ত। এ কারণে তাঁবুতে দৃষ্টিনন্দন বহ্নিদানীও রাখা হত। এই বহ্নিদানীতে মুসাইলামা এমন কোন পদার্থ ছেড়ে দিত, যা একদিকে সুগন্ধির কাজ দিত অপরদিকে এ সুগন্ধিতে এমন মাদকতা মিশ্রিত ছিল যা তাঁবুতে শায়িত ব্যক্তিকে বাস্তবজগৎ থেকে কাল্পনিক জগতে নিয়ে যেত এবং তার স্বাভাবিক বাহ্যজ্ঞান ও অনুভূতি লুপ্ত করে তার মন-মানসিকতা নবচেতনা ও প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন করে

দিত। লোকটি বেহুঁশ কিংবা অবচেতন হত না ঠিকই কিন্তু স্বাভাবিক বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে সে কাঠের পুতুলে পরিণত হত। তখন সে মুসাইলামার ইশারায় চলত। মুসাইলামাকে শিকার করতে এসে নিজেই তার শিকারে পরিণত হত। মুসাইলামা ছিল এক পাক্কা খেলোয়াড় ও শিকারী।

মুসাইলামা কাজ্জাব আররিযাল আসছে জেনে গতানুগতিক বিশেষ তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেয়। পূর্বে যে পন্থায় তাঁবু সাজাত ঠিক সেভাবে সবকিছু সুসজ্জিত করে। বহ্নিদানীও সঠিক স্থানে রাখতে ভুলে না।

আররিযাল এলে মুসাইলামা এগিয়ে গিয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

"একজন রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তিত্ব আপনি"—মুসাইলামা তাকে বলে—"আর আমিও একজন রাসূল। ফলে আপনার সম্মান করা আমার কর্তব্য।"

"আমি কেবল তাকেই রাসূল বলে বিশ্বাস করি যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন" আররিযাল বলে—"আর একথা বলতেও আমার বুক কাঁপবে না যে, তুমি একজন ভণ্ড ও মিথ্যুক বৈ নও।"

মুসাইলামা মুচকি হাসে এবং আররিযালকে সুসজ্জিত তাঁবুতে নিয়ে যায়।

ইতিহাস এ ব্যাপারে নিরুত্তর যে, তাঁবুর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মুসাইলামা এবং আর রিযালের মধ্যে কি আলোচনা হয়। কেমন সমঝোতা বা কোন ধরনের যাদু সে তার উপর চালায় যে, আররিযাল আগামী প্রভাতে তাঁবু থেকে যখন বের হয় তখন তার প্রথম মন্তব্য ছিল-"নিঃসন্দেহে মুসাইলামা আল্লাহ্র রাসূল। তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়।" সে একথাও বলে যে—"আমি মুহাম্মাদকেও একথা বলতে শুনেছি যে, মুসাইলামা সত্য নবী।"

আররিযাল একজন সাহাবী ছিলেন। ফলে মুসলমানরা তার কথায় সহজেই আস্থা স্থাপন করে। বনূ হানীফার সাথে আররিযালের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আররিযালের নতুন ঘোষণা শুনে বনূ হানীফা দলে দলে মুসাইলামাকে আল্লাহ্র রাসূল বিশ্বাস করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে থাকে।

ঐতিহাসিকদের অভিমত, মুসাইলামা এ কারণে আররিযালকে হত্যা করে না যে, আররিযাল যেমন প্রাজ্ঞ আলেম ছিল তেমনি সাহাবীও ছিল। ফলে তার ধারণা ছিল, এমন ব্যক্তিকে হত্যা না করে তাকে কব্জা করতে পারলে তার ভক্তকূলের সংখ্যা দারুণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে মুসাইলামা আররিযালকে হাত করতে বহ্নিদানী এবং জবানের যাদু চালায়। আররিযাল মুসাইলামার যাদুতে এমনভাবে ফেঁসে যায় যে, সে রীতিমত তার দক্ষিণ হস্তে পরিণত হয়। ভণ্ডামীর নয়া দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

আররিযালের সুবাদে মুসাইলামার মিথ্যা নবুওয়াতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

ভণ্ডামী নতুন গতি পায়। মুসাইলামার জনপ্রিয়তা একধাপ এগিয়ে যায়। ভণ্ডামীর ইতিহাস নতুন দিগন্তে মোড় নেয়। আররিযাল রাসূল (সা.)-এর কাছে থাকাকালে দেখেন যে, পিতা-মাতা তাদের নবজাত সন্তানদের রাসূল (সা.)-এর কাছে আনলে তিনি বাচ্চাদের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিতেন। আররিযাল মুসাইলামাকেও এভাবে বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলাতে পরামর্শ দেয়। আররিযালের এই পরামর্শ মুসাইলামার মনঃপুত হয়। সে কয়েকটি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, শিশুকালে যাদের মাথায় মুসাইলামা হাত বুলিয়ে দেয় তারা বড় হলে তাদের মাথার চুল শীতকালের গাছের পাতার মত ঝরে যায়। চকচকে টাক পড়ে যায় সবার মাথায়। একটি চুলও সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। মুসাইলামা ততদিনে মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল।

॥ আট ॥

ইসলামের এ ক্রান্তিলগ্নে এক মহিলাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ময়দান উর্বর মনে করে সেও নবুওয়াতের দাবী ক. । মহিলার নাম সায্যাহ্। জনৈক হারেছের কন্যা। উম্মে সাদরাহ্ বলেও মহিলাটির পরিচিতি ছিল। তার মাতা ইরাকী এবং পিতা বনূ ইয়ারবু এর অন্তর্গত ছিল। হারেছ ছিল গোত্র প্রধান। সায্যাহ শৈশবকাল থেকেই নির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা ছিল। নেতৃস্থানীয় বংশে তার জন্ম ও প্রতিপালন হওয়ায় অন্যদের উপর হুকুম চালানো তার বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবের অন্তর্গত ছিল। অস্বাভাবিক মেধা এবং বিচক্ষণ ছিল সে। দু'এক ঐতিহাসিকের মত হলো, সে অদৃশ্য জ্ঞানও রাখত এবং দূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে না ঘটবে আগাম বলে দিতে পারত। তার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মতান্তর থাকলেও সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সায্যাহ্ জন্মগতভাবে কবি ছিল। যে কোন কথা ছন্দবদ্ধ আকারে পেশ করতে পারত। তার জবান ছিল অতিশয় সুমিষ্ট এবং আকর্ষণীয়। তার মাতা খ্রিস্টান বংশের থাকায় সায্যাহ্ও খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে।

তোলাইহা এবং মুসাইলামা নবুওয়াতের দাবী করেছে শুনে এবং মানুষ দলে দলে তাদের হাতে বাইয়াত হচ্ছে জেনে সায্যাহ্ও নবুওয়াতের দাবী করে। কৈশোর পেরিয়ে সে এখন টগবগে তরুণী। অন্যান্য গুণাবলীর সাথে আল্লাহ্ তাকে অপূর্ব সুন্দরীও করেছিল। তার আপাদমস্তক এবং চেহারায় এমন ঝল্‌ক ও দীপ্তি ছিল যে, মানুষ তাকে দেখে সম্মোহনীর মত তাকে নবী বলে মেনে নিত। অনেকে তার কাব্য প্রতিভা দেখেও মোহিত হয়।

সে নবী হয়েই কেবল বসে থাকে না। নিজ অনুসারী এবং ভক্তদের নিয়ে

একটি ফৌজ তৈরী করে বনূ তামীমের কাছে যায়। এ গোত্রের নেতারা রাসূল (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত ছিল। যাবারকান বিন বদর, কায়েস বিন 'আসেম, ওকী ইবনে মালেক এবং মালিক বিন নাবীরা ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সায্যাহ মালিক বিন নাবীরাকে ডেকে বলে যে, সে মদীনা আক্রমণ করতে এসেছে। বনূ তামীমের সহযোগিতা তার একান্ত প্রয়োজন।

মালিক বিন নাবীরা জানায় যে, কয়েকটি গোত্র সায্যাহ্কে পছন্দ করে না। প্রথমে তাদেরকে অধীন করতে হবে। সায্যাহ্ অধীন করার অর্থ বুঝতে পারে না। তার অধীনে উল্লেখযোগ্য এবং বাছাইকরা সৈন্য ছিল। মালিক তার সৈন্যের সাথে নিজের সৈন্য মিলিয়ে দেয় এবং যারা তাকে সমর্থন করে না তাদের গোত্রে আক্রমণ করে। গোত্রগুলো এক এক করে তার সামনে হাতিয়ার সমর্পণ করে দেয়। সায্যাহ্ তাকে নবী বলে মেনে নেয়ার দাবী করার পরিবর্তে অস্ত্রসমর্পণকারীদের ঘর-বাড়িতে অবাধ লুটপাট চালায় এবং তাদের গবাদি পশু ছিনিয়ে নেয়। এই মালে গনিমত পেয়ে তার সৈন্যরা বেজায় খুশী হয়।

তার লুটপাটের খবর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সায্যাহ্ নাবায নামক এক এলাকায় পৌঁছে স্থানীয় বসতিতে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে বসতির লোকজন সুসংঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায় এবং সায্যাহ্ বাহিনীকে পরাস্ত করে। সায্যাহ্ পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে চায় কিন্তু একটি দুর্বলতা তার ইচ্ছা রুখে দেয়। পরাজয়কালে তার কিছু নেতৃস্থানীয় সৈন্যকে নাবায গোত্রের লোকেরা বন্দীশালায় আটকে রেখেছিল। সায্যাহ্ তাদের মুক্ত করতে এক দূত প্রেরণ করে।

"আগে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও", গোত্রের শীর্ষ নেতা দূতকে বলে— "এলাকা ছেড়ে গেলেই তোমাদের বন্দীদের মুক্ত দেখতে পাবে।"

সায্যাহ্ এ শর্ত মেনে নেয় এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের মুক্ত করে ঐ এলাকা থেকে প্রস্থান করে। নেতারা সায্যাহ্ এর কাছে পরবর্তী গন্তব্য জানতে চায়।

'ইয়ামামাহ"—সায্যাহ উত্তরে বলে—"সেখানে মুসাইলামা বিন হাবীব নামে একজন লোক আছে। সেও নবুওয়াতের দাবী করছে। তাকে তরবারীর মাথায় রাখা জরুরী।

"কিন্তু ইয়ামামাহ এর লোকজন যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে বড় পাকা"—এক নেতা সায্যাহ্কে বলে—"আর মুসাইলামাও বিরাট শক্তিধর।"

সাযযাহ নেতার কথায় কান না দিয়ে কিছু পংক্তি আওড়ায়। যাতে সে সৈন্যদের জানিয়ে দেয় যে, আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ইয়ামামাহ।

মুসাইলামা কাজ্জাবের গোয়েন্দা বহু দূর এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। চৌকস গোয়েন্দারা যথাসময়ে মুসাইলামাকে অবহিত করে যে, একটি বাহিনী ইয়ামামাহ অভিমুখে ছুটে আসছে। মুসাইলামা অতি শীঘ্র এ ধেয়ে আসা বাহিনীর পরিচয় উদ্ধার করে যে, তারা সায্যাহ্ এর লস্কর। সে আররিযালকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠায়।

"শুনেছ সাযযাহ্ এর লস্কর আসছে আররিযাল?" মুসাইলামা বলে—"কিন্তু তার সাথে সংঘর্ষে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। তোমার জানা আছে যে, এ এলাকায় মুসলিম বাহিনী আছে। হযরত ইকরামা (রা.) তাদের সিপাহসালার। এ পরিকল্পনা কি যথার্থ নয় যে, সায্যাহ্ আর ইকরামা বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হোক। তারা যখন একে অপরের মুণ্ডুপাতে তৎপর হবে ঠিক ঐ মুহূর্তে আমি আমার বাহিনী নিয়ে উভয় পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হবে আমাদের।"

"তারা পরস্পরে মুখোমুখী না হলে তখন কি করবেন?" আররিযাল জিজ্ঞাসা করে।

"তখন সায্যাহ্ এর প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিব"—মুসাইলামা নিরুদ্বেগে জবাব দেয়।

আররিযালের ধারণাই সঠিক হয়ে সামনে আসে। সায্যাহ্ আর ইকরামার ফৌজ পরস্পরের ব্যাপারে অনবহিত ছিল। এদিকে সাযযাহ্ আসতে আসতে ইয়ামামাহ্ এর কাছে চলে আসে প্রায়। মুসাইলামা এক দূত মারফৎ সায্যাহ্ এর বরাবর এই বার্তা প্রেরণ করে যে, পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সে যেন মুসাইলামার বাসভবনে আসে। সায্যাহ্ দূতকে জানায় যে, সে অচিরেই আসছে। সাযযাহ্ রওয়ানা হতেই মুসাইলামা শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জানতে পারে যে, সে স্বসৈন্যে আসছে। মুসাইলামা তৎক্ষণাৎ সায্যাহ্-এর কাছে এ বার্তা প্রেরণ করে যে, সৈন্যদের সাথে নিয়ে এলে বুঝব তুমি মৈত্রী চুক্তির নিয়তে আসছ না। ঊর্ধ্বে কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী আনতে পার মাত্র।

"সম্মানিত রাসূল!" মুসাইলামার এক সভাষদ তাকে বলে—"শুনেছি সাযযাহ্ এর সৈন্য এত বিশাল যে, তারা ইচ্ছা করলে ইয়ামামাহর একেকটি ইট খুলে ফেলতে পারে।"

"এটাও শুনেছি", আরেক সভাষদ বলে—"যে, সে হত্যা, ত্রাস এবং লুটতরাজ করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়। তার করাল গ্রাস থেকে সেই নিরাপদ থাকে যে তার নবুওয়াত মেনে নেয়।"

"তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?" মুসাইলামা জিজ্ঞাসা করে—"তোমাদের

বক্তব্যের উদ্দেশ্য কি আমাকে এই পরামর্শ দেয়া যে, নবুওয়াতের দাবী হতে সরে এসে আমি যেন তার নবুওয়াত স্বীকার করে নিই?"

"না, আল্লাহ্র রাসূল!" সভাষদের আসন থেকে জওয়াব আসে—"আমরা সতর্কতার কথা বলছি মাত্র। আমাদের অজান্তে সে যেন কোন অঘটন না ঘটিয়ে বসে।"

মুসাইলামা সভাষদের এ কথায় ফিক করে হেসে উঠে বলে—"আমার কদাকার চেহারা দেখে সম্ভবত তোমরা আমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছ। এমন কোন নারীর কথা বলতে পার যে আমার কাছে এসেছে অথচ আমার ভক্ত হয়ে যায়নি?...সায্যাহকে আসতে দাও। সে আসবে কিন্তু যাবার নাম বলবে না এবং জীবিতও থাকবে।"

সায্যাহ সৈন্য ছাড়াই এসে পড়ে। ইয়ামামাহ্র জনতা তাকে এক নজর দেখে অভিভূত হয়ে যায় এবং চতুর্দিক হতে আওয়াজ ওঠে—"এত রূপসী এবং লাবণ্যময় নারী ইতোপূর্বে কখনো দেখিনি।...সৌন্দর্যের ভিত্তিতে নবুওয়াত পাওয়ার হলে এ নারী তার যথার্থ উপযুক্ত।"

সায্যাহ-এর সাথে চল্লিশজন দেহরক্ষী ছিল। সকলেই আরবি উন্নত জাতের তাজিঘোড়ায় আসীন। সবাই সুদর্শন এবং টগবগে। কোমরে তরবারী ঝুলছিল সবার। হাতে শোভা পাচ্ছিল চকচকে বর্শা।

সায্যাহ কেল্লার প্রধান ফটকে পৌঁছলে দরজা বন্ধ ছিল। তাকে দেখেও কেউ দরজা খুলে না।

"মেহমানকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে যে ব্যক্তি সে কিভাবে আল্লাহ্র রাসূল হতে পারে?" সাযযাহ জোরকণ্ঠে বলে—"তার কি জানা নাই যে, এভাবে সে স্পষ্ট ঐ নারীকে অপমান করছে আল্লাহ্ যাকে নবুওয়াত দান করেছেন?"

"সম্মানিত অতিথিনী!" কেল্লার উপর থেকে একটি কণ্ঠ শোনা যায়—"আপনি সুখী ও দীর্ঘজীবি হউন। আমাদের রাসূল নিরাপত্তা রক্ষীদের বাইরে থাকতে এবং মেহমানদের ভেতরে যেতে বলেছেন।"

"দরজা খুলে দাও"—সায্যাহ নির্ভীকচিত্তে নির্দেশ দিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীদের বলে—"তোমরা কেল্লা হতে অনেক দূরে চলে যাও।"

"কিন্তু এক অজানা ব্যক্তির উপর আমরা কিভাবে আস্থা রাখতে পারি?"—নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান বলে।

"সূর্যাস্ত নাগাদ আমি না ফিরলে এই কেল্লাকে ছাতু বানিয়ে ফেলবে"—সায্যাহ বলে—"নগরের একটি বাচ্চাকেও জ্যান্ত রাখবে না। মুসাইলামা এবং

তার পরিবারবর্গের তাজা রক্তে আমার লাশ স্নাত করে এখানে কোথাও সমাহিত করবে।...তবে আমার বিশ্বাস, আমি কেল্লা হতে বিজয়িনীর বেশে বের হব।"

নিরাপত্তা রক্ষীরা চলে গেলে কেল্লার মুখ খুলে যায়। কিন্তু সায্‌যাহ এর অভ্যর্থনার জন্য সেখানে মুসাইলামা ছিল না। তার নির্দেশে দরজায় দাঁড়ানো দুই ঘোড় সওয়ার তাকে কেল্লার আঙ্গিনায় নিয়ে যায়। সেখানে বৃত্তকার একটি তাঁবু স্থাপিত ছিল। তার আশে-পাশে বড় বড় এবং চারাগাছ ছিল। নিচে ছিল সতেজ শ্যামলিমা ঘাস। সায্‌যাহকে তাঁবুতে আসন গ্রহণ করতে বলা হয়। অভ্যন্তরের সাজ-সজ্জা তাকে অভিভূত করে দেয়। তবে মুসাইলামা সেখানে ছিল না। সায্‌যাহ তাঁবুতে বসে পড়ে।

ক্ষাণিক পর মুসাইলামা তাঁবুতে প্রবেশ করে। সাযযাহ তাকে দেখে মুচকি হাসে। সে হাসিতে বিদ্রূপ মাখানো ছিল। মুসাইলামার মত কুৎসিত চেহারার মানুষ ইতোপূর্বে তার নজরে পড়েনি। এমন খর্বাকৃতির মানুষ কালে-ভদ্রে নজরে পড়ে থাকে।

"আপনি নবুওয়াতের দাবী করেছেন?"—সায্‌যাহ তাকে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করে।

"দাবীর বিষয়টি ভিন্ন প্রসঙ্গ!"—মুসাইলামা সাযযাহ এর চোখে চোখ রেখে বলে—"তবে এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরীত রাসূল। মুহাম্মাদকে আমি রাসূল বলে স্বীকার করি না। কিন্তু সে কৌশলে তার নবুওয়াত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। জনতা তাকে এই জন্য রাসূল মানে যে, কুরাইশদের সংখ্যা বেশী এবং তাদের শক্তিও প্রচুর। তারা এখন অন্যান্য এলাকা অধিকার করতে শুরু করেছে।"

ঐতিহাসিক তাবারী কয়েকটি সূত্রের বরাত দিয়ে লেখেন, মুসাইলামা সায্‌যাহ-এর চোখে নিজের চোখাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ঠোঁটে নাচতে থাকে হৃদয়কাড়া মুচকি হাসি। অনেক দিন পর সায্‌যাহ মুসাইলামার ঐ দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে খোলামেলা ভাষায় স্বীকার করে যে, মুসাইলামা তার ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ আমার চোখে রাখলে আমার মনে হতে থাকে খর্বাকৃতির কোন ছায়া এবং কুৎসিত একটি চেহারা তরল পদার্থ হয়ে চোখের রাস্তা দিয়ে ভেতরে ক্রমে নেমে আসছে। তার এই অদ্ভুত ও অর্থপূর্ণ চাহনী আমাকে নিশ্চিত করে এ লোক আমাকে হত্যা করবে না। আরো কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আমার মনে হচ্ছিল নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে হয়ত এখনই আমি তার মাঝে বিলীন হয়ে যাব।

"আপনি নবী হয়ে থাকলে কোন ঐশী কথা বলুন"—সায্‌যাহ তাকে বলে।

"আপনার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে আপনি কখনো ভেবেছেন?" মুসাইলামা কবিতা

আওড়ানোর ভঙ্গিতে বলে—"আপনি সম্ভবত এটাও ভাবেননি যে, আপনি যেভাবে সৃষ্টি হয়েছেন আপনার থেকেও এভাবে অনেকে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আপনার একার পক্ষে তা সম্ভব নয়...। এ তথ্য আমার প্রভুই আমাকে জানিয়েছেন। মুসাইলামা তাকে কুরআনের আয়াতের মত কিছু শব্দ শোনায়।—"তিনি এক জীবিত সত্তা থেকে আরেক জীবন সৃষ্টি করেন। পেট থেকে, নাড়িভুড়ি থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আরো জানিয়েছেন, নারীরা পাত্রের মত। যাতে কোনকিছু রেখে আবার বের করা হয়। এমনটি না হলে সে পাত্র অনর্থক।"

সায্যাহ অভিভূত হতে থাকে। সে সম্মোহনীর মত তার কথা গিলতে থাকে। মুসাইলামা কবির ভাষা-ভঙ্গিমায় কথা চালিয়ে যায়। সায্যাহ ঘুণাক্ষরেও টের পায় না যে, মুসাইলামা তার আবেগ চাঙ্গা ও উজ্জিবীত করে চলেছে। সে তার কথায় এত তন্ময় হয়ে যায় যে, কখন যে সূর্য ডুবে গেছে তার খেয়ালই করেনি।

"আমার বিশ্বাস, আপনি আজকের রাতটি এখানে থেকে যেতে চাইবেন"—মুসাইলামা বলে—"চেহারার বিচারে নিঃসন্দেহে আপনি দিন আর আমি রাত। কিন্তু ভাবা উচিত, দিনের উপর রাতের প্রাধান্য পাওয়ার কারণ কি? দিন তার বুকের ধন সূর্যকে রাতের কোলে কেন ছেড়ে দেয়? এটা প্রতিদিনের চিত্র। এর জন্য সুনির্দিষ্ট ক্ষণ-সময় রয়েছে। রাতের এ শক্তি নেই যে, সে সূর্যের ঔজ্জ্বলতা আর দীপ্তিকে হজম করে ফেলবে। রাতের কোলে ঘুমিয়ে পড়া সূর্যকে বড় আদর করে জাগিয়ে সে পর প্রভাতের জন্য পূর্বাচলে রেখে আসে। যেন ঠিক সময়ে উঠে দিনের যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারে।"

"ঠিক বলেছেন আপনি"—সায্যাহ অভিভূতের মত বলে—"আমার অন্তর চায়, আমি আপনাকে সত্য নবী মেনে নিই। এত কদাকার পুরুষ কখনো এমন সুন্দর ও বাস্তবসম্মত কথা বলতে পারে না। এটা অদৃশ্য কোন শক্তির কারবারই হবে, যে আপনার মুখ থেকে এমন সুন্দর কথা বলাচ্ছে।" হঠাৎ সে চমকে উঠে বলে—"সূর্য অস্ত গেছে। এখন আমি কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আমার নিরাপত্তা বাহিনীকে যদি না জানাই যে, আমি জীবিত আছি তাহলে তারা এ বসতির অলি-গলিতে রক্তের নদী বইয়ে দিবে।"

মুসাইলামা দু'বডিগার্ড দিয়ে তাকে কেল্লার প্রাচীরে পাঠিয়ে দেয় এবং তাঁবুর বহ্নিদানী জ্বালিয়ে দিতে খাদেমদের নির্দেশ দেয়। রঙিন ঝাড়বাতিও জ্বলে উঠে। অপরূপ আলোর ঝলকে হেসে ওঠে পুরো তাঁবু। তাঁবুর গাম্ভীর্য ও আকর্ষণশক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। যে কোন চোখ ধাঁধানো এবং হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টির জন্য তাঁবুটি ছিল একশভাগ সার্থক। সায্যাহ এর আবেগকে আরো উত্তাল এবং তাকে আরো প্রভাবিত করতে মুসাইলামা বহ্নিদানীতে ক্ষুদ্রাকৃতির কি যেন দেয়।

ক্ষণিকের মধ্যে কামরা মাতাল করা ঘ্রাণে মৌ মৌ করে ওঠে। সারা কক্ষ খুশবুতে ছাপিয়ে যায়।

সায্যাহ্ তাঁবুতে ফিরে এলে এক অবর্ণনীয় মাদকতায় তার মন মানসিকতা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সে নিজ অবস্থান ভুলে সাধারণ নারীর মত আবেদনপূর্ণ কথা বলতে থাকে। তার কণ্ঠে আগের সেই দৃঢ়তা ছিল না। সেখান থেকে এখন অনুনয় ঝরে পড়ছিল। মুসাইলামা এই অবস্থা থেকে পূর্ণ ফায়দা উঠায়।

"আমাদের স্বামী-স্ত্রী হয়ে যাওয়াই কি ভাল হয় না?" মুসাইলামা সায্যাহ্ এর চোখে আরেকবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে জিজ্ঞাসা করে।

"এর থেকে উত্তম প্রস্তাব আর হতে পারে না"—সায্যাহ্ বিমোহিত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

পর প্রভাতে যখন সায্যাহ্ বের হয় তখন মনে হচ্ছিল কনে তার পছন্দের স্বামীর সাথে বাসর রাত উদযাপন করে বের হচ্ছে। সারা কেল্লায় বিয়ের শানাই বাজে। সায্যাহ এর বাহিনী এক সময় খবর পায় যে, সায্যাহ্ মুসাইলামার সাথে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

এই বিবাহ্ ইসলামের জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠে। উভয় ফৌজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী থাকে না। জলদি ভেঙ্গে যায়। কারণ, মুসাইলামা সায্যাহ এর সাথে চরম প্রতারণা করে। ফলে সে ভগ্নহৃদয়ে পিত্রালয় এলাকা ইরাক চলে যায়। সায্যাহকে বিবাহ্ করা ছিল মুসাইলামার এক কূটনৈতিক চাল। সে শক্তিক্ষয়ের পরিবর্তে সায্যাহ্ এর হৃদয়জয়ের মাধ্যমে এক নিশ্চিত বিপদের মূলোৎপাটন করে। সাযযাহ মুসাইলামার কপট আচরণে মনে এত আঘাত পায় যে, নবুওয়াতের দাবী থেকেই সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। পরে সে মুসলমান হয়ে কুফায় চলে গিয়েছিল। সে দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং খোদাভীরু ও বিদূষী মহিলা হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে।

॥ নয় ॥

রাসূল (সা.)-এর ইন্তিকালে চতুর্দিকে বিদ্রোহ এবং চুক্তিলঙ্ঘনের প্রাদুর্ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তুফানের গতিতে এসব ফিৎনা মদীনাপানে ধেয়ে আসতে থাকে। একটি তুফান সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতেই ওঠে। প্রথম খলীফা নির্বাচনের জটিল পথ চেয়ে এ তুফানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। খেলাফতের দাবীদাররা নিজেদের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে ইসলামের উপর তাদের অবদান তুলে ধরে। খেলাফতের দাবীতে মুহাজির এবং আনসাররা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সামনে আসে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায় না। সমস্যা জটিল ও গুরুতর পথে মোড় নিলে প্রথম সারির প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত সমস্যা নিরসনে উদ্যোগী

হন। হযরত আবু বকর (রা.) অনেক তর্ক-বিতর্কের পর হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর উপর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ন্যস্ত করে বলেন, তারা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যাকে প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন, সবাই যেন তাকে মেনে নেয়।

"মুহাজিরদের মধ্যে আপনি সর্বোত্তম"—হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.) পরস্পর আলোচনা শেষে হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রথম খলীফা মনোনীত করে বলেন—"নবীজীর হিজরতের সঙ্গী আপনি। গুহায় আপনিই ছিলেন তাঁর সাথে। রাসূলের অসুস্থকালীন সময়ে আপনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে নামায পড়িয়েছেন। দ্বীনি আহকামের মাঝে নামাযের স্থান সর্বোর্ধ্বে। আমরা আপনার থেকে অধিক মর্যাদাবান আর কাউকে দেখি না। নিঃসন্দেহে আপনিই খেলাফতের সবচে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব।"

একথা বলেই হযরত উমর (রা.) হাত বাড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপরে হযরত আবু উবায়দা (রা.), তারপর হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) বাইয়াত হন। এরপর সর্বসাধারণ্যে প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম ঘোষণা করা হলে মানুষ দলে দলে তাঁর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য ছুটে আসে। মসজিদে নববীতে চলে সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠান। খেলাফত লাভ করে হযরত আবু বকর (রা.) এক জনগুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া প্রথম ভাষণে ইসলামের সর্বপ্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.) বলেন :

প্রিয়, দেশবাসী! আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, খেলাফতের পদে আসীন হওয়ার আগ্রহ আমার কখনো ছিল না। অন্তরে অন্তরে কিংবা প্রকাশ্যে এর জন্য কখনো আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিনি। কিন্তু শুধু এ কারণে এ গুরুভার নিজ দুর্বল কাঁধে বহন করেছি যেন মতবিরোধ বিবাদের রূপ পরিগ্রহ না করে। নতুবা এটাই বাস্তব কথা যে, খেলাফত এবং শাসনকার্য উপভোগ করার মত কোন বিষয় নয়। এটা এমন এক ভারী বোঝা যা বহন করার শক্তি আমার কম। আল্লাহ্ পাকের সাহায্য ছাড়া এ বোঝা বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনারা আমাকে আমীর বানিয়েছেন। আমি আপনাদের থেকে উত্তম এবং মর্যাদাবান নই। কোন ভাল ও জনহিতকর কাজের উদ্যোগ নিলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে কোন অন্যায় ও জনক্ষতিকর পদক্ষেপ নিলে আমাকে বাঁধা দিবেন। যারা অসহায়-নিঃস্ব তাদের ন্যায্য পাওনা আমি পূর্ণমাত্রায় আদায় করব। তাদের অসহায়ত্ব ঘুচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হবে। পক্ষান্তরে যারা সচ্ছল তারা ন্যায্য হক ছাড়া কিছু পাবে না। আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে

চললে আপনারা আমাকে মেনে চলবেন। কখনো বিপথগামী হলে আমাকে বর্জন করবেন।"

হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়ে সর্বপ্রথম যে নির্দেশ জারী করেন, তাতে সবাই চমকে ওঠে। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী অচিরেই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে। কারণ, মদীনার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। আশে-পাশে শত্রুরা কিলবিল করছিল। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালে সকলের ডানা গজিয়েছিল। আর সে ডানায় ভর করে শত্রুরা উড়াল দিয়ে ইসলামের সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড ও তছনছ করে দিতে উন্মুখ ছিল। অপরদিকে রোমীয়দের সাথে যুদ্ধ ছিল এক বিরাট ও ঘোরতর যুদ্ধ। এরজন্য মুসলমানদের পূর্ণ শক্তি একত্রীকরণ ও বিপুল সমরায়োজনের প্রয়োজন ছিল। মুসলমানদের যথেষ্ট সমর শক্তি ছিল। ছিল সুসংঘটিত এবং দৃঢ়চেতা বিশাল এক বাহিনী। রোমীয়দের সাথে যুদ্ধের সম্ভাব্য রণাঙ্গন ছিল মদীনা হতে যোজন মাইল দূর। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমুদয় সৈন্য এত দূরে পাঠানো ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ মদীনার অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। অনেক গোত্র বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অনেকে সংঘটিতও হতে শুরু করে। ইহুদি-খ্রিস্টানরা অপতৎপরতায় আদাজল খেয়ে নামে। এ ছাড়া মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদাররা পৃথক পৃথক রণক্ষেত্র খুলেছিল। তোলাইহা বিশেষত মুসাইলামা কাজ্জাব রীতিমত এক উদ্বেগজনক সমরশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোটকথা ইসলাম স্মরণকালের ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবাক করা এ আকস্মিক নির্দেশের পটভূমি এই ছিল যে, তাবুক এবং মুতা যুদ্ধের পরে রাসূল (সা.) এটা জরুরী মনে করেন যে, রোমীয়দের প্রতি এখনই হামলা চালিয়ে তাদের শক্তিও নিঃশেষ করে দেয়া উচিত। ইতোপূর্বে তাবুক এবং মুতা যুদ্ধ এই সুফল বয়ে এনেছিল যে, এর মাধ্যমে ঐ সমস্ত গোত্র অনুগত হয়ে যায়, যাদের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল যে, তারা রোমীয়দের সাথে হাত মিলাবে। আর এভাবে একটি শক্তশালী মুসলিম বিরোধী যুদ্ধফ্রন্ট খুলে যাবে। রোমীয়দের সম্ভাব্য সহযোগী শক্তি চূর্ণের পর এবার প্রয়োজন ছিল খোদ রোমীয়দের উত্থিত ফনা পিষ্ট করা ও বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়া। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহসী সিদ্ধান্ত সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ছিল না, বরং অস্তিত্ব ও মতাদর্শ রক্ষাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামের বিরোধিতায় রোমীয়দের ক্যাম্পে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিল।

রাসূল (সা.) জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে রোমীয়দের উপর হামলার উপযোগী মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। হযরত

যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর পুত্র হযরত উসামা (রা.) এ বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত হন। তাঁর বয়স তখন সর্বোচ্চ হলে কুড়ি বছর ছিল। ঐতিহাসিকদের অভিমত, রাসূল (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি তারুণ্যের মাঝে নেতৃত্ববোধ ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রেরণা সৃষ্টি করতে চান। মুসলিম তারুণ্য শক্তি উসামা চেতনায় উজ্জীবিত ও তাঁর মত যোগ্যতা-দক্ষতা অর্জন করে রণাঙ্গনে সফল নেতৃত্ব দিতে অনুপ্রাণিত হবে—এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে রাসূল (সা.) অন্তিম মুহূর্তে এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলে টগবগে তরুণ হযরত উসামা (রা.)-এর হাতে তার নেতৃত্ব সোপর্দ করেন।

হযরত উসামা (রা.) রাসূল (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করতেন। তাঁর পিতা হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) মুতা যুদ্ধে শহীদ হন। শৈশবকালেই হযরত উসামা (রা.)-এর মাঝে সৈনিকসুলভ সকল গুণাগুণ এবং বীরত্ব এসে গিয়েছিল। ওহুদ যুদ্ধের সময় তিনি ছোট থাকায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পান না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তিনি রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে কোথাও আত্মগোপন করে থাকেন। সেনাবাহিনী সে স্থান দিয়ে গমন করলে তিনি চুপিসারে সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে তাদের সাথে মিশে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে কোন পন্থা ও মূল্যে যুদ্ধে শরীক হওয়া। কিন্তু তার এই অদম্য স্পৃহা পূরণ হয় না। ময়দানে পৌঁছে তিনি নজরে পড়ে যান। ফলে তাকে সেখান থেকেই ফেরৎ পাঠানো হয়। অবশ্য হুনায়ন যুদ্ধে তিনি দুঃসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। হার না মানা যুদ্ধ ইনিংস খেলে তিনি সকলকে দেখিয়ে দেন যে, বাহাদুরী কাকে বলে। এক তরুণ যোদ্ধা কিভাবে বজ্র হয়ে শত্রু শিবির মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারে।

রোমীয়দের মোকাবিলায় বিশাল বাহিনী গড়ে তুলে রাসূল (সা.) নেতৃত্বভার হযরত উসামা (রা.)-এর কাঁধে অর্পণ করলে কিছু লোক এই আপত্তি উথাপন করে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর মত শীর্ষ মর্যাদাবান্ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যে বাহিনীতে বিদ্যমান তার নেতৃত্ব সেদিনের এক বাচ্চার হাতে অর্পণ করা মোটেও সমীচীন নয়।

মানুষের এই সমালোচনা ও অভিযোগ রাসূল (সা.)-এর কানে ঐ সময় পৌঁছে যখন তিনি মৃত্যুপীড়ায় শায়িত এবং বারবার জ্বরে মূর্ছা যাচ্ছেন। এ সময় তাঁর কথা বলার শক্তিও ছিল না। জ্বরের উপশমের জন্য তিনি স্ত্রীদেরকে গোসল করিয়ে দিতে বলেন। প্রচুর পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেয়া হলে জ্বর অনেকটা নেমে যায়। অবশ্য দুর্বলতা ছিল বেশ। তারপরেও তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে বহু লোক সমবেত ছিল। সমালোচনাকারী এবং অভিযোগ আরোপকারীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল।

"প্রিয় জনতা!" রাসূলুল্লাহ (সা.) জনতার উদ্দেশ্যে বলেন—"উসামা বাহিনীকে নির্বিবাদে যেতে দাও। তার নেতৃত্বের কারণে তোমরা সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছ। ইতোপূর্বে তাঁর পিতার উপরেও তোমরা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলে। আমি উসামাকে এই পদের যোগ্য মনে করি। তাঁর পিতাকেও এ পদের যোগ্য মনে করেছিলাম। তোমাদের ভাল করেই জানা আছে যে, তাকে সেনাপতি বানানো আমার ভুল পদক্ষেপ ছিল না।"

রাসূল (সা.)-এর ভাষণে সমালোচনা মুখ থুবড়ে পড়ে। সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। হযরত উসামা (রা.)-কে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই নেতা মেনে নিয়ে রোমীয়দের উদ্দেশে উসামা বাহিনী রওনা হয়ে যায়। কিন্তু এ বাহিনী যারফ নামক স্থানে পৌঁছলে সংবাদ আসে যে, রাসূল (সা.)-এর অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক। যুবক বয়সেই হযরত উসামা (রা.)-এর মধ্যে বড়দের মত দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতাগুণ সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যারফে বাহিনী থামিয়ে নিজে রাসূল (সা.)-এর সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে মদীনায় আসেন। এক পত্রে হযরত উসামা (রা.)-এর সে অবস্থার বিবরণ নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

সংবাদ আসে, রাসূল (সা.)-এর অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও সংকটাপন্ন। খবর পেয়েই আমি কয়েকজন সাথী নিয়ে মদীনায় আসি। আমরা সোজা রাসূল (সা.)-এর বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হই। রাসূল (সা.) অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মুখ ফুটে কথাও বলতে পারছিলেন না। তিনি এ অবস্থার মাঝেও হাত দু'তিন বার আকাশ পানে উঁচিয়ে আমার দিকে তাক করেন। বুঝতে পারি তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।"

পরের দিন হযরত উসামা (রা.) আবার রাসূল (সা.)-এর বাসভবনে যান এবং তাঁকে বলেন—"হে আল্লাহ্র রাসূল! সৈন্য যারফে আমার অপেক্ষার্থী। যাবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।"

রাসূল (সা.) হাত উপরে উঠান। কিন্তু বেশী উঠাতে পারেন না। দুর্বলতা সীমাহীন বৃদ্ধি পায়। হযরত উসামা (রা.) ভারাক্রান্ত হৃদয় আর অশ্রুসজল চোখে রওয়ানা হয়ে যান। এর একটু পরেই রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। হযরত উসামার উদ্দেশ্যে দূত ছুটে যায়। যারফে পৌঁছানোর পূর্বেই দূত হযরত উসামাকে পেয়ে যায়। তিনি রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর শুনেই দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং সৈন্যদের কাছে গিয়ে পৌঁছান। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর শুনে সৈন্যদের মাঝে বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। সবার চোখে-মুখে বেদনার কালো পর্দা পড়ে। চোখ ছাপিয়ে যায় অশ্রুর বন্যায়। বেদনার ছুড়ি গিয়ে বিঁধে হৃদপিণ্ডে। স্বজনের বিয়োগে মুখ হয়ে যায় মূক।

স্বাভাবিক অনুভূতি লোপ পায়। নিস্তেজ-নিঃসাড় হয়ে যায় হস্তপদ। ধমনীতে রক্তের প্রবাহ থমকে দাঁড়ায়। সহসা নীরব হয়ে যায় সরব মুখগুলো। বুকফাটা আর্তনাদ সংযত করে ঠোঁট কামড়ে বজ্রাঘাত সহ্য করতে পারে না অনেকে। ভূতলে লুটিয়ে পড়ে মূর্ছা খেয়ে। কিছুক্ষণের জন্য পিনপতন নীরবতা বিরাজ করে যারফে। সবাই শোকাহত। সান্ত্বনার ভাষা কেউ খুঁজে পায় না। সেনাপতি নিজেও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মাটির দিকে তাকিয়ে তিনি শোক লাঘব ও অশ্রু লুকাবার বৃথা চেষ্টা করেন। শোক সাগরে ভাসমান থাকে সৈন্যরা কিছুক্ষণ। সেনাপতি আস্তে আস্তে পরিস্থিতি সামলে নেন। শোক সন্তপ্ত সৈন্যদের সান্ত্বনা দেন। সৈন্যদের হতাশা কিছুটা লাঘব হলে তিনি সেনাবাহিনী মদীনায় ফিরিয়ে আনেন। যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়ে যায়।

বাইয়াত পর্ব শেষ। প্রথম খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অভিষেক হলো কিছুক্ষণ মাত্র আগে। অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতেই হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসামা (রা.)-কে ডেকে জানতে চান যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে কি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

"নির্দেশ সম্বন্ধে আপনিও সম্যক অবহিত"—হযরত উসামা (রা.) বিনয়ের সাথে জবাব দেন—"তারপরেও আমার মুখ থেকে শুনতে চাইলে আমি বলছি শুনুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফিলিস্তিনে বালকা এবং দাওয়াম সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে রোমীয়দের উপর আক্রমণ করতে। আর এ স্থান পর্যন্ত সৈন্য এমনভাবে নিয়ে যেতে হবে যেন আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত শত্রুপক্ষ টের না পায়।"

"রওয়ানা কর উসামা!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন—"তোমার বাহিনী নিয়ে এখনি যাত্রা কর এবং রাসূল (সা.)-এর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ কর।"

নাজুক মুহূর্তে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দিলে হযরত আবু বকর (রা.) ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন। প্রায় সকলেই বলতে থাকে, যখন চতুর্দিক হতে বিপদের ঘনঘটা ও পদধ্বনি উঠছে ঠিক সেই মুহূর্তে এত বিরাট যুদ্ধের উদ্যোগ নেয়া তাও আবার মদীনা হতে শত-সহস্র ক্রোশ দূরে—মোটেও সমীচীন নয়। মদীনা অভিমুখে যে সমস্ত ফেৎনা ধেয়ে আসছে তা মোকাবিলার জন্য এ বাহিনীর এখানেই থাকা জরুরী।

"ঐ সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার জীবন!"—হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "বনের হিংস্র জন্তুরাও যদি আমাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেতে আসে তবুও আমি উসামার বাহিনীকে যাত্রা বন্ধের নির্দেশ দিব না। রাসূল (সা.) অন্তিম মুহূর্তে যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তার বিরুদ্ধাচরণ আমি কিছুতেই করতে পারি না। এ

বাহিনী পাঠাতে যদি মদীনায় আমাকে একাও থাকতে হয় তবুও আমি তাতে পিছপা হব না।"

"আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।" হযরত উমর (রা.) বলেন—"অভিযোগকারীরা এ কথাও বলছে যে, সৈন্য যদি একান্তই পাঠাতে হয় তবে হযরত উসামা (রা.)-এর পরিবর্তে অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক।"

"শোন ইবনে খাত্তাব!" হযরত আবু বকর (রা.) জবাবে বলেন—"তোমার কি মনে নেই স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (সা.) উসামাকে সেনানায়ক বানিয়েছেন? আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ উপেক্ষা করার দুঃসাহস তোমার হবে কি?"

"এমন দুঃসাহস আমি কস্মিনকালেও করব না।"—হযরত উমর (রা.) বলেন—"আমার বুকের পাঠায় এত সাহস নেই।"

"আমার কথা শোন ইবনে খাত্তাব!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন—"জাতির অবস্থার দিকে তাকাও। সমগ্র জাতি শোকাহত, বেদনাবিধূর। শোকের সাথে সাথে একটি ভীতি সকলের অন্তরে আচ্ছন্ন হতে চলেছে। এটা বিদ্রোহভীতি, যা চতুর্দিক হতে উত্থিত হচ্ছে। প্রতিদিনের শিরোনাম, অমুক গোত্র বিদ্রোহী হয়ে গেছে। অমুক গোত্র ইসলাম থেকে সরে এসেছে। ইসলাম সংকট ও ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। মদীনাও অরক্ষিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ। ইহুদি-খ্রিস্টানরা বিপদজনক গুজব ছড়াতে শুরু করেছে। এতে ভীতি উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ মুহূর্তে রোমীয়দের উপর আক্রমণ স্থগিত করলে দ্বিবিধ ক্ষতি রয়েছে। জনতার মাঝে এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, আমাদেরকে দুর্বল প্রতিপন্ন করে রোমী এবং অগ্নি উপাসকরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি জনতাকে দেখাতে চাই যে, আমরা দুর্বল হয়ে যাইনি। রাসূল (সা.)-এর পুণ্যাত্মা এবং দু'আ আমাদের সাথে আছে। আল্লাহ্ আমাদের সর্বাত্মক সাহায্যকারী। আমি জাতির উদ্দীপনা ও প্রেরণা পূর্বের মত দৃঢ় রাখতে চাই। আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করে চলা আমার জন্য ফরয।"

সৈন্য প্রেরণের সপক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুক্তিশীল ও নীতিপূর্ণ বক্তব্য হযরত উমর (রা.)-কে শান্ত, নিশ্চিত ও আস্থাশীল করে। হযরত আবু বকর (রা.) কালক্ষেপণ না করে সৈন্যদের মার্চ করে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

হযরত উসামা (রা.)-এর বাহিনী রওয়ানা হলে হযরত আবু বকর (রা.) কিছু দূর পর্যন্ত তাদের সাথে সাথে যান। সেন্যাধ্যক্ষ হওয়ায় হযরত উসামা (রা.) সৈন্যদের সাথে ঘোড়ায় সমাসীন ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা, এক তরুণ সিপাহসালার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন আর ইসলামের খলীফা তার পাশে

পাশে পায়ে হেঁটে চলছিলেন। এভাবে খলীফা জনতাকে দেখাতে চান যে, হযরত উসামা (রা.) বয়সে তরুণ হলেও তিনি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য।

"সম্মানিত খলীফা!" হযরত উসামা (রা.) বিনীতকণ্ঠে বলেন—"আপনিও ঘোড়ায় আরোহণ করুন নতুবা আমাকে নেমে এসে আপনার সাথে পায়ে হেঁটে চলার অনুমতি দিন।"

"আমি সওয়ার হব না এবং তুমি পায়ে হেঁটেও চলবে না"—হযরত আবু বকর (রা.) বলেন—"আমি এ আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করছি যে, আল্লাহ্‌র রাস্তার ধুলা আমার পায়ে লাগছে।"

হযরত উমর (রা.)ও সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ পর্যায়ে এসে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর মদীনায় উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

"উসামা!" খলীফা সেনাপতিকে বলেন—"তোমার সম্মতি থাকলে আমি উমরকে মদীনায় রেখে দিতে চাই। রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তার সাহায্য আমার লাগতে পারে।"

হযরত উসামা (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে সৈন্যদের থেকে পৃথক করে তাকে মদীনায় ফিরে যাবার অনুমতি দেন। হযরত আবু বকর (রা.) বার্ধক্যের বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি এক স্থানে দাঁড়িয়ে যান। হযরত উসামা (রা.) সৈন্যদের থামার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) অপেক্ষাকৃত এক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেন :

"ইসলামের হে বীর সেনানীগণ! বিদায় মুহূর্তে দশটি নসীহত করতে চাই। এগুলো মনে রেখ, সুফল পাবে। আর তা হলো—

১. খেয়ানত করবে না অর্থাৎ রক্ষক হয়ে ভক্ষক হবে না।

২. চুক্তি লঙ্ঘন করবে না। এটা জঘন্য অপরাধ।

৩. চুরি করবে না। যে কোন মূল্যে ওয়াদা ঠিক রাখবে।

৪. শত্রুর লাশের বিকৃতিসাধন কিংবা অঙ্গহানী করবে না।

৫. নাবালেগ সন্তান এবং মহিলাদের হত্যা করবে না।

৬. খেজুর ও অন্যান্য ফল-মূলের বৃক্ষ কেটে নষ্ট করবে না।

৭. আহারের প্রয়োজন ছাড়া কোন পশু জবেহ করবে না।

৮. বিভিন্ন ধর্মের উপাসনালয় তোমাদের সামনে পড়বে। সেখানে অনেক বৈরাগীদের দেখা পাবে। তাদের উত্যক্ত করবে না।

৯. চলতি পথে স্থানীয় বাসিন্দারা তোমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনবে। আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এ খাদ্য খেয়ে নিবে। এমনও লোকের সাক্ষাৎ তোমরা পাবে যাদের

মাথায় শয়তানের বাসা থাকবে। তাদের মাথার তালু টাক এবং আশে-পাশের চুল অনেক লম্বা হবে। দেখা মাত্রই তাদের হত্যা করে ফেলবে।

১০..আল্লাহ্র উপর আস্থা রেখে নিজেদের হেফাজত করবে। রওয়ানা কর, প্রিয় মুজাহিদ বাহিনী! পরাজয় এবং বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্ তোমাদের হেফাজত করুন।"

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন মোতাবেক ১১ হিজরীর ১লা রবিউল আওয়াল এ বাহিনী মদীনা ছেড়ে যায়।

॥ দশ ॥

উপন্যাসটি যেহেতু হযরত খালিদ (রা.)-এর বর্ণাঢ্য জীবনভিত্তিক তাই সমগ্র ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখানে সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। উসামা বাহিনীর পরবর্তী বিবরণ একটু বলেই ক্ষান্ত করব যে, এ বাহিনী রোমীয়দের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৩ দিনে ঐ সফলতা অর্জন করে যা রাসূল (সা.) একান্তভাবে চেয়েছিলেন। হযরত উসামা (রা.) এ যুদ্ধে পূর্ণ দক্ষতা ও সফল নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি বিজয়ী বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যারা তার সেনাপতিত্বে বেজার ছিল তারাও এসে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানান।

ধর্মান্তরের ফেৎনা ছিল আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমরায়োজনের ব্যবস্থা করতে হয়। সমর শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে হয়। হযরত আবু বকর (রা.) পুরো সেনাবাহিনী কয়েক অংশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অংশের পৃথক কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তাদের জন্য আলাদা রণক্ষেত্রও নির্দ্ধারণ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ একেক কমান্ডারকে একেক এলাকা দেয়া হয়, হামলা করার জন্য। এ সেনা বিভক্তির ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিপক্ষের শক্তি ও সৈন্য বিবেচনায় রেখে মুসলিম কমান্ডার ও সৈন্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেন।

সবচেয়ে শক্তিশালী ও দাগাবাজ ছিল দু'মুরতাদ। তুলাইহা এবং মুসাইলামা। তারা উভয়ে নবুওয়াত দাবী করে নিজেদের সপক্ষে হাজার হাজার ভক্ত যোগাড় করতে সমর্থ হয়। হযরত খালিদ (রা.) এদের একজনের বিরুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত হন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তুলাইহা এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তুলাইহাকে শায়েস্তা করার পর তাকে বাতাহ নামক স্থানে যেতে বলেন। এখানে বনূ তামীমের সর্দার মালেক বিন নাবীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

সকল কমান্ডার নিজ নিজ রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) তার বাহিনী নিয়ে উদ্দীষ্ট রণক্ষেত্রে যথারীতি এত দ্রুত গিয়ে পৌছান যে, দুশমনরা মোটেও টের পায় না। তিনি পৌছেই কালক্ষেপণ না করে কয়েকটি বসতি ঘেরাও করে ফেলেন। স্থানীয় লোকজন আতংকিত হয়ে পড়ে। নেতৃস্থানীয়

কিছু লোক হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে এসে জানায় যে, অনেক গোত্র তুলাইহার প্রতারণার শিকার। তাদের রক্ত ঝরানো ঠিক হবে না। তিনি একটু সময় দিলে তাঈ গোত্র হতে কম-বেশী ৫০০ যোদ্ধা হযরত খালিদের বাহিনীতে যোগ দিবে।

হযরত খালিদ (রা.) তাদের সুযোগ দেন। অল্প সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঈ গোত্র হতে ৫০০ যোদ্ধা নিয়ে আসে। তারা তুলাইহার গোত্র এবং তাদের অধীনস্থ গোত্রের বিরুদ্ধে লড়তে অনুপ্রাণিত ছিল। তারা সশস্ত্র হয়েই আসে। যাদিলা গোত্রও হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে এসে যোগ দেয়। তুলাইহা হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী আসছে শুনে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। কিন্তু তৎপর হয়ে ওঠে উয়াইনা নামক এক ব্যক্তি। লোকটি ফারানা গোত্রের নেতা ছিল। তার অন্তরে এত মদীনা-বিদ্বেষ ছিল যে, সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, সে কিছুতেই মদীনা কেন্দ্রিক শাসন মানতে রাজি নয়। খন্দক যুদ্ধে যে তিন বাহিনী মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে তার এক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল এই উয়াইনা বিন হাসান। 'শত্রুদের উপরে আগে ঝাপিয়ে পড়'—এই নীতি অনুযায়ী রাসূল (সা.) মদীনা থেকে এগিয়ে এসে ঐ তিন বাহিনীর উপর আক্রমণ করেছিলেন। বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় উয়াইনার নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা। সে পরিস্থিতির চাপে পড়ে ইসলাম কবুল করেছিল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে তার অপতৎপরতা যথারীতি অব্যাহত থাকে।

হযরত খালিদ (রা.)ও যথাসময়ে জানতে পারেন যে, তুলাইহার সাথে উয়াইনাও আছে। ফলে তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। শায়েস্তা করে ছাড়বেন।

হযরত খালিদ (রা.) রওনা হওয়ার পূর্বে হযরত উক্কাশা বিন মুহসিন (রা.) এবং হযরত সাবেত বিন আকরাম আনসারী (রা.)-কে গোয়েন্দাবৃত্তির উদ্দেশ্যে অগ্রে পাঠিয়ে দেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবে এবং তাদের থেকে যদি কোন অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পায় এবং তা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের কাজে আসে তাহলে দ্রুত যেন তা সেনাপতিকে অবহিত করে। গোয়েন্দা সাহাবাদ্বয় রওনা হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.)ও সৈন্য নিয়ে এগুতে থাকেন। বহুদূর গেলেও গোয়েন্দা দু'জনের একজনকেও ফিরে আসতে দেখা যায় না।

আরো এগিয়ে গেলে রক্তরঞ্জিত তিনটি লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। দু'টি লাশ হযরত উক্কাশা (রা.) ও হযরত সাবেত (রা.) এর। হযরত খালিদ (রা.)

যাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আগে পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয় লাশটি ছিল এক অজ্ঞাত ব্যক্তির। পরে এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের পটভূমি এই জানা যায় যে, গোয়েন্দাদ্বয় সামনে এগিয়ে চলে। পথিমধ্যে হাবাল নামক এক ব্যক্তি তাদের সামনে পড়ে। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের বর্ণনামতে হাবাল তুলাইহার ভাই ছিল। কিন্তু তাবারী এবং কামুসের মতে হাবাল ভাই ছিল না, বরং ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। হযরত উক্কাশা এবং হযরত সাবেত (রা.) হুঙ্কার দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

তুলাইহার কাছে খবর পৌঁছে যায়। সে অপর ভাই সালামাকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। ইতোমধ্যে হযরত উক্কাশা (রা.) এবং হযরত সাবেত (রা.) আরো এগিয়ে যান। তাদের আসতে দেখে তুলাইহা ও তার ভাই ঘাপটি মেরে থাকে। সাহাবাদ্বয় কাছে আসতেই তারা কোনরূপ আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলে।

হযরত খালিদ (রা.) ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। তার রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। তিনি দ্রুত মার্চ করে তুলাইহার বসতিতে গিয়ে পৌছান। সংঘাত নিশ্চিত জেনে তুলাইহাও রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। দু'বাহিনী ময়দানে নেমে আসে। উয়াইনার হাতে থাকে তুলাইহা বাহিনীর সেনা কমান্ড। তুলাইহা এক নিরাপদ তাঁবুতে নবীর গাম্ভীর্য নিয়ে বসা ছিল। উয়াইনা ছিল রণাঙ্গনে। মুসলমানদের ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ চেহারা দেখে উয়াইনার পিলে চমকে যায়। তার বাহিনী ক্রমেই যে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছে তাও উয়াইনার নজর এড়ায় না। সে সেনা কমান্ড মাঠে ফেলে তুলাইহার কাছে ছুটে যায়। তুলাইহাকে সত্য নবী বলে সে বিশ্বাস করত।

"সম্মানিত নবী!" উয়াইনা তুলাইহাকে জিজ্ঞাসা করে—"আমরা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন। জিব্রাইল কোন ওহী নিয়ে এসেছে?"

"এখনও আসেনি"—তুলাইহা জবাবে বলে—"তুমি লড়াই অব্যাহত রাখ।"

উয়াইনা দৌড়ে ময়দানে আসে এবং কমান্ড করতে থাকে। মুসলমানদের বজ্র নিনাদ আর আক্রমণ আরো তীব্র হয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর রণকৌশলে ভণ্ড নবীর বাহিনীর শক্তি নিস্তেজ হয়ে আসছিল। উয়াইনা আরেকবার তুলাইহার কাছে ছুটে যায়।

"নবী!" উয়াইনা তুলাইহাকে জিজ্ঞাসা করে—"কোন ওহী এল কি?"

"এখনও নয়"—তুলাইহা বলে—"যাও, লড়াই চালিয়ে যেতে থাক।"

"ওহী আর কখন আসবে?"—উয়াইনা উদ্বেগজনক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—"আপনি বলেছিলেন, কঠিন সময়ে ওহী নাযিল হয়।"

"আমার দোয়া আল্লাহ্র দরবারে পৌছে গেছে"—তুলাইহা বলে—"এখন শুধু ওহীর অপেক্ষা মাত্র।"

উয়াইনা ভগ্নহৃদয়ে আবার সৈন্যের কাছে ফিরে যায়। ততক্ষণ তার বাহিনী হযরত খালিদের ঘেরাওয়ের মধ্যে এসে যায়। উয়াইনা আতংকিত অবস্থায় পুনরায় তুলাইহার কাছে যায় এবং তাকে সৈন্যদের দুরবস্থার কথা বলে জিজ্ঞাসা করে যে, ওহী নাযিল হয়েছে কি না?

"হ্যাঁ"—তুলাইহা জবাবে বলে—"ওহী নাযিল হয়ে গেছে।"

"কি নাযিল হল?" উয়াইনা আশান্বিত কণ্ঠে জানতে চায়।

"তা এই যে"-তুলাইহা জবাবে বলে—"মুসলমানরাও যুদ্ধ করছে এবং তোমরাও যুদ্ধ করছ। এমন একটি সময় আসছে, যার কথা কোনদিন তোমরা ভুলবে না।"

উয়াইনার আশা ছিল ভিন্ন কিছুর। তুলাইহা তাকে নিরাশ করে। সে বুঝে ফেলে তুলাইহা মিথ্যা বলছে।

"এমনটিই হবে"—উয়াইনা রাগতস্বরে বলে—"সে ক্ষণ অতি নিকটবর্তী যার কথা সারা জীবন আপনি ভুলবেন না।"

উয়াইনা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসে এবং চিৎকার করে করে তার গোত্রের উদ্দেশে বলে—"হে বনূ ফারাযা! তুলাইহা মিথ্যাবাদী। ভণ্ড নবীর জন্য নিজ প্রাণ খুইয়াও না। পালাও! নিজ প্রাণ বাঁচাও।"

বনূ ফারাযা মুহূর্তে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তুলাইহার গোত্রের যোদ্ধারা তুলাইহার তাঁবুর চতুর্দিকে জমা হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) তাদের কাণ্ড দেখছিলেন। তুলাইহার তাঁবুর সাথে একটি ঘোড়া এবং একটি উট প্রস্তুত ছিল। গোত্রের লোকেরা এ মুহূর্তে করণীয় কি জানতে চায়। তাদের প্রশ্নের কোন সদুত্তর না দিয়ে তুলাইহা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে। তাঁবুতে তার স্ত্রীও ছিল। সে উটের পিঠে আরোহণ করে।

"ভাইসব!" তুলাইহা তার গোত্রের সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলে—"যাদের পলায়নের ব্যবস্থা আছে তারা এখনই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমার মত পালিয়ে আত্মরক্ষা কর।"

এরপর সে আর দেরী করে না। জলদি ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। এভাবে এক মিথ্যুক ও ভণ্ড নবীর ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে তুলাইহা তাঁর বাইয়াত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) সফল অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি গোত্রকে অনুগত করেন এবং ধর্মান্তরের অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তি দেন। তাদের উপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ইসলাম থেকে

যারা দূরে সরে গিয়েছিল তাদের পুনর্বার ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি তুলাইহার নবুওয়াতকে চিরতরে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন এবং চরম মুসলিম বিদ্বেষী উয়াইনা পালিয়ে সুদূর ইরাকে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু তার প্রেতাত্মা ঠিকই রয়ে যায়। সালমা নামে এক নারীর রূপে এ প্রেতাত্মা সামনে আসে। তার পূর্ণ নাম উম্মে জামাল সালমা বিনতে মালিক।

বনূ ফারাযার খান্দানী বংশের প্রখ্যাত মহিলা উম্মে করফার মেয়ে ছিল এই সালমা। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশার একটি ঘটনা। হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) বনূ ফারাযার এলাকায় একবার গিয়ে হাজির হন। গোত্রটি চরম মুসলিম বিদ্বেষী এবং তাদের ঘোরতর শত্রু ছিল। ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে হযরত যায়েদ (রা.) বনূ ফারাযার কিছু লোকের সামনে পড়েন। হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে কয়েকজন মাত্র ছিল। বনূ ফারাযার লোকেরা তাদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হযরত যায়েদ (রা.) গুরুতর আহত হয়ে কোন রকমে মদীনায় আসতে সক্ষম হন। তিনি সুস্থ হলে রাসূল (সা.) তাঁর নেতৃত্বে একটি নিয়মতান্ত্রিক সেনাবহর বনূ ফারাযাকে শিক্ষা দিতে প্রেরণ করেছিলেন।

মুসলিম কনভয় বনূ ফারাযার প্রতিরোধ শক্তি গুড়িয়ে দেয়। শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের অনেককে খতম এবং কতককে যুদ্ধবন্দী করে। বড় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উম্মে করফা ফাতেমা বিনতে বদরও ছিল। তার এ বিষয়ে বড় খ্যাতি ছিল যে, সে নিজ গোত্র ছাড়াও অন্যান্য গোত্রদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। তাকে মদীনায় এনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সাথে তার নাবালেগা কন্যা উম্মে জামালও ছিল। কন্যাটিকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করা হয়। তাকে তিনি আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। কিন্তু সে সর্বক্ষণ উদাস ও ভারাক্রান্ত থাকত। হযরত আয়েশা (রা.) তার প্রতি দয়াদ্র হয়ে তাকে আযাদ করে দেন।

বাঁদী হিসেবে না রেখে বরং আযাদ করে দেয়ার কারণে সালমা মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে সে মাতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা মনের গহীনে লালন করতে থাকে এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করতে মনোনিবেশ করে। সর্দার গোত্রের হওয়ায় অতি অল্প সময়ে সে সমর জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাও সে লাভ করে। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী তৈরী করে মদীনা আক্রমণের জন্য ফুঁসতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে মুসলিম বাহিনী এক বিরাট সমরশক্তিতে পরিণত হওয়ায় সালমা মদীনার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। দূর থেকে লম্ফ-ঝম্ফ দিতে থাকে মাত্র।

তুলাইহা আর উয়াইনা পরাজিত হলে সালমা দৃশ্যপটে হাজির হয়। তার মাতা উয়াইনার চাচাত বোন ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে যে সকল গোত্রের সংঘর্ষ হয় তাদের চড়া মূল্য দিতে হয়। হতাহত হয় প্রচুর। যারা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে যায় তারা বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। গাতফান, তাঈ, বনূ সালীম এবং হাওয়াযিন গোত্রের অনেকে সালমার কাছে সমবেত হয়। তারা প্রস্তাব করে, সালমা তাদের সঙ্গ দিলে তার মুসলমানদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে জীবন বাজি রাখবে। সালমা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে রাজি হয়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যে নিজের বাহিনী প্রস্তুত করে সালমা মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

হযরত খালিদ (রা.) এ সময় বাযাখায় ছিলেন। এখানের মাটিতেই তিনি তুলাইহার ভণ্ডামির যবনিকাপাত ঘটান। তিনি গোয়েন্দা মারফৎ জানতে পারেন যে, বনূ ফারাযার সৈন্যরা আবার সংঘটিত হয়ে আসছে। হযরত খালিদ (রা.) পুনরায় বাহিনীকে রণসাজে সজ্জিত করে বিন্যস্ত করেন।

মা উটে চড়ে অগ্রভাগে থেকে চিৎকার করে করে যেরূপভাবে সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করত ঠিক তেমনি সালমাও সৈন্যদের আগে আগে ছিল। তার আশে-পাশে তলোয়ার এবং বর্শা সজ্জিত একশ উষ্ট্রারোহী ছিল। সালমার নিরাপত্তায় এরা ছিল জীবন্ত মানব ঢাল। সালমার নেতৃত্বাধীন বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল এবং রণাঙ্গন কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের আরো নিকটে আসার অপেক্ষা করেন না। তাঁর বাহিনীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। তিনি শত্রু বাহিনীকে বিন্যস্ত হওয়া কিংবা স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করার পজিশন নিতে সুযোগ দেয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। হযরত খালিদ (রা.) হুঙ্কার দিতে দিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি জানতেন, শত্রুসৈন্য সফরের ক্লান্তিতে অবসন্ন। তিনি শত্রুর শারীরিক দৈন্যতার এ দুর্বল পয়েন্ট থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসেল করতে চান।

একশ দুর্ধর্ষ উষ্ট্রবাহিনীর নিপুণ প্রহরায় থেকে সালমা উত্তেজনাকর বাক্যের মাধ্যমে সৈন্যদের প্রেরণা চাঙ্গা ও উজ্জীবিত করছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, বনূ ফারাযা হযরত খালিদ (রা.)-এর আক্রমণ বীর বিক্রমে প্রতিহত করে। সৈন্য কম হওয়ার কারণে হযরত খালিদ (রা.)-এর অবস্থা ক্রমেই নাজুক হতে থাকে। অপরদিকে দুশমনের উদ্দীপনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। সালমার হুঙ্কার আর উত্তেজনাকর শব্দ জ্বলন্ত হাড়িতে তৈল সরবরাহের কাজ করছিল।

হযরত খালিদ (রা.) পরিস্থিতি অনুকূলে আনতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সালমার নেতৃত্বই যেহেতু বনূ ফারাযাকে এভাবে বীরত্বের অগ্নি ঝরাতে অনুপ্রাণিত করছিল, তাই তিনি সালমার হত্যার মাধ্যমে বনূ ফারাযার প্রেরণার মূলে কুঠারাঘাত হানতে চান। তিনি বাছাইকৃত কয়েকজন যোদ্ধাকে সালমার নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে তাকে উট থেকে ফেলে দিতে নির্দেশ দেন।

সালমার নিরাপত্তা বাহিনীও ছিল দুর্ধর্ষ। তারা খালিদ বাহিনীকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। মুসলিম জানবাজরা এ কৌশল অবলম্বন করে যে, তারা নিরাপত্তা বাহিনীর একেকজনকে পৃথক করে হত্যা করতে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় তারা নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙ্গতে সক্ষম হয়। তারপরেও কারো পক্ষে সালমা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আহত হয়ে সবাই পিছনে ফিরে আসে।

এক সময় একশ নিরাপত্তা কর্মীর সকলেই নিহত হয়। অবশ্য এর জন্য হযরত খালিদ (রা.)ও বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হন। পথ নির্বিঘ্ন হয়ে গেলে মুসলিম মুজাহিদরা তরবারী দিয়ে সালমার হাওদার রশি কেটে দেয়। হাওদা (উষ্ট্রাসন) সালমাকে নিয়ে নিচে পড়ে যায়। মুজাহিদরা হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাকায়। সালমাকে বন্দী না হত্যা করবে তা জানতে চায়। হযরত খালিদ (রা.) হাত দ্বারা হত্যার ইশারা করেন। এক মুজাহিদ এক কোপে সালমার মস্তক ধড় থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেন।

নেত্রীর এহেন মর্মান্তিক মৃত্যুতে বনূ ফারাযার মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লাফ দিয়ে তাদের বীরত্বের মিটার কাপুরুষতার গ্রেডে চলে আসে। প্রতিরোধের পথ ছেড়ে পলায়নের পথ ধরে। অগণিত লাশ আর অসংখ্য আহত রেখে তারা পালিয়ে যায়।

॥ এগার ॥

মদীনা হতে প্রায় ২৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম বাতাহ। এখানে কয়েকটি বেদুঈন পরিবার বসবাস করত। এটা উল্লেখযোগ্য কোন গ্রাম ছিল না। সন্ধানী দৃষ্টিতে নজর বুলালে কতিপয় এমন আলামত পাওয়া গেল—যা প্রমাণ করে যে, এখানে কোন এক নগরী গড়ে উঠেছিল।

১৪ শতাব্দী পূর্বে বাস্তবেই এ গ্রামে একটি শহর ছিল। শহরের নাম ছিল বাতাহ। নামসহ শহরটি আজও আছে। তবে শহরের সীমানা ছোট এবং সংকীর্ণ হতে হতে তা এক সময় গ্রামে পরিণত হয়। শহরের বাসিন্দারা সুদর্শন, বীর এবং নির্ভীক ছিল। কথা বলত কবিতার ছন্দে। মহিলারা অত্যন্ত রূপবতী এবং পুরুষেরা কমনীয় ছিল। এটি ছিল একটি শক্তিশালী গোত্র। বনূ তামীম নামে তারা পরিচিত ছিল।

বনূ ইয়ারবূও একটি গোত্র ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্র কোন গোত্র না বরং বনূ তামীমেরই এক বৃহদাংশ। এ গোত্রের সর্দার মালিক বিন নাবীরা। বনূ তামীমের সকলের মাজহাব এক ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তারা। কতক আগুন পূজা আর কতক কবর পূজারী ছিল। তবে অধিকাংশই ছিল মূর্তিপূজক। অনেকে আবার খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেছিল। দানশীল, অতিথিপরায়ণ এবং বীর হিসেবে এ গোত্রের প্রচুর সুনাম ছিল। যে সমস্ত গোত্রে রাসূল (সা.) ইসলামের পয়গাম পাঠান তাদের মধ্যে বনূ তামীম ছিল উল্লেখযোগ্য। ইসলামের সুসংগঠিত ও তার বহুল প্রচার-প্রসারের স্বার্থে বনূ তামীমের মত শক্তিধর ও প্রভাবশালী গোত্রকে ইসলামের আওতাধীন করা অতীব জরুরী ছিল।

বনূ তামীমের ইসলাম গ্রহণের পটভূমি যেমনি ঘটনানির্ভর তেমনি চমকপ্রদ। এখানে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, দীর্ঘ মেহনতের পর বনূ তামীমের অধিকাংশই ইসলামের ছায়ায় চলে আসে। মালিক বিন নাবীরা ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। এত সহজে নিজের ধর্মমত পরিহারের পাত্র সে ছিল না। কিন্তু বনূ তামীমের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যাওয়ায় সে নিজের গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্ব ধরে রাখতে ইসলাম গ্রহণ করে। বড় প্রভাবশালী ও বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় রাসূল (সা.) তাকে বাতাহের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এলাকার যাকাত, উশরসহ অন্যান্য কর, ভ্যাট ইত্যাদি আদায় করে মদীনায় প্রেরণ করা ছিল তার অন্যতম দায়িত্ব।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরি এবং মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল লেখেন, মালিক বিন নাবীরা বড়ই সুদর্শন ও ঈর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিল। গঠনশৈলী অপূর্ব আকর্ষণীয়। মাথার চুল লম্বা, নয়নাভিরাম। দুর্ধর্ষ যোদ্ধারাও তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হত। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য কবি, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও হৃদয়স্পর্শী সুরের অধিকারী। তার সবচেয়ে বড় গুণ এই ছিল যে, সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সপ্রতিভ থাকত। হৃদয়কাড়া স্মিত হাসি ছিল তার অপূর্ব। চরম শোকাহতকেও সে মুহূর্তে হাসাতে পারত। দোষ বলতে যা তার মধ্যে ছিল তা হলো, চরম আত্মগৌরব ও অহংকার বোধ। নিজ গোত্রসহ পুরো বনূ তামীমে তার বিরাট মর্যাদা আর ব্যক্তিত্বই ছিল এর একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে ছিল, ব্যতিক্রমধর্মী পুরুষসুলভ সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণাবলী। এ গুলোর যাদুই অন্যদের গভীর প্রভাবিত ও মোহিত করত।

অসংখ্য নারীর সাথে ছিল তার প্রগাঢ় সম্পর্ক। যুবতী নারীরা তার সান্নিধ্য ও একটু ছোঁয়া পেতে ব্যাকুল ও আকুলি-বিকুলি করত। বড়ই ধূর্ত ছিল সে। নারীদের কাছে টানত কিন্তু বিবাহের বন্ধনে কাউকে জড়াত না। সাময়িক সম্পর্কে

তাদের মন ভরাত। সে তাদের এই বলে আশ্বস্ত করত যে, সাময়িক সম্পর্কতেই তারা বিরাট মর্যাদার অধিকারিণী হয়ে যাবে। গোত্রের এমন কোন নারী ছিল না, যার অন্তরে তার ভালবাসা ও কামনা ছিল না। যে কোন নারী-হৃদয় সে অনায়াসে জয় করে নিতে পারত। আধা পলক চাহনী আর এক ফালি হাসিই ছিল এর জন্য যথেষ্ট।

বনূ তামীমের জনৈক ব্যক্তির নাম আল-মিনহাল। মানুষের কাছে সে নামেমাত্র পরিচিত ছিল। সামাজিক মর্যাদা বা প্রতিপত্তি বলতে তার কিছুই ছিল না। তার এক কন্যা ষোল বছরে পদার্পণ করে। স্বাস্থ্য নিটোল ও ভরাট। সারা অঙ্গে সৌন্দর্যের বাহার। পরিপূর্ণ তরুণী। নাম লায়লা। যুবতী এ কন্যার বদৌলতে আল-মিনহাল জিরো থেকে হিরো বনে যায়। সমাজে আল-মিনহালের কদর ও মর্যাদা বেড়ে যায়। মানুষ শ্রদ্ধার সাথে তার কথা স্মরণ করতে থাকে। যৌবনের চৌহদ্দী না পেরোতেই লায়লার সৌন্দর্য অঙ্গ থেকে ঝরে পড়তে থাকে। মানুষ চলা থামিয়ে চোখ কপালে তুলে অবাক বিস্ময়ে তার রূপের ঝলক দেখতে থাকে। নিকট থেকে এক পলক দেখার জন্য উৎসুক জনতা অধীর হয়ে রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। সৃষ্টি হয় যানজট। সেই সাথে জনজট। দূর-দূরান্ত হতে লোক এসে সমবেত হয় লায়লার বাড়ির আঙ্গিনায় ও আশে পাশের রাস্তায়। উদ্দেশ্য, লায়লার উপচে পড়া সৌন্দর্য ও রূপ এক নজর দেখে চোখের তৃষ্ণা নিবারণ করা।

জনাব ইস্পাহানী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও তৎযুগের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির বরাত দিয়ে লেখেন, আল্লাহ্‌তা'আলা লায়লাকে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন। তার হরিণ-আঁখি এত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, কারো প্রতি চাইলেই সে বিমোহিত হয়ে যেত। হাঁটুর নিচের অংশ খোলা থাকত এমন পোশাক সে পরত। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তার পায়ের নলায় অস্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তার বাহুও ছিল চমৎকার। সুঢৌল গোল এবং দীর্ঘ লম্বা। কেশদান উড়িয়ে রাখত। স্বর্ণালী চুল এবং তার উজ্জ্বল চমকে যাদু জড়িয়ে ছিল।

চোখ তুলে কেউ একজন তাকে দেখে না, সে ছিল একমাত্র মালিক বিন নাবীরা। একবার এমন ঘটনা ঘটেছে যে, সে মালিকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু মালিক চোখ তুলে তাকে দেখেনি আর লায়লাও মালিকের দিকে তাকায়নি।

একদিনের ঘটনা। লায়লা তার উটনীকে পানি পান করিয়ে আনছিল পথিমধ্যে এক মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। মহিলাটি লায়লার পূর্ব পরিচিত মালিক বিন নাবীরার একান্ত পরিচারিকা। সে লায়লার গতিরোধ করে দাঁড়ায়।

"লায়লা!" পরিচারিকা তাকে বলে—"নিঃসন্দেহে তুমি আরো গর্ব করতে পার। এমন কোন লোক আছে যে তোমার পায়ের নখ পর্যন্ত চুমো দিতে প্রস্তুত নয়?"

"তোমার মনিব কি তোমাকে কোন কবিতা মুখস্থ করে প্রেরণ করেনি?" লায়লা মুচকি হেসে বলে—"মালিক বিন নাবীরা কবি না? আমার ধারণা সত্য নয় কি যে, তোমার মনিব তোমাকে আমার জন্য কোন পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি পুরুষের চোখের ভাষায় তার হৃদয়ের কথা পড়ে নিতে পারি।"

"খোদর কসম!" মধ্যবয়সী পরিচারিকা বিস্মিত হয়ে বলে—"তুমি অল্প বয়সেই বিচক্ষণ হয়ে গেছ। জ্ঞানীর মত কথা বলছ। যদি তুমি বাস্তবেই আমার চোখে আমার মনিবের পয়গাম দেখতে পেয়ে থাক, তবে বল তোমার জবাব কি? সে তোমার জন্য উন্মুখ ও পাগলপারা।"

"অত্র এলাকায় এমন কোন পুরুষের নাম বলতে পার, যে আমার জন্য ব্যাকুল নয়?" লায়লা গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

"কিন্তু আমার মনিবের ব্যাপারটি একটু ভিন্ন"—পরিচারিকা বলে।

"পার্থক্য বলতে যেটা আছে তা হলো সে অন্যদের মত আমার দিকে তাকায় না"—লায়লা বলে—"আর আমার জানা আছে, সে কেন তাকায় না। সে চায়, আমি তার দিকে তাকাই। সে নেতা বলে নিজেকে খুব সুদর্শন মনে করে। তাকে বলে দিও, আপনার আশা কোনদিন সফল হবে না। লায়লা আপনার দিকে কখনও তাকাবে না।"

"এমন জবাবে তিনি নিরাশ হবেন না।"—পরিচারিকা বলে—"এটা কি তোমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার নয় যে, মালিক বিন নাবীরার মত লোক তোমার পাণিপ্রার্থী? তিনি তোমার পদতলে স্বর্ণের স্তূপ জমা করে দিবেন?"

"তাকে বলো, স্বর্ণ নয়; আমার পায়ে এসে মাথা রাখতে"—লায়লা বলে—"কিসের বলে সে এভাবে পয়গাম পাঠাতে সাহস করল তুমি জান?...কারণ সে সর্দার। আমার পিতা তার মোকাবিলায় কিছুই নয়। সে এভাবে প্রস্তাব দিয়ে আমাকে অপমান করেছে।"

"তবে তুমি অন্য কাউকে ভালবাস?" পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করে।

লায়লা জোরে হেসে ওঠে। মুখে কিছু বলে না।

"তাহলে তাকে আমি কি জানাব?" পরিচারিকা নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"যা কিছু বলার তা আমি বলেছি"—লায়লা বলে—"সাথে এটুকুও তাকে বলবে যে, আমি এক রাতের জ্বলন্ত মশাল নই। আমি কেবল তার হব, যে

সারাজীবন আমাকে তার প্রদীপ হিসেবে রাখবে।"

মালিক বিন নাবীরার কানে লায়লার এহেন তীর্যক জবাব গেলে তার এতদিনের দম্ভ-অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

"মনিব!" পরিচারিকা তার অস্থিরতা দেখে সান্ত্বনার সুরে বলে—"লায়লা আর এত কি?...একটি সাধারণ মেয়ে মাত্র। শাহ্জাদী নয়। তার বিবাহের সিদ্ধান্ত তার পিতা নিবে। তার পিতাকে বলুন...।"

"আমি দেহ নয়, লায়লার মন চাই"—মালিক বিন নাবীরা বলে।

আরেক দিন মালিক নিজেই লায়লার কাছে গিয়ে তার প্রেম ভিক্ষা চায়।

"আমি আপনাকে হুমকি কিংবা অপমান করিনি"—লায়লা তাকে জানায়—"আমি শুধু একথা বলতে বা বুঝাতে চেয়েছি যে, আমি ঐ ফুল নই যা এক রাতের জন্য ফুটে পরের দিন ম্রিয়মাণ হয়ে ঝরে পড়ে।"

আগেই লায়লা মালিকের দম্ভ-চূঁড়ায় আঘাত হেনেছিল। এবার সে অহমিকার চূঁড়া লায়লার পদাঘাতে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। লায়লা তার আত্মগৌরব দু'পায়ে দলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর এক সময় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বনূ তামীম লায়লাকে 'উম্মে তামীম' উপাধিতে ভূষিত করে।

॥ বার ॥

রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের খবর পেয়েই মালিক বিন নাবীরা মদীনা হতে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, সে পরিস্থিতির চাপে ইসলামের স্বীকৃতি দিয়েছিল মাত্র; ঈমান আনয়ন করেনি। এলাকা হতে যাকাত, কর, ট্যাক্স, উশর ইত্যাদি আদায় করে সে নিজগৃহে জমা করে রেখেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তা কেন্দ্রীয় খাদ্যগুদামে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সে তা মদীনায় না পাঠিয়ে এলাকার লোকজন জমা করে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ নিজ নিজ মালিককে ফিরিয়ে দেয়। পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করারও স্পষ্ট ঘোষণা দেয়।

"এখন থেকে তোমরা স্বাধীন"—মালিক সমবেত জনতাকে বলে—"আমি মদীনার গোলামীর জিঞ্জির গলা থেকে নামিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলেছি। এখন যা কিছু উপার্জন করবে সব নিজেরাই ভোগ করবে। কোন কর দেয়া লাগবে না।"

সমবেত জনতা মাল-সম্পদ ফিরে পেয়ে এবং ভবিষ্যতে তাদের ট্যাক্স মওকুফের আনন্দে তারা গগনবিদারী শ্লোগান তোলে।

মদীনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনরায় গোত্রের স্বাধীন অধিপতি হওয়ায় মালিক বেজায় খুশী। কিন্তু এ খুশী বেশীদিন স্থায়ী হয় না। পার্শ্ববর্তী দু'তিন গোত্রের নেতারা মালিককে জানিয়ে দেয় যে, সে মদীনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কাজটি মোটেও ঠিক করেনি। মালিক তাদের কথায় কান না দিয়ে বরং উল্টো

তাদেরকে নিজের সমমনা ও মদীনা বিরোধী করতে জোর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তার ভাষার যাদু এখানে চরম মার খায়। তাদেরকে সে কিছুতেই নিজ দলে ভিড়াতে পারে না। তারা তাকে নৈতিক সমর্থন জানাতে মোটেও রাজি হয় না।

যাকাত ও অন্যান্য কর আদায়ের প্রশ্নে বনূ তামীম প্রকাশ্যভাবে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (১) যাকাতসহ অন্যান্য কর রীতিমত আদায়ে আগ্রহী। (২) মদীনার সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইচ্ছুক। (৩) কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও সিদ্ধান্তহীনতার শিকার।

তাদের পারস্পরিক মতভেদ ও ঘরোয়া বিবাদ ভীষণ গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে। এমনি এক টানটান উত্তেজনাকর মুহূর্তে সায্‌যাহ স্ব-সৈন্যে এসে উপস্থিত হয়। সায্‌যাহ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, সে নবুওয়াত দাবী করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। সায্‌যাহ মদীনার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় ও সৈন্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মালিক বিন নাবীরার গোত্র বনূ ইয়ারবু অধ্যুষিত এলাকায় স্ব-সৈন্যে এসে ছাউনি ফেলে। সায্‌যাহ গোত্র প্রধান মালিক বিন নাবীরাকে ডেকে তার আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয় যে, সে মদীনা আক্রমণ করতে ইচ্ছুক।

"আমার সৈন্যদের সাথে আপনার গোত্রের সামরিক বাহিনী যুক্ত করে দিলে সম্মিলিতভাবে আমরা মুসলমানদেরকে চিরতরে উৎখাত করতে পারব"—সায্‌যাহ অভিমত ব্যক্ত করে—"বনূ ইয়ারবুর সাথে আমার সম্পর্কের কথাও আপনার অজানা নয়।"

"খোদার কসম!" মালিক বিন নাবীরা গদগদ কণ্ঠে বলে—"আমি আপনাকে পূর্ণ সমর্থন এবং সার্বিক সহায়তা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার একটি পূর্বশর্ত আছে। আসলে এটি কোন শর্ত নয়; বরং আমাদেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটি জরুরী বিষয়।...আপনি হয়ত ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে, বনূ তামীমের বিভিন্ন গোত্রে শত্রুতাভাব সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট তৈরী করতে হবে। অতঃপর সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে হবে। যদি তারা আমাদের সমঝোতা প্রস্তাবে সাড়া না দেয় তবে তাদেরকে উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। কারণ তাদের হত্যা না করলে তারা এখানেই আমাদের বিরোধী হয়ে উঠবে। তাদের মাঝে মদীনার প্রতি অনুগত আছে অনেকে। তারা খাঁটি মুসলমান। আন্তরিক ও সত্যিকার অর্থেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তার উপর যে কোন মূল্যে তারা টিকে থাকবে। ফলে তাদেরকে জীবিত রেখে আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়া আত্মহত্যারই শামিল হবে।"

মদীনা পরাস্ত হল কিনা—এটা মালিকের উদ্দেশ্য ছিল না; তার লক্ষ্য ছিল মদীনাকে ইস্যু করে সায্যাহ্ বাহিনী দ্বারা বনূ তামীমের মুসলমান এবং অপর বিরুদ্ধবাদীদের সমূলে বিনাশ করে তার একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব নিশ্চিত করা। ঐতিহাসিকরা লেখেন, সায্যাহ্ মালিক বিন নাবীরার পুরুষ সুলভ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ ও তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে দারুণ প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে মালিকের প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ সমর্থন করে। নিজেদের স্বাক্ষর সম্বলিত সন্ধিপত্র সকল গোত্র প্রধান বরাবর তারা প্রেরণ করে। মদীনা হামলাকে সামনে রেখেই যে এ সন্ধি প্রস্তাব তা বড় হরফে উল্লেখ করে দেয়া হয়।

মাত্র এক গোত্র প্রধান—ওকী ইবনে মালিক—এ সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দেয়। অন্যরা তাদের সাথে সমঝোতায় আসতে অস্বীকার করে। ফলে সায্যাহ্, মালিক এবং ওকী-এর সম্মিলিত বাহিনী অন্যান্য গোত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। দানশীলতা, আতিথেয়তা এবং সুরসিক গোত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ বনূ তামীম পরস্পরের মোকাবিলায় বন্য, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর রক্তখেকো দানবে পরিণত হয়। যুদ্ধের দাবানলে বসতি উজাড় হয়ে যায়। খুনের দরিয়া সৃষ্টি হয়। লাশভূমিতে পরিণত হয় মরুভূমি।

লায়লা সদর দরজায় মহিলাদের আহাজারি এবং কাতরধ্বনি শুনতে পায়। সে ঘরের কাজ ফেলে দৌড়ে ছুটে আসে। দুরু দুরু বুক, উৎকীর্ণ কান, পাংশুবর্ণ মুখ, বিস্ফোরিত চোখ আর উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে সে কম্পিত হাতে গেট খুলে। সেখানে কিছু মহিলা শোকাহত হয়ে করুণ সুরে কাঁদছিল।

"তবে কি আমি বিধবা হয়ে গেলাম?" লায়লা উদ্বেগের সাথে জানতে চায়— "তোমরা মালিক বিন নাবীরার লাশ আননি তো?"

লায়লাকে দেখে মহিলাদের কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে যায়। তারা চিৎকার করে করে বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকে। তিন মহিলার কোলে কচি শিশুর লাশ ছিল। শিশুদের লাশ যে কাপড়ে ঢাকা ছিল তাও রক্তরাঙা ছিল।

"লায়লা! তুমি নারী নও?" এক মহিলা কোলের রক্তস্নাত লাশ লায়লার সামনে এগিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে—"তুমি নারী হলে স্বামীর হাত এটে ধরতে। যেন তার হাত কোন শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয়।"

"এই দেখ"—আরেক মহিলা কোলে ধরা শিশুর লাশ লায়লার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে।

"আরও দেখ"—আরেকটি বাচ্চার লাশ লায়লার সামনে এনে রাখা হয়।

"আমার এই সন্তানের দিকে তাকাও"—আরেক মহিলা তার দু'টি সন্তান

লায়লার সামনে দাঁড় করিয়ে বলে—"এরা চিরদিনের জন্য এতিম হয়ে গেছে।"

লায়লা কিংবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু ফ্যাল ফ্যাল নজরে চেয়ে থাকে। তার মুখ হয়ে যায় মূক। নৃশংস এ দৃশ্য দেখার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। চোখের সামনে এভাবে একাধিক শিশুর লাশ দেখে তার মাথা ঘুরে ওঠে। ওদিকে লায়লাকে নিরব-নিস্তব্ধ দেখে মহিলারা আরো ক্ষেপে যায়। তারা চতুর্দিক দিয়ে লায়লাকে ঘিরে নেয় এবং ক্রুদ্ধ সিংহীর মত গর্জন করে বলতে থাকে।

"তুমি আস্ত ডাইনী।"

" তোর স্বামী নিরেট জল্লাদ।"

"সায্যাহ তোর স্বামীর প্রেমিকা।"

"সায্যাহ্ তোর সতীন।"

" তোর ঘরে আমাদের ঘরের লুণ্ঠিত মাল আসছে।"

"মালিক বিন নাবীরা তোকে আমাদের বাচ্চার কাঁচা রক্ত পান করাচ্ছে।"

"আমাদের সমস্ত সন্তান কেটে টুকরো টুকরো করে নিক্ষেপ করলেও আমরা সায্যার নবুওয়াত মেনে নিব না।"

"আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স.)। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।"

মহিলাদের এহেন চিৎকারে অল্পক্ষণের মধ্যে সেখানে এলাকার অন্যান্য লোকও এসে জমা হয়। মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশী। লায়লা লজ্জা-অনুতাপে তার সুন্দর চেহারা দু'হাতে ঢেকে ফেলে। তার শরীর হেলতে থাকে। দু'মহিলা তাকে ধরে ফেলে। কিন্তু সে নিজেকে মূর্ছা যেতে দেয় না। মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে সামলে নেয়। আস্তে আস্তে শোক সন্তপ্ত মহিলাদের দিকে অশ্রুস্নাত চোখে তাকায়।

"তোমাদের সন্তানদের রক্তের বদলা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই"—লায়লা বলে-"আমার সন্তান নিয়ে যাও; তাকে কেটে টুকরো টুকরো কর।"

"আমরা হিংস্র নরখাদক নই"—একটি কলরব ওঠে—"আমরা ডাইনী নই। যুদ্ধ খেলা বন্ধ করাও। হত্যা-লুটতরাজ রোধ করাও। তোমার স্বামী ওকী এবং সাযযাহ-এর সাথে মিলে এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ চালাচ্ছে।"

"যুদ্ধ শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে"—লায়লা বলে—"বাচ্চাদের লাশ ভিতরে আন।"

শোকাহত মায়েরা নিজ নিজ সন্তানের লাশ ভিতরে নিয়ে যায়। লায়লা লাশ তিনটি ঐ পালঙ্কে যত্নের সাথে শুইয়ে রাখে যেখানে সে আর মালিক বিন নাবীরা শয্যাযাপন করে। সে লাশগুলো এমনভাবে ঢেকে রাখে যে, বাইরে থেকে বুঝার কোন উপায়ই ছিল না যে, তিন তিনটি লাশ এখানে শায়িত।

মালিক বিন নাবীরা লায়লা বলতে পাগল ছিল। সে ছিল রীতিমত লায়লার পূজারী। লায়লার সৌন্দর্য তার উপর যাদুর মত আচ্ছন্ন রাখত। কিন্তু এটা এমন এক যুদ্ধ ছিল সেখানে লায়লাকে সাথে রাখা মালিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে লায়লার দুর্বার আকর্ষণ তাকে লায়লা হতে বেশীক্ষণ দূরে থাকতে দেয় না। যুদ্ধ নিকটবর্তী কোথাও হলে সে রাতে লায়লার সান্নিধ্যে চলে আসত। ঘটনাক্রমে ঐ দিন রাতে মালিক ঘরে ফেরে। লায়লাকে দেখামাত্রই তার শরীরে শরাবের মত নেশার উদয় হয়।

"পালঙ্কে কেউ শায়িত?"—মালিক বিন নাবীরা জিজ্ঞাসা করে।

"না", লায়লা জবাবে বলে—"আপনার জন্য একটি উপঢৌকন ঢেকে রেখেছি...তিনটি ফুল, কিন্তু তা ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে এই যা।"

মালিক ক্ষিপ্রগতিতে চাদর ধরে টান দেয় এবং এমন ভঙ্গিতে পিছে সরে আসে যেন পালঙ্কে বিষধর সাপ দংশনের জন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। সে পিছনে ফিরে লায়লার দিকে তাকায়।

"রক্তপিপাসু হায়েনার জন্য এর চেয়ে উত্তম উপঢৌকন আর কিছু হতে পারে না"—লায়লা তীর্যক মন্তব্য করে এবং তাকে বিস্তারিতভাবে জানায় যে, নিহত শিশুদের মায়েরা কেমন শোকাহত হয়ে তার কাছে আসে এবং কি কি বলে গেছে। এরপর লায়লা তার দুগ্ধপায়ী বাচ্চা মালিকের সামনে পেশ করে বলে—"যান, নিয়ে যান। ঐ শিশুগুলো এবং নিজের এই শিশুর রক্ত পান করে কলিজা ঠাণ্ডা করুন। রক্তপিপাসা নিবারণ করুন।" লায়লা আরো বলে—"আপনি কি সেই মালিক বিন নাবীরা মানুষ যাকে সদাহাস্যময় বলে? এই কি আপনার বাহাদুরী এবং বীরত্বের পরিচয় যে, আপনি এক নারীর ফাঁদে পড়ে লুটতরাজ করে ফিরছেন? এতই বাহাদুর হলে মদীনায় গিয়ে আক্রমণ করুন। এখানকার দুর্বল ও সাদাসিদা মুসলমানদের উপর কেন হাত তুলছেন!"

মালিক বিন নাবীরা সাধারণ লোক ছিলেন না। তার ব্যক্তিত্বের মাঝে এক ধরনের স্বতন্ত্র বিশেষত্ব ছিল যা অন্যদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত। তার জীবন অভিধানে ভর্ৎসনার কোন শব্দ লেখা ছিল না। বিদ্রূপ কোনদিন তার কানে পড়েনি। তার মাথা কোনদিন কোন কাজে অবনত হয়নি।

"এই কি আপনার গর্ব আর গৌরবের প্রতিফলন?" লায়লা তাকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে—"এই নিষ্পাপ বাচ্চাদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে গর্ব করবে?...জনৈক মহিলার কারণে...এক নারী আপনার গর্ব-অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আপনাকে খুনী এবং ডাকাতের কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে।

নিজের সন্তান আপনার কাছে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। পিছন হতে আমার পিঠেও একটি তীর বসিয়ে দিও।"

"লায়লা!" মালিক বিন নাবীরা গর্জন ছোড়ে। কিন্তু শেষদিকে এসে তার কণ্ঠস্বর এমনিতেই নীচু হয়ে যায় এবং একজন অপরাধীর মত আওয়াজে বলে—"কোন নারীর জালে আমি ফেঁসে যাইনি।"

"মিথ্যা বলবেন না মালিক!" লায়লা বলে—"আমি চলে যাচ্ছি। সায্‌যাহ্‌কে এখানে নিয়ে আসুন...। তবে মনে রাখবেন, আপনার নেতৃত্ব, সৌন্দর্য, কাব্যচর্চা এবং অন্যায় রক্তপাত, এই নিহত বাচ্চাদের মাতাদের বুকফাটা আর্তনাদ এবং অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারবে না।... এ তো মাত্র তিনটি লাশ। বসতির লুটতরাজ চালানোকালে না জানি কত শত বাচ্চা এভাবে আপনার ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। আপনি শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না। আপনার রক্তও একদিন বইবে এবং আমি অন্য কারো স্ত্রী হব।"

মালিক বিন নাবীরা কিঞ্চিৎ ঝুঁকে লায়লার দিকে তাকায়। যেন তার পিঠে কেউ খঞ্জর বসিয়ে দিয়েছে। সে আস্তে আস্তে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

মালিক রাতে ঘরে ফেরে না। সকালের সূর্য উঁকি দেয়। রক্তরাঙা রবি বাতাহ্-এর সৌন্দর্যকে বহুগুণে বৃদ্ধি করত। প্রভাতের মায়াবী ঝলকে বাতাহ্-এর চেহারা পাল্টে যেত। কিন্তু আজকের সূর্য যেন অন্যদিনের সূর্য নয়। নিষ্প্রভ, নিস্তেজ, ম্রিয়মাণ। সে আজ ঝলক নয়; মুঠোমুঠো বেদনা উপহার দেয়। ফ্যাকাশে-রক্তহীন দেখা যায় তার চেহারা। যে সূর্য প্রতিদিন বাতাহ্-এর জন্য হাসির কাকলি আর রূপের বাহার বয়ে আনত আজ তার নিজের চেহারাই ছিল পাংশুবর্ণ এবং চোখে মৃত্যুর আতংক। সেখানকার প্রতিটি নারীর চেহারায় ছিল বেদনার ছাপ এবং চোখ ছিল অশ্রুসজল। এটা ছিল বনূ তামীমের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া লুটতরাজের ভয়াবহ টর্নেডোর ফল। সূর্যের যে কিরণের জন্য বাতাহ্‌বাসী প্রত্যহ অপেক্ষমাণ থাকত এবং সূর্যের কিরণও সকল বাঁধা ডিঙিয়ে বাতাহ্-এর ঘরে ঘরে এসে হাজির হত আজ সে কিরণের জন্য কাউকে অপেক্ষমাণ দেখা যায় না এবং কিরণও কেমন যেন দুরুদুরু বুকে বাতাহ্-এর অলিতে-গলিতে এসে প্রবেশ করে।

সূর্য আরেকটু উপরে উঠলে নিস্তব্ধ বাতাহ্ হঠাৎ সরব হয়ে ওঠে। চারদিকে ছুটোছুটি আর হুলস্থূল পড়ে যায়। মায়েরা শিশুদের নিয়ে অন্তঃপুরে চলে যায়। দরজার খিল এঁটে দেয়। যুবতী কন্যার সম্ভ্রম রক্ষায় অনেককে বসতি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে দেখা যায়। আত্মগোপনই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এলাকার বৃদ্ধরা কামান, তূণীর নিয়ে ছাদে ওঠে। যুবকরা বর্শা এবং তলোয়ার বের করে পজিশন

নিয়ে দাঁড়ায়—এ সবের কারণ এই ছিল যে, কে যেন চিৎকার করে সতর্ক করে বলছে, শত্রুবাহিনী আসছে।

সকলের আতংকিত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরের গগন-পবনে। বহুদূরে ধূলোর মেঘমালা উড়তে দেখা যায়। ধূলোর এমন প্লাবন সৃষ্টি কেবল কোন সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব। বাতাহ্-এর যুবকের সংখ্যা ছিল কম। অধিকাংশই মালিক বিন নাবীরার সাথে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। অল্প সংখ্যক যারা ছিল তারা চরম ভীতি এবং আতংকিত হয়ে পড়েছিল।

লায়লার শয়ন কক্ষের পালঙ্কে তখনও তিন শিশুর লাশ পড়েছিল। বাতাহ্-এ হুলস্থূল পড়ে গেলে সেও নিজের শিশু-বাচ্চা বুকের সাথে চেপে ধরে কেল্লাসদৃশ ঘরের ছাদে এসে দাঁড়ায়। সে বারবার কোলের বাচ্চার দিকে তাকায় এবং চুমোয় চুমোয় সিক্ত করতে থাকে তার মুখমণ্ডল। সম্ভবত তার মাঝে এই আশংকার উদ্রেক হয় যে, আসন্ন শত্রুরা হয়ত প্রতিশোধ নিতে আসছে। আর তারা নিজেদের বাচ্চা হত্যার প্রতিশোধ তার বাচ্চাকে হত্যার মাধ্যমে নিবে।

ভূমি উৎক্ষিপ্ত ধূলো নিকটে এসে পড়ে। ধূলোর পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘোড়া এবং উট আবছা আবছা দেখা যায়।

"সাবধান!, বনূ ইয়ারবূ! হুঁশিয়ার!" অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠ ভেসে আসে—"জীবন বাজি রাখবে। ভীত হবে না।"

আগন্তুক বাহিনী ধূলোর আস্তরণ থেকে বেরিয়ে আরো এগিয়ে আসে। এলাকার কিছু লোক ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা এবং তলোয়ার নিয়ে আগত সৈন্যদের উদ্দেশে এগিয়ে যায়। তাদের পরিণাম ছিল স্পষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাদের প্রভাবে সশস্ত্র অবস্থায় এগিয়ে আসতে দেখে আগত সৈন্যদের বিন্যস্ত সারিতে কোনরূপ পরিবর্তনের আভাস দেখা যায় না। বরং তারা আরো এগিয়ে গিয়ে ঐ সৈন্যদের সাথে মিশে তাদেরই অংশ হয়ে যায়।

"আপনি!" তারা শ্লোগান তোলে—"আপনি! মালিক বিন নাবীরা।...যুদ্ধ খেলা শেষ।"

অল্প সময়ের মধ্যে যখন সকলেই জানতে পারে যে, আগত সৈন্যরা কোন শত্রুবাহিনী নয়; বরং তাদেরই গোত্রের সৈন্যরা, যুদ্ধ ময়দান থেকে তারা ফিরে আসছে, তখন সর্বত্র খুশীর শ্লোগান ওঠে। চিৎকার এবং গলা ফাটিয়ে সবাই আনন্দ প্রকাশ করে। মৃত্যুপ্রায় বাতাহ্ নগরী দেহে প্রাণ ফিরে পায়। হৃদয়ের স্পন্দন পেয়েই সে জেগে ওঠে। মৃত্যুপুরী মুহূর্তে জনতার কল-কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে। জনতা মুহুর্মুহু শ্লোগান আর বীরোচিত সংবর্ধনা দিয়ে সৈন্যদের

অভ্যর্থনা জানায়। রজনীগন্ধা আর গোলাপের তোড়া দিয়ে জনতা প্রিয়জনদের বরণ করে নেয়।

মালিক বিন নাবীরা অভ্যর্থনায় যোগ দেয় না। সে এসে কোথাও দাঁড়ায় না। সোজা নিজের বাড়িতে আসে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে অন্দরে চলে যায়। লায়লার দুর্বার আকর্ষণই তাকে কোথাও থামতে কিংবা অপেক্ষা করতে দেয় না। লায়লার মলিন মুখে গোলাপের হাসি না ফোটা পর্যন্ত তার হৃদয় শান্ত হয় না। যে কোন মূল্যে সে প্রাণপ্রিয়া লায়লার মুখের হাসি ধরে রাখতে চায়। তাইতো সে ঘর ছেড়ে এই পণ করে বেরিয়ে গিয়েছিল যে, লায়লার মনের ইচ্ছা পূরণ করেই তবে সে ঘরে ফিরবে। লায়লার ইচ্ছা বাস্তবেই সে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে। লুটতরাজের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সৈন্যদের নিয়ে ফিরে আসে। ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় লায়লা তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবে, ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিবে। সবচে বড় কথা, লায়লার ম্লান মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটবে—এমনি একগুচ্ছ আশা নিয়ে সে দৌড়ে অন্দর মহলে এগিয়ে যায়। কিন্তু না; অন্দরের অবস্থা ছিল বাইরের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইরে আনন্দের জোয়ার উঠলেও ভিতরে তখনো ভাটা চলছিল। অন্দর মহল ছিল থমথমে, নির্বাক, নিস্পন্দন। লায়লা আঙ্গিনার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। তার আকর্ষণীয় চেহারায় পূর্বের সেই উদাসীনতার ছাপ তখনো বিদ্যমান ছিল। তার ঐ হরিণটানা আঁখি এবং কাজল তোলা চোখ বুজা বুজা ছিল, যার এক একটি পলকের ইশারায় গোত্রের শত শত যুবক জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

"তোমার নির্দেশ আমি মান্য করেছি লায়লা!" মালিক বিন নাবীরা এক প্রকার দৌড়ে গিয়ে লায়লাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করতে করতে বলে—"লড়াই খতম করে দিয়েছি। আমরা শীঘ্রই বন্দী বিনিময় করব। সায্‌যাহ-এর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। এই ফুল দ্বারা চেহারার মলিনতা মুছে ফেল।"

মালিকের এহেন আবেগ লায়লার মাঝে কোন অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয় না। তার দেহ যেন প্রাণহীন ছিল। মালিককে দেখে অন্য সময় তার শরীরে যে উষ্ণ শিহরণ বয়ে যেত তা এখন সৃষ্টি হয় না। মালিক তাকে স্বাভাবিক ও প্রাণচঞ্চল করতে অনেক চেষ্টা করে কিন্তু লায়লা পূর্ববৎ ম্রিয়মাণ ছিল। যেন ঝরে যাওয়া একটি ফুল।

"আসলে আমার অন্তরে একটি ভীতি গভীরভাবে বসে গেছে"—অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উদাস কণ্ঠে লায়লা বলে।

"কেমন ভয়?" মালিক ভ্রূ কুঁচকে জানতে চায়—"কার ভয়?"

"শাস্তির"—লায়লা বলে—"প্রতিশোধের।"

সায়্যাহ একা হয়ে গেছে। তার অপর সহযোগী ওকীও তার সঙ্গ ছেড়ে দেয়। মালিক বিন নাবীরা ওকীকে বলেছিল, সে এক নারীর ফাঁদে পা দিয়ে নিজ গোত্রের উপর চড়াও হয়েছে। সায়্যাহ নিজ বাহিনী নিয়ে নাবাযের দিকে চলে যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, সে ইয়ামামায় আক্রমণ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মুসাইলামার ফাঁদে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে মুসাইলামা তাকে বিবাহ করে।

মালিক বিন নাবীরার পাপের শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অন্যতম সহযোগী ওকী বিন মালিক তার সঙ্গ ছেড়ে মুসলমানদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। মালিক তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে।

"আমরা দু'জনও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি তবে মুসলমানরা আমাদের পদতলে পিষ্ট করে ছাড়বে"—মালিক ওকীকে বলে—"আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাদের মোকাবিলা করতে পারব।"

"আমি জীবিত থাকতে চাই মালিক!" ওকী তার উত্তরে বলে—"মদীনা বাহিনীর সামনে আজ পর্যন্ত কেউ টিকতে পেরেছে কি? গাতফান পরাভূত। তাঈ পরাজিত। বনূ সালেম, বনু আসাদ, হাওয়াযিন কেউ মুসলমানদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি। অতঃপর সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং উম্মে জামাল সালমাকেও তাদের সাথে যুক্ত করেছে। কিন্তু তারপরেও টিকতে পারেনি। তোমার মনে নেই, কিভাবে ওলীদের পুত্র খালিদ তাদেরকে তাড়িয়ে ও ভাগিয়ে দিয়েছে? সালমাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছি। তারা এ রক্তের প্রতিশোধ নিবেই। আমাদের ক্ষমা করবে না। সমস্ত গোত্রকে পরাজিতকারী খালিদ মদীনায় ফিরে যায়নি। সে এখন বাযাখায়। অপরদিকে মুসলমানদের আরেক প্রখ্যাত সেনাপতি উসামাও আছে। তাদের মধ্য হতে যে কেউ যে কোন মুহূর্তে এদিকে আসতে পারে। তাদের রক্তপাতের ক্ষমা এবং আমাদের প্রায়শ্চিত্তের এখন একমাত্র পথ এটাই যে, আমরা পুনরায় তাদের আনুগত্য মেনে নিয়ে এখানকার বিভিন্ন গোত্র হতে যাকাত, ট্যাক্স ইত্যাদি পূর্বের মত নিয়মিত আদায় করে যাব।"

ওকী বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেও মালিক বিন নাবীরা তৎক্ষণাৎ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

হযরত খালিদ বিন অলীদ (রা.) এরই মধ্যে অবগত হন যে, মালিক বিন নাবীরাকে রাসূল (সা.) আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে যাকাত, কর ইত্যাদি আদায় করে মদীনায় পাঠায়নি; বরং পুনরায় তা মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছে। গোয়েন্দারা প্রমাণ স্বরূপ হযরত খালিদ (রা.)-কে মালিকের রচিত একটি পংক্তিও শুনায়। এ পংক্তিতে সে রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর নিজ গোত্রকে সম্বোধন করে বলেছিল, সবাই নিজ নিজ সম্পদ নিজেদের কাছে রাখ এবং এর জন্য কোন

ভয়ের আশংকা করো না। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে আমাদের উপর কোন বিপদ নেমে এলে আমরা তা এই বলে মোকাবিলা করব যে, আমরা মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিলাম; আবু বকরের নয়।

মালিক বিন নাবীরা সায্যাহ এর সাথে মিলে মুসলমানদের উপর যে ব্যাপক গণহত্যা চালায় তার খবরও হযরত খালিদ (রা.) পেয়ে যান। তিনি নিজ বাহিনীকে দ্রুত বাতাহ-এর উদ্দেশে প্রেরণ করেন। তাঁর এ বাহিনীতে মদীনার আনসারও ছিল। তারা বাতাহ-এর উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণের বিরোধিতা করেন।

"আল্লাহ্র কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আমার সৈন্যদের মাঝে এই সর্বপ্রথম এমন লোক দেখলাম, যারা নিজ আমীর এবং সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করছে।"

"এটাকে নির্দেশ লঙ্ঘন বলুন অথবা আর যাইকিছু বলুন"—আনসারদের প্রতিনিধিত্বকারী বলে—"খলিফার নির্দেশ ছিল তোলাইহাকে অনুগত করে সেখানে রাসূল (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা পুনর্বহাল করা। কেউ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলে তার মোকাবিলা করা। অন্যথা বাযাখায় গিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকা। আমাদের জানা আছে, বাতাহ-এর উপর আক্রমণের কোন নির্দেশ মদীনার হাইকমান্ড থেকে আসেনি।"

"এটা কারো অজানা আছে কি, আমি তোমাদের আমীর এবং সিপাহসালার?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন এবং সকলের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকান। কোন সাড়াশব্দ না এলে পুনরায় তিনি বলেন—"আমার জানা নেই যে, খলীফার সাথে তোমরা কি চুক্তি করে এসেছ। আমি শুধু জানি যে, খলীফা আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেখানেই ধর্মান্তরিতের খবর পাও এবং যেখানেই মদীনার সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা হয় সেখানে যাবে এবং ইসলামকে সুসংহত ও সমুন্নত করবে। আমি সেনাপতি। দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যদি আমাকে এমন কোন পদক্ষেপও নিতে হয় যার ব্যাপারে খলীফার পক্ষ হতে কোন নির্দেশ নেই তথাপিও তা আমি অবশ্যই করব।...খেলাফতের পক্ষ হতে আদেশ-নিষেধ আমার বরাবর আসে, তোমাদের নিকটে নয়।"

"আমরা কোন দূত আসতে দেখিনি"—জনৈক আনসার বলে।

"এর জবাব দেয়া আমি জরুরী মনে করি না"—হযরত খালিদ (রা.) রাগতস্বরে বলেন—"আর আমি এমন কাউকে আমার বাহিনীতে দেখতে চাই না যার অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে। আমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির ভিখারী। আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর পবিত্রাত্মার সন্তুষ্টি চাই আমি। ব্যক্তিগত সন্তোষের উদ্দেশ্য কারো থাকলে সে চলে যেতে পারে। নিজেকে যথেচ্ছা পরিতুষ্ট

কর। আমার অসংখ্য মুহাজির সৈন্য রয়েছে। এ ছাড়া যে সমস্ত নব মুসলিম আমার সাথে আছে তাদেরকেও আমি পর্যাপ্ত মনে করি।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম তবারী (রহ.) লেখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশমালায় এ পয়েন্টও উল্লেখ ছিল যে, বনী আসাদের নেতা তোলাইহাকে শায়েস্তা করে হযরত খালিদের বাহিনী বাতাহ পর্যন্ত যাবে। কেননা, সেখানকার আমীর মালিক বিন নাবীরা যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করেনি। বরং সে ইসলাম বর্জন করে তার দুশমনে পরিণত হয়েছে।

ইমাম তবারী সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক লেখেন, আনসাররা বাযাখায় রয়ে যায় আর হযরত খালিদ (রা.) তাদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সৈন্যদেরকে বাতাহ-এ নিয়ে যান। খালিদ অনুগত বাহিনী বাযাখা অতিক্রম করে গেলে রয়ে যাওয়া আনসাররা আপোসে আলোচনায় মিলিত হয়। তারা পরিস্থিতি ও অবস্থা এভাবে বিশ্লেষণ করে যে, আমরা এত দূর পর্যন্ত এক সাথে ছিলাম। সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছি। এখন মাঝখানে এসে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মূল বাহিনী হতে এভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য ঠিক হয়নি।

"আমাদের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা এ কারণেও ঠিক নয়"—এক আনসারী মন্তব্য করে—"যে মুহাজির আর নবমুসলিমরা কোন বিজয় হাসিল করলে তার কৃতিত্বের অংশীদার আমরা হব না। মদীনায় গিয়ে এর জন্য আমাদের লজ্জা পেতে হবে।"

"এবং এ কারণেও"—আরেকজন ভিন্ন কারণ উল্লেখ করে বলে—"যে, হযরত খালিদ কোথাও পরাজিত হলে মদীনার জনতা আমাদেরকে তিরস্কার করবে। তারা আমাদেরকে এই বলে নিন্দা করবে যে, মদীনা থেকে এত দূরের রণক্ষেত্রে এসে আমরা হযরত খালিদ ও তার সাথীদের সাথে প্রতারণা করেছি। আমাদেরকে অভিশাপ দেয়া হবে।"

আলোচনার এক পর্যায়ে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে সম্মিলিতভাবে তারা খালিদ বাহিনীতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ততক্ষণ অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। তারা পরামর্শ করে এক দ্রুতগামী সওয়ার তৎক্ষণাৎ হযরত খালিদ (রা.)-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। দ্রুতগামী সওয়ার ধুলিঝড় উড়িয়ে খালিদ বাহিনীর লক্ষ্যে ছুটে আসে এবং সোজা হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে এসে ঘোড়া থামায়।

"আনসারদের মধ্য হতে যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তুমি তাদের একজন নও?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"জি হ্যাঁ, সম্মানিত আমীর!" অশ্বারোহী জবাবে বলে—"আমি তাদেরই

একজন। আপনাকে এ কথা বলার জন্য তারা আমাকে পাঠিয়েছে যে, অনুগ্রহ করে আপনি যেন তাদের জন্য অপেক্ষা করেন। তারা এক্ষুণি এসে আপনার সাথে মিলিত হবে।"

হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের থামতে বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকল আনসার এসে পড়ে। অতঃপর সমস্ত সৈন্য বাতাহ্-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

"লায়লা!" বাতাহে মালিক বিন নাবীরা নিজ স্ত্রীকে বলছে—"তুমি আমাকে ভালবাসা শিখিয়েছ। তোমার রূপ-সৌন্দর্য আর যাদুকরী চোখ আমার কাব্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। এখন আমাকে সাহস যোগাও লায়লা! আমার অন্তরে ক্রমে ভীতি জেঁকে বসছে।"

"আমি আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম অহংকার-গর্ব সম্পূর্ণ বর্জন করুন মালিক!" লায়লা বলে—"কিন্তু আপনি এত দূর এগিয়ে যান যে, মানুষকে পিঁপড়া জ্ঞান করে পায়ের নীচে ফেলে পিষে পিষে হত্যা করেন।"

"অতীতের পাপ স্মরণ করিয়ে দিও না লায়লা!" মালিক আহতস্বরে বলে—"পাপ আমার বীরত্বকে দংশন করছে।"

"আজ আবার কি হল যে, আপনি এত ভীত হয়ে পড়েছেন?" লায়লা ব্যথায় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছ লায়লা?" মালিক বলে—"ব্যাপার আর কিছু নয়; মৃত্যুর ভয় মাত্র। আমার অন্তর বলছে, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে চলেছি। আমার এবং তোমার সম্পর্ক শেষ হতে যাচ্ছে।...অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আমি গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছি। আজ এক গোয়েন্দা এসেছে। সে বলছে, মুসলিম বাহিনী দ্রুতগতিতে এদিকে ছুটে আসছে। বাহিনীর এ গতি অব্যাহত থাকলে পরশু সন্ধ্যা নাগাদ তারা এখানে পৌঁছে যাবে নিশ্চিত।"

"এতে ভয়ের কি হল? প্রস্তুতি নাও"—লায়লা বলে—"গোত্রের লোকদের সমবেত কর।"

"কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না"—মালিক ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলে—"ওকী এবং সায্বাহ-এর সাথে মিলে আমি নিজ গোত্রের উপর দিয়ে যে রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছিলাম তা কেউ ক্ষমা করবে না। পরে তাদের সাথে আপোষ-নিষ্পত্তি করে নিলেও তাদের অন্তর ক্ষুব্ধ। আমার গোত্রের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসবে না।"

"তাহলে আগে চলে যান। মুসলমানদের সেনাপতিকে গিয়ে বলুন, আমি ইসলাম বর্জন করিনি"—লায়লা বলে—"হয়ত তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা করবেন না"—মালিক বলে—"ক্ষমা করতে পারেন না। তারা এমন অপরাধীকে ক্ষমা করে না।"

মালিক বিন নাবীরার উদ্বেগ ও আতংক ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতোমধ্যে খবর এসে পৌছে যে, খালিদ বাহিনী নিকটে এসে গেছে। সে তৎক্ষণাৎ গোত্রের সকলকে জমা হওয়ার নির্দেশ দেয়।

"বনূ ইয়ারবূ-এর সম্মানিত জনতা!" মালিক সমবেত জনতার উদ্দেশে বলে—"আমাদের থেকে যে বড় ভুল হয়ে গেছে তা হলো, আমরা একদা মদীনার শাসন মেনে নিয়েছিলাম এবং পরে আবার তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তারা আমাদের সামনে নয়া ধর্মমত পেশ করলে আমরা তা মেনে নিয়ে পরে আবার অবাধ্য হয়ে যাই। তারা আসছে। সকলে নিজ নিজ ঘরে চলে যাও এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখ। এতে প্রমাণ হবে যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করনি। তারা ডাকলে খালি হাতে সামনে এসে দাঁড়াবে। মোকাবিলায় অযথা প্রাণহানি ছাড়া কাঙ্ক্ষিত লাভ হবে না।...যাও, নিজ নিজ ঘরে যাও।"

জনতা উদ্ভূত বিপদ ও তার মাত্রা অনুভব করতে সক্ষম হয়। ফলে মোকাবিলার পক্ষে কেউ টু-শব্দ করে না। মাথা ঝুঁকিয়ে সকলে নিজ নিজ ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

৬৩২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হযরত খালিদ (রা.) বাতাহ এলাকায় পৌছে যান। তিনি সেখানে পৌছেই সৈন্যদেরকে অবরোধের ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বাতাহ তাঁর কাছে উজাড়ভূমি বলে মনে হতে থাকে। শহরের প্রতিরক্ষায় একজনকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। এমনকি বেসামরিক কোন লোকজনও নজরে পড়ে না। ঘরের ছাদেও কারো মাথা দেখতে পাওয়া যায় না।

"মালিক বিন নাবীরা নিজেকে এত চালু মনে করে যে, আমাকে ফাঁদে ফেলে ঘেরাও করবে?" হযরত খালিদ বাতাহের পিনপতন নিরবতায় উদ্বিগ্ন হয়ে সহ সেনাপতিদের বলেন—"অবরোধের পদ্ধতি চেঞ্জ কর এবং পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রাখ। আমি এই বসতিতে আগুন লাগিয়ে দিব। তারা এখানে নেই। পিছনে সরে গেছে, যেন আমরা এখানে এসে পৌছলে অতর্কিতে পিছন থেকে এসে আক্রমণ করতে পারে।"

হযরত খালিদ (রা.) পূর্ণ সতর্ক, নির্ভীক এবং রণকুশলী ছিলেন। তার পদক্ষেপ অতি দৃঢ় এবং যৌক্তিক হত। তিনি স্বীয় বাহিনীকে দু'ধারী করে বিন্যস্ত করেন। যাতে পশ্চাৎ আক্রমণও রুখে দেয়া যায় এবং শহরের অভ্যন্তর হতে একযোগে শত্রু ছুটে এলে তারও মোকাবিলা করা যায়। মুসলমানদের যে ঘাটতি

ছিল তা হলো সৈন্যের স্বল্পতা। মদীনা হতে অনেক দূরে থাকায় এ মুহূর্তে রিজার্ভ বাহিনী আসারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মুসলিম বাহিনী ইতোমধ্যে যে সমস্ত গোত্রকে অনুগত করতে সমর্থ হয়েছিল সে সমস্ত এলাকায় তাদের ঘাঁটি ও অবাধ অবস্থান ছিল। কিন্তু তখনও এলাকাবাসীর উপর পূর্ণ আস্থা রাখার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নাই। হযরত খালিদ (রা.)-এর শ্বাসরুদ্ধকর ও দক্ষ নেতৃত্ব মুষ্টিমেয় সৈন্যদের মাঝে বিজলির মত বজ্র সৃষ্টি করে রাখত।

হযরত খালিদ (রা.) বসতির মাঝে একদল সৈন্য প্রবেশ করান। কিন্তু তাদের উপর একটিও তীর এসে পড়ে না। প্রত্যেকটি ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। হযরত খালিদ (রা.) বিস্ময়কর এ নীরবতা দেখে নিজেই বসতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

"মালিক বিন নাবীরা!" হযরত খালিদ (রা.) কয়েকবার মালিকের নাম ধরে ডাকেন এবং বলেন—"বাইরে বেরিয়ে এস। অন্যথায় পুরো বসতিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে।"

"আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদ রাখুন"—একটি ঘরের ছাদ থেকে জনৈক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"আমাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিবেন না। আপনি যাকে ডাকছেন সে এখানে নেই। এখানে কেউ আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করবে না।"

"ওলীদের পুত্র!" আরেক ছাদ থেকে আওয়াজ আসে—"আপনি কি দেখছেন না, আমরা ঘরের দরজা লাগিয়ে আড়ালে বসে আছি। মদীনাবাসী কি জানেনা যে, এই আলামতের অর্থ হল, নির্ভয়ে আস; আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব না?"

"অবশ্যই এই ইশারা সম্পর্কে আমি অবগত"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এস। বাচ্চা ও মহিলাদের ইখতিয়ার। তারা চাইলে বাইরে আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে।"

মানুষ নিয়ম-নীতি জানত। তারা অস্ত্র ছাড়াই বাইরে বেরিয়ে আসে। মহিলা এবং বাচ্চারাও বেরিয়ে আসে। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের তল্লাশী করতে পাঠান, যেন কোন ঘরে কোন পুরুষ না থাকে। তিনি সৈন্যদের কঠোরভাবে নিষেধ করেন যে, গৃহস্থ কোন মাল-দ্রব্যের যেন কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি না হয়। আর কারো প্রতি যেন বিন্দুমাত্র কঠোরতা না করা হয়।

মালিক বিন নাবীরার কেল্লাসদৃশ ভবনে হযরত খালিদ (রা.) নিজে যান। সেখানে শুধু গৃহস্থ আসবাবপত্র ইতস্তত পড়ে ছিল। গৃহের অভ্যন্তর বলছিল, গৃহস্থ পরিবার একটু আগে এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। বসতি পরিদর্শন শেষে হযরত

খালিদ (রা.) এতটুকু অনুমান করতে সক্ষম হন যে, জনতাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করার পরামর্শ দিয়ে মালিক স্ত্রী লায়লাকে সাথে নিয়ে পালিয়ে গেছে। যারা তাকে যেতে দেখেছিল তারা তার গতিপথ বলে দেয়। মালিক ঘোড়ায় এবং লায়লা উটে সওয়ার ছিল বলে তারা জানায়।

হযরত খালিদ (রা.) আশে-পাশের বসতিতে লোক পাঠায় এবং জনতা যে পথের খোঁজ দেয় সে পথে কয়েকজন সৈন্য প্রেরণ করে। এটা ছিল মরুপথ। উট এবং ঘোড়ার পদচিহ্ন খুব স্পষ্ট ছিল। বিরতিহীন পদচিহ্ন সৈন্যদেরকে একটি বসতিতে নিয়ে যায়। এটা ছিল বনূ তামীমের একটি বসতি।

"শোন, বনূ তামীমের বাসিন্দা!" হযরত খালিদের পাঠানো লোকদের একজন উচ্চকণ্ঠে বলে—"মালিক বিন নাবীরা সহ বাতাহের কোন লোক এখানে আশ্রয় ও আত্মগোপন করে থাকলে তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমাদের তল্লাশীতে কাউকে পাওয়া গেলে পুরো বসতি জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হবে।"

একটু পরেই মালিক বিন নাবীরা লায়লাকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং নিজেই নিজেকে হযরত খালিদ বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে। বনূ ইয়ারবূ এর আরো কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক এখানে এসে আত্মগোপন করেছিল। তারাও মালিকের অনুসরণ করে আত্মসমর্পণ করে। সৈন্যরা মালিক সহ সবাইকে বাতাহে নিয়ে আসে। লায়লাও মালিকের সাথে ছিল।

"মালিক বিন নাবীরা!" হযরত খালিদ (রা.) মালিককে সামনে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"এটা কি সত্য নয় যে, তুমি যাকাত কর ইত্যাদি উঠিয়ে মদীনায় প্রেরণের পরিবর্তে আবার লোকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলে?"

"মুসলমানদের মোকাবিলা না করার পরামর্শ দিয়ে আমি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম"—মালিক বিন নাবীরা জবাবে বলে—"আমি তাদের এ কথাও বলেছিলাম যে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও এবং যাকাত আদায় কর।"

"আর তোমার নিজের আত্মগোপনের কারণ এই যে, তুমি ইসলাম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"এবং তুমি ইসলাম থেকে দূরেই থাকতে চাও।...তুমি কবিতার মাধ্যমে মানুষকে বলেছিলে, তারা যেন যাকাত-কর না দেয়। আর তুমি নিজেও ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধাচরণ করে লোকদেরও বিরুদ্ধাচরণ করতে প্ররোচিত করেছিলে।"

"হ্যাঁ, ওলীদের পুত্র!" মালিক বলে—"আমি এতদিন বিরুদ্ধাচরণ করেছি ঠিকই কিন্তু এখন আমি তাদেরকে ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধাচরণ করা হতে নিষেধ করছি।"

"তুমি সায্‌যাহ এর মিথ্যা নবুওয়াতকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"এবং তার সাথে মিলে জনতার প্রাণনাশ এবং তাদের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করেছ। আর মুসলমানদের উপর চালিয়েছ ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ।"

মালিক মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে।

"এতগুলো অপরাধের পর তোমাকে হত্যা না করার কোন কারণ আছে কি?" হযরত খালিদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চান।

"আমার বিশ্বাস, আমাকে হত্যার কোন নির্দেশ খলীফা আপনাকে দেননি"—মালিক বিন নাবীরা বলে।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ বলেন—"আমি তোমাকে বেঁচে থাকতে দিতে পারি না।"

মালিক বিন নাবীরা সামনে এলে হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখের সামনে ভেসে আসে ঐ উজার বসতি, যা মালিক এবং সায্‌যাহ মিলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। মালিকের প্রতি হযরত খালিদ (রা.) ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। তার অপরাধগুলোর প্রত্যেকটি ছিল জঘন্য ও ক্ষমাহীন। হযরত খালিদ (রা.) অনেক দূরে ছিলেন। তিনি সেখান হতে অযথা বাতাহে ছুটে আসেননি। তাঁর কাছে রীতিমত গোয়েন্দা রিপোর্ট পৌঁছতে থাকে। মালিক যে অত্যন্ত জঘন্য ও নৃশংস পন্থায় মুসলমানদের হত্যা ও ধ্বংস করে তিনি তা ভালভাবেই জানতেন।

"তাকে এবং তার সাথে যারা আত্মগোপন করেছিল তাদের নিয়ে যাও এবং হত্যা করে ফেল"—হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন।

তাদেরকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেলে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে খবর পৌঁছে যে, লায়লা নাম্নী এক রূপবতী নারী তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। সে নিজেকে মালিক বিন নাবীরার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইতে এসেছে। হযরত খালিদ (রা.) তাকে উপস্থিত করতে বলেন।

হযরত খালিদ (রা.) নিজেও ছিলেন সর্দার পুত্র। খান্দানী ও শাসক পরিবারে লালিত-পালিত হওয়ার দরুণ তাঁর মন-মানসিকতা প্রশস্ত ছিল। উন্নত অভিরুচি, প্রফুল্লচিত্ত এবং ফুরফুরে মেজাজের লোক ছিলেন। লায়লা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে হযরত খালিদ (রা.) মুহূর্তকালীন নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকেন। লায়লা তখনও পূর্ণ যুবতী ছিল।

"স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে এসেছ?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"এ ছাড়া আর কিইবা উদ্দেশ্য হতে পারে আমার?" লায়লা বলে।

"যখন সে প্রতিটি বসতিকে নিজের অধিকারভুক্ত মনে করে একের পর এক

অপরাধ চর্চা করছিল তখন যদি তুমি তাকে বাধা দিতে তাহলে আজ এভাবে বিধবা হতে হত না"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"সেকি তোমাকে বলেনি, তার তলোয়ার কত বধূকে বিধবা করেছে? তার জানা ছিল না যে, পাপের খেসারত তাকে একদিন দিতেই হবে।"

"তাকে রোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না"—লায়লা বলে।

"তাহলে আজও তুমি আমাকে বিরত রাখতে পারবে না"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"এটা আমার নিজের নয়; খোদ আল্লাহ্‌র নির্দেশ।"

হযরত খালিদ (রা.) লায়লার আবেদন গ্রাহ্য করেন না। লায়লা হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে থাকাকালেই খবর এসে পৌঁছে যে, মালিক বিন নাবীরা এবং তার অন্যান্য সাথীদের হত্যা করে দেয়া হয়েছে।

॥ তের ॥

এরপর একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে খালিদ বাহিনী এবং মদীনায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। আর তা হলো, বাতাহে হযরত খালিদ (রা.) লায়লাকে বিবাহ করেছিলেন।

মদীনার আনসাররা এ বিবাহে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। হযরত আবু কাতাদা (রা.) শপথ করেন যে, ভবিষ্যতে হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে কোন যুদ্ধে কখনো অংশগ্রহণ করবেন না। তাদের অভিযোগের ভিত্তি হল, তারা ধারণা করে যে, হযরত খালিদ (রা.) লায়লার রূপ-সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে তার স্বামী মালিক বিন নাবীরাকে হত্যা করে তাকে নিজে বিবাহ করার জন্য।

এ সম্পর্কিত যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে তার মধ্য একটির বিবরণ এরূপ যে, লায়লা স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইতে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে আসে এবং এক পর্যায়ে তার পায়ে পড়ে মিনতি জানায়। লায়লার মাথায় কাপড় থাকত না এবং তার চুল খোলা থাকত। হযরত খালিদ (রা.)-এর পা ধরে যখন সে মাথা নিচু করে তখন তার খোলা চুলগুলো কাঁধের উপর এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিক্ষিপ্ত চুল হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টিকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি চুল দেখে বড়ই মুগ্ধ হয়ে বলেন—"এখন তো তোমার স্বামীকে অবশ্যই হত্যা করব।"

শালীন রুচিসম্পন্ন এবং উন্নততর মানসিকতার দরুণ হযরত খালিদ (রা.) লায়লার ভুবনমোহিনী রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেও হতে পারেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বাস্তবে এমন উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেছিলেন, আমার দেহে এমন কোন স্থান আছে কি, যেখানে জিহাদের ক্ষত চিহ্ন

নেই? তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র এত দুর্বল ছিল না যে, এক নারীর কারণে নিজের পদমর্যাদা হতে অন্যায়ভাবে ফায়দা লুটবেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ অবলম্বনকারীদের ব্যাখ্যা হল, তিনি মালিক বিন নাবীরা ও তার সাথীদেরকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজে তাদের বিচার না করে মদীনায় পাঠাতে চান। সে সময় রাতে তীব্র শীত পড়ত। হযরত খালিদ (রা.)-এর খেয়াল হয় যে, হয়ত কয়েদীরা শীতে কষ্ট পাচ্ছে এবং কাঁপছে। তিনি নির্দেশ দেন—"দাফিউ আসরাকুম অর্থাৎ বন্দীদের গরমের ব্যবস্থা কর"—কেনানা ভাষায় 'মুদাফাত' হত্যার অর্থে ব্যবহৃত হত। দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দীরা যাদের প্রহরাধীন ছিল তাদের সবাই ছিল কেনানার অধিবাসী। মালিক বিন নাবীরা এবং তার সাথীদের অপরাধের মাত্রাও যে ভয়ানক ছিল তাও তারা জানত। ফলে তারা "গরমের ব্যবস্থা"-এর অর্থ বুঝে হত্যা করা। যার দরুণ প্রহরীরা মালিক এবং তার সাথীদের হত্যা করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) যখন ঘটনা জানতে পারেন তখন এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন—"আল্লাহ্র ইচ্ছা যে কোন উপায়ে সম্পন্ন হয়েই থাকে।"

এ ছাড়া পরস্পর সাংঘর্ষিক ও স্ববিরোধী অসংখ্য বর্ণনা ইতিহাসে ভরপুর। এর কতক হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষে যায় আর কতক যায় বিপক্ষে। বিরোধী বর্ণনাগুলোর বর্ণনাকারীদের ধর্মীয় পরিচয়ের দিকে তাকালে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তাদের প্রতিটি শব্দ আক্রোশ ও পক্ষপাতিত্বে ভরা। প্রতিটি শব্দ হতে যেন হযরত খালিদ (রা.)-এর অবমাননা ঝরে পড়ছে।

ইতিহাস স্ববিরোধী বর্ণনায় বড়ই সরব কিন্তু এই বিবাহে লায়লার প্রতিক্রিয়া কি ছিল সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব। কোন ঐতিহাসিক লেখেনি যে, লায়লা বাধ্য হয়ে হযরত খালিদ (রা.)-কে স্বামী হিসেবে মেনে নেয়, না কি এক ভূবন বিজয়ী বীর, নামকরা সেনাপতির সাথে তার বিবাহ হচ্ছে বলে খুব আনন্দিত হয়।

তৎকালীন যুগের সমরনীতি অনুযায়ী লায়লা গনিমতের মাল ছিল। হযরত খালিদ (রা.) চাইলে তাকে বাদী হিসেবে নিজের কাছে রেখে দিতে পারতে। ইতিহাসের একটি বর্ণনা হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষে যায়। আর তা হলো, হযরত খালিদ (রা.) তাকে নিজের বা অন্য কারো বাদী হওয়ার থেকে রক্ষা করেন। সে শাহজাদীর মত রূপবতী ছিল। বাদীর জীবন কত দুঃখ ও বঞ্চনার হয় তা হযরত খালিদ (রা.) জানতেন। তিনি আরো অনুভব করেন যে, লায়লা নজরকাড়া সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে বড় বিচক্ষণ এবং জ্ঞানীও বটে। হযরত খালিদ (রা.) মূলত এক অসহায় নারীর সুপ্ত প্রতিভা এবং যোগ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

সুদূর মদীনাতেও এই খবর পৌছে যে, হযরত খালিদ (রা.) মালিক বিন নাবীরাকে হত্যা করে তার স্ত্রীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। খবর পৌছে তাও সোজা খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে। সংবাদদাতা ছিলেন হযরত আবু কাতাদা (রা.)-এর মত বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি এই বিবাহে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। তিনি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে 'সাইফুল্লাহ' উপাধি প্রদান করেছেন। তার বিরুদ্ধে তিনি কোন পদক্ষেপ নিবেন না। তিনি তো কোন জীবিত ব্যক্তির স্ত্রীকে আটকে তাকে নিজের বধূ বানাননি।

হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর জবাবে তুষ্ট হন না। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে যান এবং তাকে এমন ভাষায় লায়লার সাথে হযরত খালিদ (রা.)-এর বিবাহের কাহিনী শোনান, যার দ্বারা প্রকাশ পায় যে, হযরত খালিদ (রা.) একজন বিলাসপ্রিয় মানুষ এবং তার এই আয়েশী জীবন স্বীয় কর্তব্য পালনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং যুদ্ধযাত্রায় দারুণ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বর্ণনাভঙ্গিতে হযরত উমর (রা.)-এর ক্রোধ উথলে ওঠে। তিনি আবু কাতাদা (রা.)-কে সাথে নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

"সম্মানিত খলীফা!" হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন—"খালিদের অপরাধ সামান্য নয়। বনূ ইয়ারবূর সর্দার মালিক বিন নাবীরাকে হত্যার বৈধতা সে কিভাবে প্রমাণ করবে?"

"কিন্তু তুমি কি চাও উমর?" হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"খালিদের অপসারণ!" হযরত উমর (রা.) বলেন—"কেবল অপসারণ নয়; তাকে গ্রেপ্তার করে এখানে এনে শাস্তি দেয়া হোক।"

"উমর!" হযরত আবু বকর (রা.) বলেন—"এতটুকু তো ঠিক যে, খালিদ থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ ভুল এতটা মারাত্মক নয় যে, তাকে অপসারণ করে রীতিমত শাস্তি দিতে হবে।"

হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পিছু ছাড়েন না। হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি হযরত উমর (রা.)-এর এই কঠোরতার কারণ তার প্রতি কোনরূপ শত্রুতা বা বিদ্বেষ নয়; বরং আসল কথা হলো, হযরত উমর (রা.) সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি বড়ই কঠোর ছিলেন। সেনাপতিদের মাঝে কোন অন্যায়-আচরণ ও ভুলের অনুপ্রবেশ হোক তা তিনি চাচ্ছিলেন না। বিচার সাপেক্ষে সমুচিত শাস্তি দিয়ে তিনি ভবিষ্যতের জন্য সকল

সেনাপতিকে শিক্ষা দিতে চান।

"না উমর!" হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর বারবার পীড়াপীড়ির পর বলেন—"আমি ঐ তলোয়ার খাপবন্ধ করতে পারি না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের উপর বিজয়ী করেছেন।"

হযরত উমর (রা.) তুষ্ট হতে পারেন না। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে অসন্তুষ্টও করতে চান না। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে মদীনায় তলব করেন।

হযরত খালিদ (রা.) দীর্ঘ সফর পাড়ি দিয়ে বহুদিন পর মদীনায় পৌছেন এবং সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে যান। তিনি মাথার পাগড়িতে একটি তীর বিদ্ধ করে রেখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) মসজিদেই ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখে তিনি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি উঠে দাঁড়ান এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর পাগড়ি হতে তীর টেনে বের করেন এবং তা টুকরো টুকরো করে দূরে ছুঁড়ে দেন।

"তুমি এক মুসলমানকে হত্যা করেছ"—হযরত উমর (রা.) রাগতস্বরে বলেন—"এবং তার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বানিয়েছ। তুমি প্রস্তর বর্ষণে হত্যার যোগ্য।"

হযরত খালিদ (রা.) নিয়মানুবর্তীতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর মর্যাদা ও পদাধিকার সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ফলে নিশ্চুপ থাকেন। হযরত উমর (রা.)-এর কোন কথার প্রতিবাদ করেন না। হযরত উমর (রা.)-এর রাগ পড়ে গেলে তিনি নীরবে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সোজা খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন। হযরত আবু বকর (রা.)ই তাকে কারণ দর্শানোর জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মতি পেয়ে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনপূর্বক মালিক বিন নাবীরার সমস্ত ঘটনা ও অপরাধের বিবরণ দেন। তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেন যে, মালিক বিন নাবীরা মুসলমান ছিল না; বরং উল্টো মুসলমানদের প্রাণের শত্রু ছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে তিরস্কার করেন এবং তাকে সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যতে এমন কোন আচরণ যেন না করেন, যা অন্যান্য সেনাপতির মাঝে ভুলের প্রচলন ঘটায়। ইমাম তবারী এবং হাইকাল প্রমুখের বর্ণনা মুতাবিক হযরত আবু বকর (রা.) পরিশেষে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, বিজিত গোত্রের কোন নারীকে বিবাহ করা এবং ইদ্দতকাল পূর্ণ না করা আরবের প্রচলিত রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এ নারী পরিশেষে বাদীই হত। তাই

মনিবের এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে তাকে বাদীও বানাতে পারে, আবার চাইলে বিবাহ করে স্ত্রী বানিয়ে রাখতে পারে।

হযরত আবু বকর (রা.) সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে আরো বলেন, বর্তমানে মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে বিপদ কবলিত। গোত্রের পর গোত্র বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উঁচু করছে। এর বিপরীতে আমাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই অপ্রতুল। এমতাবস্থায় কোন সেনাপতি শত্রু পক্ষের কোন নেতাকে ভুলক্রমে হত্যা করে ফেললেও তা কোন মারাত্মক অপরাধ নয়।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, ইসলামের এক ঘোরতর শত্রু মুসাইলামা বিন হানীফা নবুওয়াতের দাবী করে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তার অধীনে কম-বেশী ৪০ হাজার সৈন্য আছে। ইকরামা বিন আবু জাহল ইতোমধ্যে তার কাছে পরাজিত হয়েছে। এখন সবার দৃষ্টি খালিদের দিকে। মুসাইলামাকে পরাস্ত না করতে পারলে ইসলাম মদীনার মাঝেই কার্যত বন্দী হয়ে পড়বে। এ সফলতার জন্য হযরত খালিদের বিকল্প নেই।

হযরত উমর (রা.) চুপ থাকেন। তিনিও বিপদের গুরুত্ব যথাযথ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ দেন, এখনি বাতাহে রওয়ানা হয়ে যাও এবং সেখান থেকে সসৈন্যে মার্চ করে গিয়ে ইয়ামামায় আক্রমণ করে উত্থিত ফেৎনার মূলোৎপাটন কর।

হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বাতাহে উড়াল দেন। তিনি বাতাসের বেগে এসে বাতাহে পৌছান এবং পরবর্তী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

॥ চৌদ্দ ॥

৬৩২ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় সপ্তাহে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) মাত্র ১৩ হাজার সৈন্য নিয়ে ৪০ হাজারেরও অধিক মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইতিহাসে এটাই ইসলামের সর্বপ্রথম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচিত। এ যুদ্ধের শেষাংশ 'হাদীকাতুর রহমান' নামক এক বিস্তীর্ণ বাগিচায় অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উভয় পক্ষের এত প্রাণহানি ঘটে যে, মানুষ ঐ বাগিচাকে 'হাদীকাতুর রহমান'-এর পরিবর্তে 'হাদীকাতুল মওত' (মৃত্যুদানব) নামে স্মরণ করে। আজও ঐ স্থানটি 'হাদীকাতুল মওত' নামে পরিচিত।

মুসাইলামা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, সে নবুওয়াতের দাবী করেছিল। তার ভক্ত ও অনুসারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, তার সৈন্যরা মুসলিম

বাহিনীর জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এ সময়ে মুসলমানরা এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয় কিন্তু অপরদিকে মুসাইলামার শক্তিও বর্ধিত হতে থাকে। এটা যেমন মদীনার জন্য আশংকাজনক ছিল তেমনি ইসলামের জন্যও ছিল উদ্বেগজনক। মদীনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের হেড কোয়ার্টার।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে হযরত খালিদ (রা.) বাতাহে এসে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তার জানা ছিল যে, পুরাতন দোস্ত সেনাপতি ইকরামা (রা.) অত্র এলাকার আশে-পাশে কোথাও সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছেন। ফলে কঠিন মুহূর্তে তিনি এসে খালিদ বাহিনীকে সাহায্য করবেন।

হযরত ইকরামা বিন জাহল (রা.) ঐ ১১ সেনাপতির একজন, খলীফা যাদেরকে বিভিন্ন এলাকায় মুরতাদ এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। মুসাইলামার গোত্রের ন্যায় এত শক্তিশলী অন্য কোন গোত্র ছিল না। তাই প্রথমে এ এলাকায় হযরত ইকরামা (রা.)-কে পাঠানো হয় এবং তার পশ্চাতে হযরত শারযীল নামে আরেক সেনাপতিকেও প্রেরণ করা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) সেনাপতি শারযীলকে হযরত ইকরামা (রা.)-কে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে পাঠান।

হযরত ইকরামা (রা.) ইয়ামামায় চলছেন। এটা আড়াই মাস পূর্বের ঘটনা। তখন হযরত খালিদ (রা.) অপর ভণ্ড নবী তুলাইহার সাথে শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত। হযরত খালিদ (রা.) তুলাইহাকে তুলোধুনা করে পরাস্ত করেন। এ সংবাদ হযরত ইকরামা (রা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি আবেগতাড়িত হন। তখনও পর্যন্ত কোন গোত্রের সাথে তার সংঘর্ষ হয় না। এর কিছুদিন পরে ইকরামা (রা.) আবার জানতে পারেন যে, হযরত খালিদ (রা.) সালমার শক্তিশালী বাহিনীকে পরাজিত করেছেন।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, হযরত ইকরামা (রা.)-এর উপর এক ধরনের মানবিক দুর্বলতা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি সাথের অন্যান্য সেনাপতিকে বলেন, হযরত খালিদ যেখানে একের পর এক রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করে চলেছে সেখানে তিনি এখনও কোন যুদ্ধের মুখোমুখী হননি। হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত ইকরামা (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হতেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সাথী, এক মানের যোদ্ধা এবং রণাঙ্গনে উভয়ে দক্ষ নেতৃত্বদানে পারঙ্গম ছিলেন।

"আমরা এমন একটি বিজয় অর্জন করতে পারি না, যার সামনে খালিদের সকল বিজয় ম্লান হয়ে যায়?" হযরত ইকরামা (রা.) অধীনস্ত সেনাপতিদের লক্ষ্য করে বলেন—"আমি জানতে পেরেছি, শারযীল আমাদের সাহায্যে আসছেন।

জানি না তিনি কবে নাগাদ এসে পৌঁছবেন। বেশীদিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি মুসাইলামার উপর আক্রমণ করতে চাই।"

মুসাইলামা অর্বাচীন কিংবা নির্বোধ ছিল না। তার ভাল করেই জানা ছিল যে, মুসলমানরা তার নবুওয়াত কোনভাবেই বরদাশত করবে না। যে কোনদিন মুসলিম বাহিনী এসে তার টুটি চেপে ধরতে পারে। সে নিজ এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে রেখেছিল। চৌকস এবং গোয়েন্দা টিমও প্রস্তুত রাখে। হযরত ইকরামা (রা.) সার্বিক দিক বিবেচনা না করেই অগ্রসর হন এবং ইয়ামামার নিকটে এসে পৌছান। আবেগ উদ্বেলিত হওয়ায় শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সতর্ক হতে পারেন না। তিনি শত্রুদের না দেখলেও অপর পক্ষের গোয়েন্দারা ঠিকই তাঁর বাহিনীকে দেখে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসাইলামাকে অবহিত করে।

উঁচু-নীচু টিলা ও বালিয়াড়ি এক স্থানে মুসাইলামার কতক সৈন্যের উপর হযরত ইকরামা (রা.)-এর চোখ পড়ে। হযরত ইকরামা (রা.) তাদের উপর হামলা চালান। কিন্তু এটা মুসাইলামার একটি পাতা ফাঁদ বৈ ছিল না। মুসাইলামা অত্র অঞ্চলের ডানে বামে অগ্রে-পশ্চাতে বিপুল সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিল। গুপ্ত এ বাহিনী চতুর্দিক থেকে ইকরামা বাহিনীর উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত ইকরামা (রা.) এই ধারণাতীত পরিস্থিতি সামলে উঠতে ব্যর্থ হন। মুসাইলামার বাহিনী তাদেরকে সামলে উঠতে সুযোগ দেয় না। হযরত ইকরামার (রা.) সাথে প্রখ্যাত এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল। কিন্তু রণাঙ্গন ছিল শত্রুর নিয়ন্ত্রণে। তারা মুসলমানদের কোন চাল সফল হতে দেয় না। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে হযরত ইকরামা (রা.)-কে পিছে হটে আসতে হয়।

হযরত ইকরামা (রা.)-এর পক্ষে এই পরাজয়ের খবর গোপন করা সম্ভব ছিল না। গোপন করলে সৈন্যদের কেউ মদীনায় খবর পৌঁছে দিত। হযরত ইকরামা (রা.) পূর্ণ বিবরণ লিখে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বরাবর পাঠিয়ে দেন। পত্র পাঠে তিনি ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হন। তিনি ইতিপূর্বে স্পষ্টভাষায় হযরত ইকরামা (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেনাপতি শারযীলের পৌছার অপেক্ষা করেন এবং একাকী মুসাইলামার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হন। কিন্তু হযরত ইকরামা (রা.) ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। তিনি ত্বরিৎ আবেগের শিকার হন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-কে যে লিখিত জবাব দেন তাতে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ এভাবে ছিল যে, তিনি হযরত ইকরামা (রা.)-কে ইবনে আবু জাহলের (বাপের বেটা-এর) পরিবর্তে ইবনে উম্মে ইকরামা (মায়ের বেটা) লেখেন। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হলে আরবে তাকে পিতার

প্রতি সম্বন্ধ না করে মাতার প্রতি সম্বন্ধ করা হত। এর দ্বারা এটা বুঝানো হত যে, তোমার জন্মের বিষয়টি বিতর্কিত অথবা তুমি স্বীয় পিতার সন্তান নও। খলীফার পত্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ "

"ইবনে উম্মে ইকরামা! আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। তুমি মদীনায় আস—এটাও চাই না। কারণ, তুমি এলে এখানকার জনতার মাঝে নিরাশা আর হতাশা ছড়িয়ে পড়বে। মদীনার ধারে-কাছে ভিড়বে না। তুমি ইয়ামামা এলাকা ছেড়ে হুজায়ফার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। সম্মিলিতভাবে আম্মানবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। এখানে যুদ্ধ শেষ হলে আরফাযার সাহায্যার্থে মাহরা চলে যাবে। তারপর ওখান থেকে ইয়ামান গিয়ে মুহাযির বিন আবী উমাইয়্যার সাথে গিয়ে মিলিত হবে। যতদিন তুমি সফল সেনাপতির পরিচয় দিতে সক্ষম না হবে ততদিন আমাকে তোমার মুখ দেখাবে না। আমি তোমার সাথে কথা পর্যন্ত বলব না।"

খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) অপর সেনাপতি হযরত শারযীল (রা.)-এর বরাবর নির্দেশ পাঠান যে, যেখানে বর্তমানে আছ সেখানেই অবস্থান করে হযরত খালিদ (রা.)-এর অপেক্ষা কর। হযরত খালিদ (রা.) এলে নিজের সৈন্য তাঁর হাওলা করে দিয়ে নিজেও তাঁর অধীন হয়ে যাবে।

হযরত খালিদ (রা.)-কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, হযরত শারযীলের (রা.) সৈন্য তিনি পেয়ে যাবেন। এতে তিনি এই চিন্তার সময়ে বেজায় খুশী হন যে, এবার তিনি অতি সহজে মুসাইলামার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। তার আশা ছিল হযরত শারযীলের সৈন্যরা পূর্ণ তেজোদীপ্ত হবে। কিন্তু এ সৈন্য যখন হযরত খালিদ (রা.) লাভ করেন তখন তারা তেজোদ্যম ছিল না। অধিকাংশই হতোদ্যম এবং কতক ছিল রক্তাক্ত-আহত।

"কি হয়েছে শারযীল?" হযরত খালিদ (রা.) ঘটনার ব্যাখ্যা চান।

"একরাশ লজ্জা ছাড়া কোন জবাব আমার কাছে নেই"—শারযীল আহত স্বরে বলে—"আমি খলীফার নির্দেশ অমান্য করেছি। আমার প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল, হযরত ইকরামাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু আমার পৌঁছার পূর্বেই ইকরামা মুসাইলামার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পিছু হটে আসে। এটা একটি আত্মপ্ররোচনা ছিল, যা আমাকেও কাবু করে যে...।"

"একটি বিজয় তোমার খাতায় লেখা হয়ে যাক"—অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী হযরত খালিদ (রা.) বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হযরত শারযীলের জবাব পূরণ করতে গিয়ে বলেন—"বিচ্ছিন্ন পাথরের কোন শক্তি নেই শারযীল! কিন্তু এই পাথরযোগে যখন কোন প্লাটফর্ম তৈরী হয় তখন সেটা এত শক্তিধর হয়ে ওঠে

যে, যেই তার সাথে একবার মাথা ঠুকে, সে দ্বিতীয়বার মাথা ঠুকার জন্য আর জীবিত থাকে না। ব্যক্তি স্বার্থ এবং আত্মঅহমিকার পরিণাম দেখেছ তো? ইকরামার মত অভিজ্ঞ সেনাপতিও চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করছি যে, তোমার নির্বুদ্ধিতার খবর খলীফাকে জানতে দিব না।"

হযরত শারযীল বিন হাসানা (রা.) হযরত ইকরামা (রা.)-এর মত ভুলের শিকার হয়েছিলেন। তিনিও হযরত খালিদ (রা.)-এর বাজি জেতার উদ্দেশ্যে পথিমধ্যেই মুসাইলামার সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং হযরত ইকরামা (রা.)-এর মত পিছু হটে আসতে বাধ্য হন।

জাকজমকপূর্ণ দরবার। দরবারে উপচে পড়া ভীড়। মুসাইলামা মধ্যমণি। দরবারের প্রধান আকর্ষণ। তাকে ঘিরে দরবার দারুণ জমে উঠেছে। সুকৌশলে খর্বকায় এবং কুৎসিত এই লোকটি ইতোমধ্যে পুরোপুরি নবী হয়ে গিয়েছিল। তার গোত্র বনূ হানীফা প্রথম থেকেই তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করে। অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বড় আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে তার হাতে বাইয়াত ও তাকে এক পলক দেখতে ভীষণ উদগ্রীব থাকত। মানুষ তার শক্তি এবং অলৌকিক গুণ দেখেছিল। এখন তার অনুসারীরা আরো দু'টি জলজ্যান্ত মোজেজা দেখে নেয়। তারা মুসলমানদের দুই প্রখ্যাত সেনাপতিকে স্বল্প সময়ে অনায়াসে রণাঙ্গন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে মুসলমানরা রেশমের চেয়েও মোলায়েম ছিল।

কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তারা ইস্পাতের চেয়েও শক্ত এবং বিদ্যুৎগোলকে পরিণত হত। সমর দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানরা রীতিমত ভয়ঙ্কর দানবের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। হযরত ইকরামা (রা.)-এবং হযর শারযীল (রা.) নিজেদের ভুল এবং বিচক্ষণতার স্বল্পতার দরুণ পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু বনূ হানীফা এটাকে তাদের ভণ্ড নবীর মোজেজা এবং অলৌকিকতার খাতায় লিপিবদ্ধ করেছিল। তারা গর্বের সাথে বলত, মুসাইলামা ছাড়া মুসলমানদের পরাজিত করার মত আর কে আছে?

"নাহারুর রিযাল!" মুসাইলামা নিকটে বসা তার ডানহাত হিসেবে পরিচিত নাহারুর রিযালকে সম্বোধন করে বলে—"এখন আমাদের মদীনামুখী হওয়ার প্রস্তুতি নেয়া দরকার। মুসলমানদের মধ্যে এখন আগের সেই শৌর্য-বীর্য নেই।"

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাহারুর রিযাল রাসূল (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে পবিত্র কুরআন পড়া শিখেন এবং শরীয়তের উপর গভীর বুৎপত্তি অর্জন করেন। রাসূল (সা.) তাকে মুবাল্লিগ করে মুসাইলামার এলাকায় পাঠান কিন্তু তিনি

মুসাইলামার যাদুর কাছে পরাস্ত হয়ে পড়েন। ফলে নিজেও তার ভক্ত হয়ে মুসাইলামার নবুওয়াতের ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করে তাদেরকেও মুসাইলামার অনুসারীর কাতারে এনে দাঁড় করায় যারা একদা খাঁটি ইসলাম কবুল করেছিল। মুসাইলামা তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রধান উপদেষ্টা বানায়। এটা ছিল শরাব এবং নারী-রূপের যাদুর কারসাজী। মুসাইলামা নিজেও অত্যন্ত খর্বকায় এবং জঘন্য চেহারার হওয়া সত্ত্বেও নারী মহলে সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। ঐতিহাসিকের মন্তব্য, তার চেহারায় মহিলারা এক ধরনের বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত। সাযাহ্ এর মত নারী কিলোপেট্রার ন্যায় সমরশক্তি নিয়ে মুসাইলামাকে পরাস্ত করতে এসে মাত্র এক সাক্ষাতেই তার স্ত্রী হয়ে যায়।

এটা মুসাইলামার দৈহিক শক্তি এবং যাদুর নৈপুণ্য ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে এক বিরাট সমরশক্তি অর্জন করেছিল। হযরত ইকরামা (রা.) এবং হযরত শারযীল (রা.) এর মত সেনাধ্যক্ষকে পিছু হটিয়ে তার এবং বাহিনীর সাহস বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে তারা এখন মদীনা হেডকোয়ার্টারের প্রতি দৃষ্টি তোলার সাহস করে। সে দরবারে উপবিষ্ট প্রধান উপদেষ্টাকে মদীনা আক্রমণের সার্বিক প্রস্তুতির কথা বলে। নাহারুর রিযাল কোন মন্তব্য করার পূর্বেই মুসাইলামাকে জানানো হয় যে, এক গোয়েন্দা আপনার শরণাপন্ন। মুসাইলামা তৎক্ষণাৎ তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বলে।

"মুসলমান বাহিনী এগিয়ে আসছে"—গোয়েন্দা এসেই খবর দেয়। সংখ্যায় তারা ১০ থেকে ১৫ হাজারের মধ্যে।

"তোমরা যখন তাদের দেখেছ তখন তারা কোথায় ছিল?" মুসাইলামা জিজ্ঞাসা করে।

"হানীফা উপত্যকার খানিকটা দূরে"—গোয়েন্দা জবাবে বলে—"এতক্ষণ আরো এগিয়ে এসে থাকবে।"

"হতভাগাদেরকে মৃত্যু হানীফা উপত্যকায় টেনে এনেছে"—মুসাইলামা অহংকারের সাথে বলে—"তাদের জানা নেই যে, মাত্র ১০/১৫ হাজার সৈন্য আমার ৪০ হাজার সিংহের হাতে মারাত্মকভাবে জখম ও আহত হবে।"

সে উঠে দাঁড়ায়। দরবারের অন্য সদস্যরাও সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ায়। সে নাহারুর রিযালকে সাথে নিয়ে দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়। সে ঘোড়া প্রস্তুত করে নাহারুর রিযালকে সাথে নেয় এবং এক সময় ঘোড়া উভয়কে উড়িয়ে ইয়ামামা থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। তাদের লক্ষ্য ছিল হানীফা উপত্যকা।

"এই উপত্যকা হতে তারা জীবন নিয়ে বের হতে পারবে না"—পথিমধ্যে

মুসাইলামা নাহারুর রিযালকে বলে—"আমার এই ফাঁদ সম্পর্কে তারা ঘুণাক্ষরেও জানে না।"

নাহারুর রিযাল অট্টহাসি দিয়ে উঠে এবং বলে—"আজ মুহাম্মাদের ইসলাম হানীফা উপত্যকায় চিরদিনের জন্য সমাধিস্থ হয়ে যাবে।"

তারা অর্ধেক পথ এগিয়ে গেলে ওদিক থেকে এক অশ্বারোহী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। অশ্বারোহী মুসাইলামাকে দেখে থেমে যায়।

"নবীজী!" অশ্বারোহী কম্পিত কণ্ঠে বলে—"মুসলমানরা মাযা'আ বিন মুরারাকে বন্দী করে ফেলেছে।"

"মাযা'আকে?" মুসাইলামা বিস্ময়ভরাকণ্ঠে বলে।

"মাযা'আকে মুসলমানরা..."—নাহারুর রিযাল ভয়ার্তস্বরে বিড়বিড়িয়ে বলে।

"মাযা'আর মত দুর্ধর্ষ এবং অভিজ্ঞ সেনাপতি আমাদের মধ্যে আর কেউ নেই"—মুসাইলামা বলে—"মাযা'আর বন্দী হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য শুভলক্ষণ নয়।

মাযা'আ মুসাইলামার বড় ঝানু এবং বীর সেনাপতি ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে তার অনেকটা মিল ছিল। ঐতিহাসিকদের অভিমত, হযরত খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সমর চাল চালার যোগ্যতা একমাত্র মাযা'আর মধ্যেই ছিল। মুসলমানদের হাতে মাযা'আর বন্দী হওয়ার ব্যাপারটি ছিল দৈবাৎ। এটা এভাবে ঘটে যে, মাযা'আর কোন এক নিকটবর্তী আত্মীয়কে বনী আমের এবং বনী তামীমের কিছু লোক মিলে হত্যা করেছিল। মাযা'আ তার এই আত্মীয়ের রক্তের প্রতিশোধ নিতে মুসাইলামার কাছে ৪০ জন সৈন্য চেয়ে দরখাস্ত করে। মুসাইলামা তার এ যোগ্য সেনাপতিকে নিরাশ করতে চায় না। ফলে সে অনুমতি প্রদান করে।

মাযা'আ দুশমনের এলাকায় যায় এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে আসছিল। তার জানা ছিল না যে, যে এলাকাকে সে নিরাপদ মনে করত তা এখন আর নিরাপদ নেই। সে সৈন্যদের শ্রান্তি দূর করতে এক স্থানে ছাউনী ফেলে। জিম্মাদারী পালন করে তারা ফিরছিল। ঘোড়ার জিন খুলে তারা শুয়ে পড়ে। ক্ষণিকের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় হারিয়ে যায়।

ঘটনাক্রমে হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী এ পথ দিয়েই আসছিল। প্রভাতে মূল বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী ঐ স্থানে এসে পৌছে যেখানে মাযা'আ সৈন্যদের নিয়ে গভীর নিদ্রায় শায়িত ছিল। মুজাহিদ বাহিনী তাদের জাগ্রত করে এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও ঘোড়া নিয়ে নেয়। নজরবন্দী করে তারা তাদেরকে হযরত

খালিদ (রা.)-এর কাছে নিয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) জানতেন না যে, মাযা'আ মুসাইলামার বিরাট মূল্যবান সেনাপতি। হযরত খালিদ (রা.) অন্যদের সাথে তাকেও সাধারণ সেপাই বলে ধারণা করেন। তারা প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট শিকার লাভ করেছিল।

ধৃত সৈন্যরা স্বীকার করে যে, তারা মুসাইলামার বাহিনীর সেপাই। কিন্তু মাযা'আর পরিচয় তারা প্রকাশ হতে দেয় না।

"তোমরা আমাদের মোকাবিলার উদ্দেশে এসেছিলে?" হযরত খালিদ (রা.) প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন।

"না"—একজন জবাবে বলে—"আমাদের জানাই ছিল না যে, মুসলিম সৈন্যরা আসছে। বনী আমের এবং বনী তামীম হতে আমাদের এক ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ নিতে আমরা গিয়েছিলাম।"

"ঠিক আছে তোমাদের কথা মেনে নিলাম"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আমি তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারি। তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও যে, তোমরা কাকে আল্লাহ্র রাসূল বলে বিশ্বাস কর এবং কার উপর ঈমান রাখ?"

"নিঃসন্দেহে মুসাইলামা আল্লাহ্র রাসূল"—ধৃত এক সৈন্য জবাব দেয়।

"খোদার কসম!" তোমরা আমাকে অপমান করলে ক্ষমা করতাম। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (সা.)-এর অবমাননা আমি কিভাবে বরদাশত করব!"

"আপনি আপনার রাসূল মানেন আমরা আমাদের নবীকে মানি"—মাযা'আ বলে—"বাস্তব ব্যাপারও এটা যে, মুসাইলামা রেসালাতের প্রশ্নে মুহাম্মাদের সমান অংশীদার।"

"আমাদের সকলের আকীদা-বিশ্বাস এটাই"—ধৃত সৈন্যরা এক যোগে বলে—আপনাদের মাঝে এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে, আমাদের মাঝে আরেক নবী এসেছেন।"

হযরত খালিদ (রা.) চোখের পলকে তলোয়ার বের করেন এবং এক কোপে এক সৈন্যের মস্তক উড়িয়ে দেন। অন্যদেরও এভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অন্যদের সাথে মাযাআকেও হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকারী তার গলা কাটতে তরবারী উপরে তোলে। আরেকটু পরেই তরবারীর আঘাতে মাযা'আর মস্তক আর দেহ দু'দিকে ছিটকে পড়বে।

"থামো!" সারিয়া বিন আমের নামে এক ধৃত সৈন্য চিৎকার করে শূন্যে তোলা তরবারী থামানোর পরামর্শ দিয়ে বলে—"কমপক্ষে এ লোকটিকে জীবিত রাখ। এ তোমাদের কাজে আসতে পারে।"

এ সময় উদঘাটিত হয় যে, মাযা'আ বনূ হানীফার একজন শীর্ষ নেতা। কিন্তু তারপরেও গোপন রাখা হয় যে, মাযা'আ শুধু গোত্রপতিই নয়; অন্যতম সোনপতিও বটে। হযরত খালিদ (রা.) চৌকস এবং দূরদর্শী ছিলেন। গোত্রের নেতারা মোটা অঙ্কের জামিন হত। তাকে যে কোন স্পর্শকাতর স্থানে ব্যবহার করে স্বার্থ হাসিল করা যেতে পারত। হযরত খালিদ (রা.) মাযা'আর পায়ে বেড়ী পরিয়ে তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে যান এবং স্ত্রী লায়লার হাতে তাকে সমর্পণ করেন। ধৃত অবশিষ্ট সৈন্যদের সকলকে হত্যা করা হয়।

মাযা'আর গ্রেপ্তার মুসাইলামার জন্য কোন তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু হানীফা উপত্যকা এমন ফাঁদ ছিল যা ঐ ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি মুসাইলামার সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০,০০০। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৩,০০০। মুসাইলামার বাহিনীতে অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহীর সংখ্যা ছিল অনেক। কতিপয় ঐতিহাসিক মুসাইলামা বাহিনীর সংখ্যা ৭০ হাজার লিখেছেন। মোটকথা, মুসাইলামার সৈন্যসংখ্যা ৪০ হাজারের উর্ধ্বে ছিল, কম নয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর এক বড় দুর্বলতা বলতে যা ছিল, তা হলো, তার সৈন্যসংখ্যা উদ্বেগজনকহারে কম ছিল। দ্বিতীয় দুর্বলতা হলো, হেডকোয়ার্টার থেকে তিনি যোজন যোজন মাইল দূরে ছিলেন। ফলে প্রয়োজনীয় রসদপত্র কিংবা রিজার্ভ ফৌজ আসার কোন উপায় তার ছিল না। তবে এ বিষয়টা তাকে আশ্বস্ত করে যে, অত্র এলাকায় খাবার পানি এবং পশু-প্রাণীর খোরাকের কমতি ছিল না। ফসল এবং ফল-মূল সমৃদ্ধ ছিল গোটা এলাকা।

ফসল সমৃদ্ধ ক্ষেত-খামার এবং ফল-মূল সমৃদ্ধ বাগ-বাগিচার চিন্তা মুসাইলামাকে কুরে কুরে খায়। সে এগুলোর হেফাজতের চিন্তায় ছিল বিভোর। সে নাহারুর রিযালকে বলে যে, এমন পদ্ধতিতে সে লড়তে চায় যাতে মুসলমানদের হাতে কোন বসতি, ক্ষেত-খামার এবং বাগ-বাগিচা নষ্ট না হয়। ইতিহাস বলে, মুসাইলামা কোন প্রকার আবেগ, সিদ্ধান্তহীনতা এবং উদ্বেগের শিকার ছিল না। সে এমনভাবে কথা বলত, যেন বিজয় সম্পর্কে সে পুরোপুরি নিশ্চিত। সে ভেবে-চিন্তে এবং হিসেব-নিকেশ করে কথা বলত। ৪০ হাজার সৈন্য ছিল তার উপরন্তু ভরসা। এদের প্রত্যেকেই ছিল মুসাইলামা নামের পাগল। মুসাইলামার নবুওয়াত রক্ষার্থে তারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) ফাঁদে পা দেয়ার মত সেনানায়ক ছিলেন না। মুতা যুদ্ধে ফাঁদে পড়ে তিনি সারা জীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইয়ামামা অঞ্চলের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তিনি অবস্থা যাচাই এবং সামনে

এলাকা পরখের উদ্দেশ্যে একটি টিম গঠন করেন। রাতে এ টিম যে রিপোর্ট দেয় তার আলোকে হযরত খালিদ (রা.) গতিপথ বদল করেন। তিনি হানীফা উপত্যকার প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হলে এখান থেকে বিপদের গন্ধ পান। ফলে তিনি এই উপত্যকা এড়িয়ে সামনে অগ্রসর হবার ইচ্ছা করেন। তিনি একটু দূর থেকে ঘুরে সামনে এগিয়ে যান।

মুসাইলামাও গোয়েন্দা জাল বিছিয়ে রেখেছিল। গোয়েন্দারা তাকে জানায় যে, মদীনা বাহিনী হানীফা উপত্যকা এড়িয়ে দূরবর্তী পথ ঘুরে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়েছে। মুসাইলামা এ খবর পেয়ে সৈন্যদেরকে দ্রুত আকরাবা ময়দানে স্থানান্তর করে। হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি এই ময়দানের উপর ছিল। কিন্তু মুসাইলামা বাহিনী পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যায়। হযরত খালিদ (রা.) সমতলভূমি থেকে উঁচু এক স্থানে এসে ছাউনী ফেলেন। এখান থেকে মুসাইলামা বাহিনীর ছাউনী স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে এবং তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজ ছিল।

মুসাইলামা এই ময়দানকে যুদ্ধের জন্য উত্তম ও উপযুক্ত মনে করে। কারণ, তার সৈন্যদের সকল রসদপত্র এবং মাল-আসবাব তাদের ছাউনীর পিছনে ছিল। দ্বিতীয়ত ক্ষেত-খামার এবং বাগ-বাগিচা তাদেরই পিছনে ছিল। ফলে এগুলো হেফাজত করা এখন তার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। সে মনে মনে এ অঙ্ক কষে রাখে যে, খালিদ বাহিনী এখন থেকে ইয়ামামা অভিমুখে রওয়ানা করতে চেষ্টা করলে পশ্চাৎ হতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে। হযরত খালিদ (রা.)ও কম সেয়ানা ছিলেন না। তিনিও অনুভব করেছিলেন যে, ওখান থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া আত্মহত্যার শামিল হবে।

মুসাইলামা পুরো বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করে। ডান বাহিনীর নেতৃত্ব নাহারুর রিযালের হাতে অর্পণ করে। বাম বাহিনীর সেনাপতি ছিল মুহকাম বিন তোফাইল। আর মধ্যবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব নিজ হাতেই রাখে। মুসাইলামা তার পুত্র শারযীলকে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আগুন ঝরানো ভাষণ দিতে বলে। শারযীল ঘোড়ায় আরোহণ করে এক এক করে তিনও বাহিনীর সামনে গিয়ে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলে :

বনূ হানীফার শার্দুলেরা! আজ সময় এসেছে ইজ্জত-আবরু রক্ষায় নিজেকে কুরবান করা। আল্লাহ্ তোমাদের গোত্রে নবুওয়াতের মত মহান বিষয় দান করেছেন। নিজেদের ঐতিহ্য-ইতহাস এবং নবুওয়াত বাঁচাতে আজ এমন দুর্ধর্ষ লড়াই করবে, যেন মুসলমানরা আর কখনো তোমাদের সামনে আসার সাহস না করে। মনে রেখ, তোমরা ময়দানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে তোমাদের স্ত্রী, বোন, কন্যা নির্ঘাত মুসলমানদের বাঁদীতে পরিণত হবে। তোমাদের এই প্রিয় ভূমিতেই তাদের

ইজ্জত লুণ্ঠন করা হবে। পারবে কি তোমরা সে দৃশ্য সহ্য করতে?"

মুসাইলামার সৈন্যদের শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। তারা মুসাইলামার নামে উচ্চকিত নারাধ্বনি দিতে থাকে। অবলা অশ্বগুলো বারবার পদাঘাত আর হ্রেষারব তুলে সৈন্যদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। হযরত খালিদ (রা.) মুসাইলামা বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রস্তুত ছিলেন। সংখ্যাধিক্যের বলে মুসাইলামারই আক্রমণের সূচনা করার কথা ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকরা লেখেন, মুসাইলামা যুদ্ধজ্ঞানও রাখত। সে হামলার সূচনা করে না। সে এ অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে যে, খালিদ বাহিনী আক্রমণ করুক আর সে প্রথমত আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালিয়ে যাবে। এভাবে খালিদ বাহিনী আক্রমণ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে পূর্ণশক্তি নিয়ে চতুর্দিক হতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কচুকাটা কাটবে।

তৎকালীন যুগের পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, হযরত খালিদ (রা.) মুসাইলামার চাল ধরতে পারেন না। তিনি অধীনস্ত সেনাপতিদের এক বৈঠক ডেকে বলেন যে, মুরতাদ বাহিনীর সাথে এভাবে লড়তে হবে যে, যেন তারা সৈন্য এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিতে না পারে এবং আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে বাধ্য হয়। হযরত খালিদ (রা.) ধারণা করেছিলেন, ১৩ হাজার সৈন্য দ্বারা ৪০ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করা কেবল এভাবেই সম্ভব যে, তাদেরকে কোন চাল চালার সুযোগ না দেয়া।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সৈন্যদের সাহস যোগানোরও প্রয়োজন ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সাহায্যার্থে খলীফা যে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক পবিত্র কুরআনের হাফেজ এবং সুমিষ্ট কারীও ছিলেন। সে সময়ে হাফেজ এবং কারীরাও তীর-তলোয়ারে সমান পারদর্শী হতেন। কেবল মসজিদে বসে থাকার মত লোক তারা ছিলেন না।

এতদ্ব্যতীত হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর ছিল যারা একাধিক ময়দানে কয়েকগুণ বেশী সৈন্যের মোকাবিলা করে শত্রুর মাথা থেকে বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে এনেছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীতে হযরত উমর (রা.)-এর ভাই যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) এবং উমর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)ও ছিলেন। হযরত আবু দাযানাও (রা.) ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে নিজ শরীর দ্বারা রাসূল (সা.) -কে ঢেকে রেখেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর লক্ষ্যে যত তীর আসত তা এই হযরত আবু দাযানা (রা.)-এর শরীরেই বিদ্ধ হত। খলীফা হযরত আবু বকরের পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)ও ছিলেন। উম্মে আম্মারা নামক এক জননী তার পুত্রের সাথে এসেছিলেন। এই হযরত উম্মে

আম্মারা (রা.) উহুদ যুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধও করেছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে হযরত ওয়াহশী (রা.) নামে এক সাহাবীও ছিলেন। তার বর্শার লক্ষ্য চুল বরাবর এদিক-ওদিক হত না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উহুদ যুদ্ধে এই ওয়াহশী (রা.)-এর নিক্ষিপ্ত বর্শায় হযরত হামযা (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনী সংখ্যার বিচারে কম থাকলেও জিহাদী জযবা, হিম্মত ও মনোবলের দিক দিয়ে ছিলেন তুঙ্গে। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও অগ্নিঝরা ভাষণের মাধ্যমে তাদের বীরত্বে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন। তিনি কারী ও হাফেজ সৈন্যদের বলেছিলেন, সৈন্যদের সামনে গিয়ে পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা মদীনা হতে এত দূরে কোন্ অভিপ্রায়ে লড়তে এসেছে? অভীষ্ট মঞ্জিল কোথায়?

কারী ও হাফেজগণ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে সৈন্যদের মাঝে বারবার ঐ সমস্ত আয়াত শুনাতে থাকেন, যাতে মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জিহাদের ফযিলত, শহীদের মর্তবা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতা রাতভর চলতে থাকে। আল্লাহ্ ছাড়া এই সুদূর বিদেশ বিভুইয়ে তাদের সাহায্য করার কেউ ছিল না। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুসলমানরা এভাবে সারারাত ইবাদাত-বন্দেগী এবং দু'আর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

॥ পনের ॥

৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের এক প্রভাতে সূর্য উঁকি দিলে হযরত খালিদ (রা.) মুসাইলামার বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। হযরত খালিদ (রা.) তিন ভাগে পুরো বাহিনী বিন্যস্ত করেছিলেন। মধ্য বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল তাঁর নিজের হাতে। ডানে বামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত আবু হুজাইফা (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)। মুসলমানরা যে ক্ষিপ্তগতি ও বজ্রের মত হামলা করছিল তা দেখে হযরত খালিদ (রা.) আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, এভাবে যুদ্ধ চালাতে পারলে তারা এক সময় মুরতাদ বাহিনীকে অবশ্যই নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম হবে। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও সাধারণ সৈন্যদের মত লড়ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মুসাইলামার বাহিনী ঠিক আগের স্থানেই পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অসংখ্য মুজাহিদ আক্রমণের প্রথম ভাগেই শহীদ হয়ে যান।

দিন যতই গড়িয়ে যেতে থাকে যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর্তচিৎকার, গোঙানী, আহাজারী আর ক্রন্দনে আসমান-জমিন প্রকম্পিত হচ্ছিল। মুসাইলামার বাহিনী স্থান পরিবর্তন করে করে লড়ছিল। তাদের লক্ষ্য

ছিল মুসলমানদেরকে বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে ফেলা। পক্ষান্তরে মুসলমানদের লক্ষ্য ছিল মুরতাদদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া এবং ইয়ামামা অধিকার করা। উভয় বাহিনী নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকে। আংশিক সফলতা বিবেচনায় আনলে তা ছিল মুরতাদ বাহিনীর দখলে।

মুসাইলামা অত্যন্ত ধূর্ত এবং সতর্ক সমর পরিচালক ছিল। সে গোপনে আঁচ করতে থাকে মুসলিম বাহিনী কখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে অর্ধেক দিন পার হয়ে যায়। ভূমি লালের পর লাল হতে থাকে। আহত সৈন্যরা পলায়নপর ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়। মুসলমানরা শুরু থেকেই প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

মুসাইলামার সতর্ক চোখে মুজাহিদ বাহিনীর এ অবসন্নতা ধরা পড়ে। সহসা সে নতুন চাল চালে। এক তেজোদ্দীপ্ত বাহিনীকে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলার নির্দেশ দেয়। তার এ বাহিনী সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আসে এবং চোখের পলকে আক্রমণ করে সামনের বাহিনী লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মুসাইলামা এই বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেছিল যে, নবুওয়াতের খাতিরে যেই প্রাণ দিবে সে সোজা জান্নাতে যাবে।

হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত অনুধাবন করেন যে, তার সৈন্যদের উপর তীব্র আঘাত হচ্ছে। তিনি পরিস্থিতি উত্তরণের পলিসি নিয়ে ভাবছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে সামনের বাহিনী দ্রুত পিছে হটে আসে। তাদের দেখাদেখি পিছনের বাহিনী আরো দ্রুত পিছনে হটে আসে। সেনাপতিগণ চিৎকার করে করে সৈন্যদের ডাকেন, থামাতে চেষ্টা করেন, তাকবীর ধ্বনি দেন কিন্তু মুরতাদদের নতুন এ বাহিনীর আক্রমণ এত ক্ষিপ্ত ও মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে তা বরদাশত করা সম্ভব হয় না। তাদের মাঝে অনিয়ম ও হুলস্থূল পড়ে যায়। পরস্পরের দেখাদেখি তারা ময়দান হতে এমন উর্ধ্বশ্বাসে পালায় যে, ছাউনীতেও গিয়ে থামে না, বরং অনেক দূর-দূরান্তে চলে যায়।

মুসাইলামার বাহিনী ক্ষুধার্ত নেকরের ন্যায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। উহুদ রণাঙ্গনেও মুসলমানরা নিজেদের বিপক্ষে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে তারা পরাজিতও হয়েছিল। এটা ছিল তাদের দ্বিতীয় পিছু টান, যা হুলস্থুলের রূপ ধারণ করেছিল।

মুসাইলামার সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করে ছাউনীতে পৌছে লুটপাট শুরু করে। সেখানে তাদের বাঁধা দেবার মত কেউ ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) এবং তার অধীনস্ত অন্যান্য সেনাপতিরা পলায়নপর সৈন্যদের থামানোর জন্য দৌড়ে চিৎকার

করে ফিরছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা ছাউনী ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে থামে। মুসাইলামা বাহিনীর কতক সৈন্য হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুর সন্ধান পায়। তারা সেখানে ঢুকে পড়ে। অনেক বিত্ত-বৈভব তারা এখান থেকে পাবার আশা করছিল কিন্তু এখানে ঢুকে তারা এমন দুই মূল্যবান মানুষের দেখা পায় যা ছিল তাদের ধারণারও অতীত। একজন হচ্ছে তাদের সর্দার এবং সিপাহসালার মাযা'আ। পায়ে লোহার বেড়ি বাঁধা অবস্থায় সে সেখানে পড়ে ছিল। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে হযরত খালিদ (রা.)-এর নতুন স্ত্রী লায়লা উরফে উম্মে তামীম। যার রূপ-সৌন্দর্যের বহু কাহিনী তারা শুনেছিল কিন্তু দেখার সুযোগ হয় নাই। মাযা'আকে তারা দেখেই চিনে ফেলে। কিন্তু লায়লার সম্পর্কে তাদেরকে খবর দেয় মাযা'আ। লায়লার পরিচয় পেয়েই একই সাথে দু'তিনজন তার দিকে ছুটে আসে। তারা লায়লাকে হত্যা অথবা সাথে করে নিয়ে যেতে চায়।

"থাম!" বন্দী নেতা মাযা'আ তাদের নির্দেশ দেয়। "শত্রু সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন কর। নারীদের পিছনে পড়ার সময় এখনও আসেনি। আমি এখন তার কয়েদী নই; বরং সে আমার কয়েদী।"

তাদের সর্দারের নির্দেশ এত কঠোর ছিল যে, তারা দ্রুত তাঁবু থেকে বের হয়ে যায়। তাদের এতটুকু হুঁশ হয় না যে, নেতার পায়ের বেড়ি খুলে দিয়ে যাবে।

"এ লোকদের হাত থেকে তুমি আমাকে কেন বাঁচালে?" লায়লা মুযাআর কাছে জানতে চায়। "তুমি আমাকে নিজের মালে গনিমত মনে করছ? তোমার নিয়ম এমনটি হয়ে থাকলে কেন ভাবছ না যে, আমি তোমাকে কতল করতে পারি?"

"বন্দী থাকাকালে আপনি আমার সাথে যে সদাচরণ করেছেন তার প্রতিদানে আমি আমার জীবনও দিতে পারি।" মুযাআ বলে—"খোদার কসম! আমার পায়ের বেড়ি খুলে যদি আপনার পায়ে পড়ে তবুও আমি আপনাকে মালে গনিমত বা বাদী জ্ঞান করব না। আপনি আমাকে বন্দী করে নয় মেহমান বানিয়ে রেখেছেন।"

"আমি তোমার সাথে তেমন ভাল আচরণ করতে পারিনি।" লায়লা বলে। আমার বাড়িতে হলে তোমাকে আরো সুখে রাখতে পারতাম। এভাবে যে কোন বন্দীর সাথে সদাচরণ করা ইসলামের বিধান। প্রাণের শত্রুও যদি কারো ঘরে বন্দী হয়ে আসে তবে সে তাকে একজন সম্মানিত মেহমানই জ্ঞান করে।"

"লায়লা!" মাযা'আ বলে—"আপনি এখনও অনুভব করছেন না যে, আপনার স্বামী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে এবং আপনি এখন আমার গোত্রের কব্জায়?"

"বিজয়-পরাজয়ের ফায়সালা আল্লাহ্ করবেন।" লায়লা জবাবে বলে—

"আমার স্বামী এর চেয়েও মারাত্মক আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত।"

"নির্বোধ নারী!" মাযা'আ বিজয়সুলভ মুচকি হেসে বলে—"এখনও আপনি বুঝছেন না যে, খোদা মুসাইলামার সাথে আছেন, আর তিনি তাঁর সত্য নবী! মুহাম্মাদের রেসালাত সত্য হলে..."

"মাযা'আ!" লায়লা গর্জে উঠে এবং তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে—"তুমি মুহাম্মাদের রেসালাতের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে তোমার হত্যা আমার উপর ফরজ হয়ে যাবে। আমি জানি, আমাদের সৈন্যরা এই তাঁবুতে একা ফেলে পালিয়ে গেছে আর আমার ধর্মের শত্রুরা এখানে লুটতরাজও চালাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমি এতটুকু ভীত নই। আমার অন্তরে কোন ভয় নেই। আর ভয় না থাকার কারণ হলো, মুহাম্মাদ (সা.)-এর পবিত্র আত্মার প্রতি আমার প্রগাঢ় আস্থা রয়েছে।"

মাযা'আ নিশ্চুপ ছিল। সে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত অপলক নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকে। বাইরে বিজয়ী বাহিনীর বিজয়সুলভ হৈ-হুল্লোড় চলছিল। তারা মুসলমানদের তাঁবু চিরে-ফেড়ে টুকরো করে করে ইতস্তত নিক্ষেপ করছিল। মাযাআ এবং লায়লার এ ধারণাই ছিল যে, এখনই মুসাইলামার পক্ষের লোকজন আসবে এবং তাদের দু'জনকে নিয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ হৈ-হুল্লোড় থেমে যায় এবং লুটেরা লুটপাট ছেড়ে দৌড়ে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। কারণ হলো, মুসাইলামার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে, যে যেখানে আছ এ মুহূর্তে আকরাবা ময়দানে ফিরে এস। কেনন্না মুসাইলামা দেখতে পায় যে, মুসলমানরা দ্রুত সমবেত হয়ে বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত হচ্ছে। সে এ মুহূর্তে কোন প্রকার ঝুঁকি নিতে চায় না। সে মুসলমানদের বীরত্ব এবং উদ্দীপনায় দারুণ প্রভাবিত ছিল।

মাযা'আ এবং লায়লা তাঁবুতে আবার একাকী রয়ে যায়। মাযা'আর চেহারায় যে ঝলক মাঝখানে এসেছিল তা আবার হারিয়ে যায়।

॥ ষোল ॥

হযরত খালিদ (রা.) এত জলদি পরাজয় স্বীকার করার মত লোক ছিলেন না। নষ্ট করার মত একটি মুহূর্তও তাঁর ছিল না। তিনি সেনাপতি এবং কমান্ডারদের সমবেত করে পিছপা হওয়ার উপর চরম শরম দেন। ইত্যবসরে এক অশ্বারোহী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে সেনাপতিদের আলোচনা স্থলে এসে থামে। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর ভাই হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) ছিলেন।

"খোদার কসম ইবনে ওলীদ!" হযরত যায়েদ (রা.) ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে—"আমি মুসাইলামার ডান হাত কেটে দিয়েছি।... আমি নাহারুর রিযালকে নিজ হাতে হত্যা করেছি। আমাদের

বিজয়ের উপর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক জ্বলন্ত ইশারা বৈ নয়।"

নাহারুর রিযালের মৃত্যু মুসাইলামার জন্য সাধারণ চোট ছিল না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সে মুসাইলামার প্রধান উপদেষ্টা, একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং সঠিক অর্থে তার ডানহস্ত ছিল। এ তাজা খবরে হযরত খালিদ এবং তার অন্যান্য সেনাপতির চেহারায় নতুন আলোর ঝলক দেখা দেয়। তাদের রক্ত নয়া প্রেরণায় টগবগ করে ওঠে।

"তোমরা জান, এটা কোন্ পাপের সাজা?" হযরত খালিদ (রা.) রাগতস্বরে বলেন—"আমি সংবাদ পেয়েছি, আমাদের সৈন্যদের অন্তরে অহংকার চলে এসেছিল। লড়াইয়ের পূর্বেই আমাদের মুজাহিদ সাথীরা বলেছিল, বাহাদুরী পরীক্ষায় আনসার আর বেদুঈনরা মিলে তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। আনসাররা দাবী করে যে, মুসলমানদের মধ্যে তাদের মত বাহাদুর কেউ নয়। বেদুঈনরাও কম যায় না। তারা বলে, মক্কা এবং মদীনার লোক এখনও জানেই না যে, যুদ্ধ কাকে বলে।...তোমাদের জানা আছে, আমাদের মধ্যে মক্কার মুহাজিররাও আছেন, মদীনার আনসারও আছেন এবং আশে-পাশের অঞ্চল হতে আগত বিপুল সংখ্যক বেদুঈনরাও আছে। তারা পরস্পর একে অপরের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল।"

"এর প্রতিষেধক আমাদের কাছে নেই"—এক সেনাপতি বলে।

"আমার কাছে এর প্রতিষেধক আছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আমরা তিন ধরনের সৈন্যদের সবাইকে এক সাথে রেখেছি। বেশী সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তোমরা এখনই যাও এবং তিন শ্রেণীর লোকদের পৃথক করে ফেল।"

মুহূর্তে হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ পালিত হয়। মুসলমানরা এখন তিন কাতারে বিভক্ত। (১) মুহাজির (২) আনসার (৩) বেদুঈন। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

"আল্লাহ্‌র সৈনিকগণ!" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন—"আমরা রণাঙ্গনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে শত্রুদের জন্য হাসি আর বিদ্রূপের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি। তোমাদের মধ্যে কে বীরত্বের সাথে লড়েছে আর কে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে—কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে?...মুহাজির? আনসার? বেদুঈন? এখন আমি তোমাদের এ জন্য পৃথক করেছি যে, এখনই আমরা শত্রুর উপর জওয়াবী হামলা চালাব। এখন দেখব, কে কত বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে। বীরত্ব আর কাপুরুষতা সমালোচনার দ্বারা নির্ণীত হয় না; রণাঙ্গনে কিছু করে দেখাও। কিন্তু সাবধান! ঐক্য যেন হাতছাড়া না হয়। রাসূল (সা.) তোমাদেরকে যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের শিক্ষা দিয়েছেন তা ভুলে যেও না। তোমাদের কোন বাহিনী শত্রুর

আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে থাকলে আরেক বাহিনী তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাও। আমাদেরকে অবশ্যই প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, মুসাইলামা ভণ্ড, তার নবুওয়াতের দাবী মিথ্যা বৈ নয়। আমরা পরাজিত হলে তার মিথ্যা নবুওয়াত আমাদের উপর চেপে বসবে। আমরা মুসাইলামার গোলাম এবং আমাদের স্ত্রীরা মুরতাদদের বাঁদীতে পরিণত হবে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ ঐ তীরের স্থান দখল করে যা টার্গেটে গিয়ে বিদ্ধ হয়। সৈন্যদের মাঝে নয়া প্রেরণা এবং নব শক্তি সৃষ্টি হয়। তাদের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। রক্ত পিপাসু হায়েনার ন্যায় তাদের চোখ প্রতিশোধ গ্রহণের জ্বলজ্বল করে ওঠে। শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়তে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই বিজলির গতিতে ছুটে চলে মুজাহিদ বাহিনী মুরতাদ বাহিনীর মুণ্ডুপাত করতে।

ইতোমধ্যে মুসাইলামাও স্বীয় বাহিনীকে পুনরায় আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে। মুজাহিদ বাহিনী রণাঙ্গনে পৌছতেই হযরত সাবেত বিন কায়েস নামক এক আনসার সর্দার ঘোড়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে সৈন্যদের একেবারে সামনে চলে আসেন।

"প্রিয় মদীনাবাসী!" তিনি উচ্চকণ্ঠে বলেন—"তোমরা ইতোমধ্যে এক লজ্জাষ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছ।" হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) শত্রুদের দিকে ইশারা করে বলেন—"হে আমার প্রভু! এরা যার ইবাদত করে আমি তার উপর অভিসম্পাত দিচ্ছি।" অতঃপর তিনি মুজাহিদ বাহিনীর দিকে ফিরে বলেন—"যে মন্দ দৃষ্টান্ত আমার এই বাহিনী কায়েম করেছে আমি তার উপরও অভিশাপ দিচ্ছি।"

এতটুকু বলেই হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) খাপ থেকে তরবারী উন্মুক্ত করেন এবং ঘোড়ার গতি শত্রুদের দিকে করে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। তাঁর শেষ বাক্য এই ছিল-"অবশ্যই আমার তলোয়ার শত্রুদের মৃত্যু উপহার দিবে এবং তোমাদেরকে হিম্মত ও দৃঢ়তার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখাবে।"

হযরত সাবেত (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেই হযরত খালিদ (রা.) শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। ঐতিহাসিকরা লেখেন, হযরত সাবেত (রা.)-এর তরবারী এমন ক্ষিপ্র ও দক্ষতার সাথে চলতে থাকে যে, যেই তার সামনে এসেছে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় না। সম্ভবত তার শরীরের এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে তলোয়ার বা বর্শার আঘাত লাগেনি। দুশমনের সারি কচুকাটা কাটতে কাটতে তিনি অনেক গভীরে গিয়ে ঢলে পড়েন এবং শহীদ হয়ে যান। নিজ

বাহিনীর জন্য তিনি বাস্তবিকই অমিত সাহস এবং পাহাড়সম দৃঢ়তার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত পেশ করে যান।

মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকল কতিপয় ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী দ্বিতীয়বার এই কসম করে যুদ্ধে নামে যে, এবার ময়দান থেকে তাদের লাশ আসবে। জীবিত ফিরবে না। জনৈক ঐতিহাসিক লেখেন, তারা এবার এ শপথে উজ্জিবীত হন যে, হাতের তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে, তুণীরের তীর শেষ হয়ে গেলে প্রয়োজনে দাঁত দিয়ে লড়ে যাব; তবুও ময়দান হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না।

হযরত খালিদ (রা.) নতুন এক দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। তিনি কতক জানবাজ মুজাহিদ বাছাই করে নিজের সাথে রাখেন। যাতে যুদ্ধ যেখানেই বেগতিক আকার ধারণ করে, সেখানে এই রিজার্ভ ফোর্স নিয়ে লাফিয়ে পড়া যায়। তিনি এই বাছাই করা জানবাজদের বলেন—"তোমরা আমার পিছে পিছে থাকবে।" তিনি নিজে সম্মুখে থাকতে চাইতেন।

দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হলে এক নতুন বিপদ এসে পতিত হয়। বিরাট ঘূর্ণিঝড় ওঠে। যা মুজাহিদদের দিকেই ধেয়ে আসে। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, এটা মরুঝড় ছিল না; বরং তীব্র উৎক্ষিপ্ত ধুলো ছিল মাত্র। রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের অসংখ্যক ঘোড়া আর পদাতিক বাহিনীর বিচরণে সৃষ্ট ধুলোর পরিবেশটা ভূপৃষ্ঠ হতে উৎক্ষিপ্ত ধুলোর মত ছিল। প্রচণ্ড এ ধুলোর গতি মুজাহিদদের দিকে থাকায় উড়ন্ত ধুলা-বালি মুসলমানদের চোখে গিয়ে পড়ছিল। বদরে কাফেরদের সাথে এমন ঘটনাই ঘটেছিল। ধুলোর তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কতক মুজাহিদ হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-এর কাছে জানতে চান যে, তারা এ মুহূর্তে কি করবে।

"খোদার কসম!" হযরত যায়েদ (রা.) গর্জনের স্বরে বলেন—"আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি, শত্রুকে পরাস্ত করা পর্যন্ত তিনি যেন আমাকে জীবিত রাখেন।...প্রিয় মক্কা ও মদীনাবাসী! ধুলিঝড়ে ভীত হয়ো না। মাথা একটু নীচু রাখ। মাটি এবং বালু তোমাদের চোখে পড়বে না। যে কোন পরিস্থিতিতে পিছু হটবে না। অসীম সাহস রাখবে। দৃঢ়তা হস্তচ্যুত হতে দিবে না। ধুলিঝড় তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

হযরত যায়েদ (রা.) সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর সামনে এই দৃষ্টান্ত রেখে যান যে, তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার অধীনস্ত বাহিনীও তার অনুসরণে পিছে পিছে যায়। হযরত যায়েদ (রা.)

বীর-বিক্রমে তলোয়ার চালাতে চালাতে সামনে এগিয়ে যান এবং শাহাদাত বরণ করেন।

আরেক সেনাপতি আবু হুজায়ফাও একই দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। তিনি এই নারাধ্বনি দিতে দিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন—"হে কুরআনের ধারক-বাহক! স্বীয় কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের ইজ্জত রক্ষা কর।" তিনিও বিপুল বিক্রমে সৈন্যের সারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে চলেন। ক্রমে আহত হতে থাকেন এবং এক সময় শহীদ হয়ে যান।

এ সকল পদস্থ সেনাপতি নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর দৃঢ়তায় প্রাণ সঞ্চার করেন। তারা হঠাৎ খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং বিদ্যুৎগতিতে শত্রুর শাহরগ গিয়ে স্পর্শ করে। মুহুর্মুহু তীব্র আক্রমণ সত্ত্বেও মুসাইলামার সৈন্যরা যেই সেই রয়ে যায়। কোন কিছুই তাদের বিচলিত কিংবা কোণঠাসা করতে পারে না। হযরত খালিদ (রা.) পুরো রণাঙ্গনের উপর হাল্কা জরীপ চালান। এটা এমন ঘোরতর যুদ্ধ ছিল যেখানে কোন চালের আদৌ সুযোগ ছিল না। এটা ছিল রীতিমত সম্মুখযুদ্ধ। ব্যক্তিগত বাহুবল এবং বীরত্বেরই জয়জয়কার ছিল এখানে।

হযরত খালিদ (রা.) রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণকালে তাঁর দৃষ্টি মুসাইলামার নিরাপত্তা বাহিনীর উপর পড়ে। তারা ভণ্ড নবীর জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়ে চলছিল। বিস্ফোরনমুখ পরিস্থিতিতে বাজি জিততে হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথায় মাত্র একটি পন্থাই কেবল ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে। আর তা হলো মুসাইলামার হত্যা। তাকে হত্যা করতে পারলে মুসলমান বিজয় লাভ করতে পারে। অন্যথা যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে বেগতিক দিকে মোড় নিতে পারে। কিন্তু মুসাইলামার হত্যার ব্যাপারটি এতটুকু সহজ নয়, যত সহজে সেটা মাথায় ঢুকতে পেরেছে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার জন্য এমনভাবে তার দিকে অগ্রসর হয় যে, বাছাইকৃত সৈন্যরা তার চতুর্দিকে ছিল। নিকটে পৌছলে মুসাইলামার নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের উপর একযোগে চড়াও হয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে যে আসে, সে আস্ত ফেরত যায় না। কিন্তু তারপরেও মুসাইলামা পর্যন্ত পৌছার কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর জানবাজ সৈনিকরা নিজেদের ডিসিপ্লিন ঠিক রাখে। ফাটল সৃষ্টি হতে দেয় না। একটি মোক্ষম সুযোগ দেখে হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে একযোগে হামলার নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও দাপটে তরবারী চালান। মুসাইলামার কতক নিরাপত্তাকর্মী আগেই মারা গিয়েছিল বা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছিল। খালিদ বাহিনীর শার্দূলদের হামলা এত ক্ষিপ্রগতির

ও মারাত্মক ছিল যে, নিরাপত্তাকর্মীরা দিশেহারা হয়ে যায়। পুরো ময়দানে মুজাহিদ বাহিনী নাটকীয়ভাবে ফিরে আসে। চালকের আসন এখন তাদের দখলে। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি তাদের হাতে চলে আসে। জয় অথবা লয়ের যে দৃপ্ত শপথে উজ্জীবিত হয়ে মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধে নেমেছিল তার কারণে তারা মুরতাদ বাহিনীর জন্য এক ভয়ঙ্কর দানবে পরিণত হয়েছিল। নিরাপত্তাকর্মী বৃদ্ধির কোন সুযোগ মুসাইলামার ছিল না।

একদিকে মুসলমানদের গগনভেদী নারাধ্বনি আর অপরদিকে ঘূর্ণিঝড়ের শো শো আওয়াজ রণাঙ্গনের পরিবেশকে আরো ভয়াবহ করে তুলছিল। মুসাইলামার একান্ত বডিগার্ডদেরও হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর জানবাজ সৈন্যরা স্পেশাল বডিগার্ড বাহিনীর বৃত্তকেও ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়।

"নবীজী!" এক বডিগার্ড ভাঙ্গাসুরে বলে—"কোন মোজেজা দেখান।"

"আপনার প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন শ্রদ্ধেয় নবী!" আরেক বডিগার্ড বলে— "একমাত্র বিজয় ছিল আপনার প্রতিশ্রুতি।"

মুসাইলামা মৃত্যুকে তার দিকে দ্রুতগতিতে ধেয়ে আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে বলে—"নিজেদের মান-মর্যাদা এবং ইজ্জত-আবরু রক্ষায় প্রাণপণ লড়ে যাও"—এরপর সে নিজস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

॥ সতের ॥

শত্রুর সম্মুখ সাড়ি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। পতাকা স্বস্থানে ছিল না। এতে ময়দানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে যে, "নবী ময়দানে নেই... রাসূল পালিয়ে গেছে।" এ ঘোষণা মুরতাদদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও লোপ করে দেয়। তারা মনোবল হারিয়ে রণে ভঙ্গ দিতে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যে ময়দান মুরতাদশূন্য হয়ে যায়। কিন্তু রণাঙ্গনের দৃশ্য ছিল হৃদয়বিদারক। স্রোতের গতিতে মানব খুন নদী সৃষ্টি করে বেয়ে যেতে থাকে। যেখানে মূল যুদ্ধ হয় তা একটি সংকীর্ণ ঘাঁটির মত স্থান ছিল। ইতোপূর্বে এর কোন নাম ছিল না। এই যুদ্ধ তাকে একটি নতুন নাম উপহার দেয়া। 'শায়িবুদ্দাম' অর্থাৎ রক্তাক্ত প্রান্তর। এখানে উভয় পক্ষের এত প্রাণহানি ঘটে যে, ময়দানে লাশের উপর লাশ পড়ে লাশের স্তূপ হয়ে যায়। আহতের সংখ্যা ছিল হাজার-হাজার। মুসাইলামার সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকায় প্রাণহানির ঘটনাও তাদের মধ্যে বেশী ঘটে। মুসলমানদের প্রাণহানির সংখ্যাও কম ছিল না। কতক ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে আহত-নিহতদের পিষ্ট করে ফিরছিল। অনেক সুস্থ লোকও তাদের পদতলে পিষ্ট হতে থাকে।

মুসাইলামার সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে পালিয়ে গেলে মুজাহিদ বাহিনী তাদের

পশ্চাদ্ধাবন করে। মুহকাম বিন তুফাইল নামক মুসাইলামার এক সেনাপতি সৈন্যদেরকে আহ্বান করে বলছিল—"বনূ হানীফা! বাগিচায় গিয়ে আশ্রয় নাও।"

একমাত্র বাগিচাই ছিল তাদের আশ্রয়স্থল। এই বাগিচার নাম ছিল হাদীকাতুর রহমান। বাগিচাটি দৈর্ঘ-প্রস্থে অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। চতুর্দিক দিয়ে উঁচু প্রাচীর ছিল। মুসাইলামা রণাঙ্গন ছেড়ে এখানে এসে ওঠে। বাগিচাটি রণাঙ্গনের সন্নিকটেই ছিল। মুসাইলামার স্পেশাল ব্রাঞ্চের অনেক সৈন্য বাগিচায় ঢুকে গিয়েছিল। মুজাহিদরা মুরতাদদের তাড়িয়ে বাগিচার কাছে এলে ততক্ষণে অপর প্রান্ত হতে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে মুসাইলামার সাথে বাগিচায় আশ্রয়গ্রহণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৭ হাজারের মত।

বাগিচার ফটক বন্ধ দেখে হযরত খালিদ (রা.) বাউন্ডারীর চতুর্দিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করেন। ভিতরে প্রবেশের কোন উপায় তিনি বের করতে পারেন না। এ মুহূর্তে ভিতরে প্রবেশ অপরিহার্য ছিল। মুসাইলামাকে হত্যার মাধ্যমে উত্থিত ফিৎনার চির অবসান ঘটানো অত্যন্ত জরুরী ছিল।

হযরত বারা বিন মালেক (রা.) নামক এক মুজাহিদ দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে বলে—"আমাকে কয়েকজন ধরে উঁচিয়ে বাগিচার ওপাশে ছুড়ে দাও। খোদার কসম! আমি দরজা খুলে দিব।"

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত বারা (রা.) এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বাগিচার ওপাশে তাকে একাকী ছাড়ার প্রস্তাবে কেউ সাড়া দেয় না। কিন্তু তিনি নিজেও নাছোড় বান্দা। বারংবার অনুরোধ জানাতে থাকেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে দু'তিনজন সৈন্য তাকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে দাঁড় করায়। তিনি এভাবে দেয়ালের উপরিভাগে পৌছে দেয়াল টপকিয়ে বাগিচার অভ্যন্তরে লাফিয়ে পড়েন। বাগিচার অভ্যন্তরে এখন মুসাইলামার ৭ হাজার সশস্ত্র সৈন্য পক্ষান্তরে একমাত্র মুসলমান হযরত বারা (রা.)।

৭ হাজার সশস্ত্র কাফেরের মাঝে একজন মুসলমানের লাফিয়ে পড়া জলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে লাফিয়ে পড়ারই নামান্তর। হযরত বারা (রা.) এক দুর্বার আকর্ষণে এভাবে অগ্নিকুণ্ডের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাগিচার অভ্যন্তরে গিয়ে দরজা খোলার সীমাহীন ঝুঁকি তিনি কারো নির্দেশ ছাড়াই নিজে নিজে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দরজার নিকটবর্তী স্থান থেকে দেয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। ৭ হাজার সৈন্য বাগিচায় ঢুকে তখনও পর্যন্ত এলোপাথাড়ি ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তারা টের পেয়েছিল যে, মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবনে এখানে এসে পৌছেছে এবং বর্তমানে তারা বাগিচা অবরোধ করে আছে। কিন্তু তারা ভাবতেই পারে নাই যে, কোন মুসলমান একাকী দেয়াল টপকিয়ে ভিতরে

আসার সাহস করতে পারে।

"কে ও?" একজন চেঁচিয়ে ওঠে—"লোকটি দরজা খুলছে।"

হযরত বারা (রা.)-কে একজন দেখে ফেলে এবং আরেকজন চিনতে পেরে চিৎকার করে ওঠে—"মুসলমান! মুসলমান!!"

"কেটে ফেল ওকে"—জনৈক মুরতাদ চেঁচিয়ে বলে।

"মস্তক উড়িয়ে দাও"—আরেকজন বলে।

"বন্দী কর...হত্য' কর"—শতকণ্ঠের গুঞ্জন ওঠে।

অসংখ্য মুরতাদ তলোয়ার ও বর্শা উঁচিয়ে হযরত বারা (রা.)-কে বধ করতে ছুটে আসে। হযরত বারা (রা.)ও তখন পর্যন্ত দরজা খুলতে সক্ষম হন না। শত্রুদের এগিয়ে আসতে দেখে তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করেন এবং বনূ হানীফার পক্ষ হতে যে লোকটি সর্বাগ্রে তাঁর নিকটে পৌছে হযরত বারা (রা.)-এর মারাত্মক কোপ তাকে স্বস্থানে থামিয়ে দেয়। আঘাত খেয়ে লোকটি শক পাবার মত কয়েক পা পিছনে হটে যায়। তিনি এ সুযোগে আবার দরজা খোলার চেষ্টা করেন। তিনি বারবার স্থান পরিবর্তন করে দরজা খুলছিলেন। একই সাথে দু'ব্যক্তি তার লক্ষ্যে বর্শা ছুড়ে মারে। তিনি দক্ষতার সাথে একদিকে সরে যান। বর্শার ফলা হযরত বারা (রা.)-এর শরীরে বিদ্ধ না হয়ে দরজার পাল্লায় গিয়ে আঘাত করে। তারা যে মুহূর্তে ব্যর্থ বর্শা দরজা হতে ছাড়াবার চেষ্টায় রত তখন হযরত বারা (রা.) চোখের পলকে তরবারী চালিয়ে তাদের ঘায়েল করে দেন।

এবার কয়েকজন মিলে একযোগে হামলা চালাতে থাকে। হযরত বারা (রা.) দরজায় পিঠ লাগিয়ে অতি দক্ষতার সাথে তাদের হামলা প্রতিহত করতে থাকেন। এ সময় দু'টি শ্লোগান তার জবানে জারী ছিল—"আল্লাহু আকবার...মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"—তিনি এক সাথে তিন কাজ করতে থাকেন। (১) আক্রমণ প্রতিহত (২) আক্রমণ চালানো এবং (৩) দরজা খোলার চেষ্টা।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, হযরত বারা (রা.) সেদিন অবিশ্বাস্যভাবে প্রচুর সংখ্যক মুরতাদকে নিহত ও আহত করে অবশেষে দরজা খুলে দিতে সক্ষম হন। কোন কোন ঐতিহাসিক অবশ্য এটাও লেখেন যে, হযরত বারা (রা.)-এর অনুকরণে আরো কতিপয় মুজাহিদ দেয়াল টপকিয়ে বাগিচায় ঢুকে পড়েছিলেন। তারা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে মুরতাদদের দূরে ভাগিয়ে দেয় এবং হযরত বারা (রা.) দরজা খুলে দেন। এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, হযরত বারা বিন মালিক (রা.)ই সর্বপ্রথম দেয়াল টপকিয়ে বাগিচার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন।

দরজা খুলতেই মুজাহিদ বাহিনী বাধভাঙ্গা স্রোতের মত ভিতরে প্রবেশ করে। অনেক মুজাহিদ হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে প্রাচীরে উঠে পড়ে। তারা শত্রুদের উপর তীর বর্ষণ শুরু করে। যাতে তারা মুজাহিদদের অনুপ্রবেশে বিঘ্নতা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। মুজাহিদরা অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করে বনূ হানীফার উপর বজ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুরতাদরা পাইকারী হারে হত্যা হতে থাকে। তাদের পলায়নের পথ ছিল রুদ্ধ। তারা এখন প্রাণ বাঁচাতে লড়ে চলে। যদিও মিথ্যা নবী তবুও সে এখন তাদের সাথে। সে সৈন্যদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে চলছিল আর সৈন্যরা প্রাণপণে লড়ছিল।

মুরতাদদের সংখ্যা প্রচুর হলেও দ্রুত সে সংখ্যা কমে আসতে থাকে। বাগিচা খুনের দরিয়ায় ভেসে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথায় একটি চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, কিভাবে মুসাইলামাকে হত্যা করা যাবে। কারণ, সে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই বন্ধ হবে না। কিন্তু মুসাইলামার কোন পাত্তা ছিল না। তার দৃষ্টি মুসাইলামাকে খুঁজে পায় না।

মুসাইলামা হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারলেও আরেক মুজাহিদের দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারে না। তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি মুসাইলামাকে ঠিকই খুঁজে বের করে। তিনি ছিলেন হাবশী গোলাম হযরত ওয়াহশী বিন হারব (রা.)। টার্গেটে বর্শা ছোঁয়াতে হযরত ওয়াহশীর সমকক্ষ সে যুগে আরবে কেউ ছিল না। তিনি ইতোপূর্বে তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এক নর্তকীর মাথায় একবার মিডিয়াম সাইজের একটি কড়া চুলের সাথে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয় যে, কড়াটি তার মাথার উপরে সোজা স্থাপিত থাকে। নর্তকী নাচতে থাকে আর হযরত ওয়াহশী (রা.) কয়েক কদম দূরে বর্শা হাতে নিয়ে দাঁড়ান।

তিনি হাতে বর্শা উঁচিয়ে পজিশন ঠিক করেন। নর্তকী নিজস্ব ভঙ্গিমায় নাচতে থাকে। নর্তকী নাচতে নাচতে যখনই পজিশন বরাবর আসে ঠিক তখনই তিনি কড়া লক্ষ্যে বর্শা ছুড়ে মারেন। বর্শা নর্তকীর মাথায় স্থাপিত কড়ার মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

উহুদ যুদ্ধে তিনি রাসূল (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে ঠিক এমনিভাবে বর্শার আঘাতে শহীদ করেছিলেন। তিনি বাজি জিতে হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হযরত হিন্দা (রা.)-এর থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। অবশ্য ওয়াহশী (রা.) তখন মুসলমান ছিলেন না। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসাইলামার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে হযরত ওয়াহশী (রা.) মুসলিম সৈন্যদের

অন্তর্গত ছিলেন। বাগিচায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলাকালে তিনি মুসাইলামাকে দেখে ফেলেন। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর মুখে শুনেছিলেন যে, মুসাইলামাকে হত্যা করা ছাড়া এ যুদ্ধ থামবে না। তিনি মুসাইলামার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। শত্রুর তলেয়ার-বর্শা, সাথীদের নিক্ষিপ্ত তীর এড়িয়ে এবং নিহত-আহতদের শরীরের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে তিনি সমস্ত বাগিচা পায়চারী করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মুসাইলামা তাঁর চোখে পড়ে যায়। সে নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্ভেদ্য বেষ্টনির মধ্যে ছিল এবং নিরাপত্তা কর্মীরা এমন বীরত্ব প্রদর্শন করতে থাকে যে, তারা কোন মুসলমানকে ধারে-কাছে পর্যন্ত আসতে দিচ্ছিল না।

ওয়াহশী (রা.)-এর জন্য মুসাইলামার নিকটে যাবার প্রয়োজন ছিল না। মুজাহিদ বাহিনী মুসাইলামার নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। এদিকে হযরত ওয়াহশী (রা.) মুসাইলামার প্রতি বর্শা নিক্ষেপের মোক্ষম সুযোগ বের করতে সংঘর্ষরত সৈনিকদের চারদিকে ঘুরছিলেন। তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। কিন্তু উম্মে আম্মারা নামক এক মুসলিম মহিলার দরুণ সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যায়। মহিলা নিজেও মুসাইলামা পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রের সাথে সাথে ছিলেন। তিনি মুসাইলামার নিরাপত্তার দেয়াল ভাঙতে চেষ্টা করলে এক মুরতাদের তলোয়ার তার গতিরোধ করে। উম্মে আম্মারা নিজের তলোয়ার দ্বারা তাকে ধরাশায়ী করার প্রাণান্তক চেষ্টা করেন কিন্তু মুরতাদের হঠাৎ এক আক্রমণে তার হাত সম্পূর্ণ কেটে যায়। তাঁর পুত্র তলোয়ারের এক কোপে ঐ মুরতাদকে জাহান্নামে পাঠায়। অতঃপর তিনি মাতাকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে সরে যান।

হযরত ওয়াহশী (রা.) আরেকটি সুযোগ পেয়ে যান। তিনি সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজি নন। বর্শা হাতে তুলে নেন এবং পজিশন ঠিক করে টার্গেটে পূর্ণশক্তিতে বর্শা ছুড়ে মারেন। অব্যর্থ নিশানা। কেল্লা ফতে। বর্শা মুসাইলামার ইয়ামোটা ভূড়িতে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়। সে দ্রুত বর্শা ধরে ফেলে। কিন্তু ততক্ষণে বর্শা তার কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিল।

বর্শার আঘাত এত মারাত্মক ছিল যে, পেট থেকে বর্শা বের করার শক্তি পর্যন্ত মুসাইলামার হাতে ছিল না। রক্তঝরা গভীর বর্শাঘাতে সে জমিনে লুটিয়ে পড়ে। এ আঘাতেই সে মারা যেত। কিন্তু হযরত আবু দাযানা (রা.) এর তলোয়ারের আঘাত তাকে ধুকে ধুকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। তিনি মুসাইলামাকে জমিনে লুটিয়ে ছটফট করতে দেখে ঘাড়ে তলোয়ারের এমন এক আঘাত হানেন যে, এক আঘাতে তার মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হযরত আবু দাযানা (রা.) মস্তক বিচ্ছিন্ন লাশের দিকে আনমনে তাকিয়ে

থাকেন। ইতোমধ্যে মুসাইলামার এক বডিগার্ড পশ্চাত হতে হযরত আবূ দাযানার উপর এত জোরে আঘাত করে যে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং শাহাদাত বরণ করেন।

"বনূ হানীফা!" এক মুরতাদ চিৎকার করে বলে—"আমাদের নবীকে জনৈক কালো মোটা হাবশী হত্যা করেছে।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম লেখেন, বাগিচার অভ্যন্তরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে এই আওয়াজ প্রতিধ্বনি হতে থাকে—"নবী নিহত...মুসাইলামা মারা গেছে।"

॥ আঠার ॥

মুসাইলামা কাজ্জাবের হত্যার সমুদয় কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর। তিনি এর কাঙ্ক্ষিত হত্যার মাধ্যমে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করেছিলেন। হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর জীবন বড় বৈচিত্র্যময়। পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, তিনি মুসাইলামাকে যে অপূর্ব কৌশল ও দক্ষতার মাধ্যমে হত্যা করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে উহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন। মক্কা বিজয় হলে রাসূল (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কয়েকজন নর-নারীকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ঘোষণা করে তাদের সাধারণ ক্ষমার আওতাবহির্ভূত রাখেন। যুদ্ধাপরাধীদের লিস্টে হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর নামও ছিল। তিনি বিশেষ কোন সূত্রে টের পেয়েছিলেন যে, মুসলমানরা তাকে কিছুতেই জীবিত রাখবে না। তিনি প্রাণভয়ে তায়েফ গিয়ে সাকীফ গোত্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে মুসলিম বাহিনী সাকীফ গোত্রকে যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল তার বিবরণ পাঠকবর্গ ইতোপূর্বে অবগত হয়েছেন। সাকীফ গোত্র পরাজিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে আশ্রয়রত হযরত ওয়াহশী (রা.)ও ইসলামের সত্যতা মেনে নেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বাইয়াত হতে এবং প্রাণভিক্ষা চাইতে রাসূল (সা.)-এর দরবারে হাজির হন। রাসূল (সা.) তাকে কয়েক বছর পূর্বে দেখেছিলেন বিধায় সম্ভবত ভালভাবে চিনতে পারেন না। "তুমি সেই ওয়াহশী!" রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

"জী হুজুর! আমি সেই ওয়াহশী"—তিনি জবাবে বলেন—"এখন আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলে বিশ্বাস করি।"

"ওহ্, ওয়াহশী!" রাসূল (সা.) জানতে চান—বলতো তুমি কিভাবে হামযাকে হত্যা করেছিলে?

ঐতিহাসিকরা লেখেন, রাসূল (সা.)-এর অনুরোধে হযরত ওয়াহশী (রা.) হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যার পুরো বিবরণ এমনভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন,

যেন তিনি শ্রোতাদের অন্তরে নিজের বীরত্ব আর রণদক্ষতার গভীর প্রভাব বিস্তার করছেন। রাসূল (সা.) ইসলাম গ্রহণের সুবাদে তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু ইবনে হিশামের এক ভাষ্যে জানা যায় যে, রাসূল (সা.) তাকে বলেছিলেন, তিনি যেন কখনো তাঁর সামনে না আসেন। হযরত হামযা (রা.) রাসূল (সা.)-এর কেবল চাচাই ছিলেন না; উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী এবং সামাজিক পর্যায়েও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মহৎপ্রাণ এবং ক্ষমার আধার হওয়ায় রাসূল (সা.) হযরত ওয়াহশী (রা.)-কে ক্ষমা করে দিলেও অন্তরের অন্তঃস্থলে গভীর ক্ষত ঠিকই বিদ্যমান ছিল।

রাসূল (সা.) হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর প্রতি যে ধরনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ঐ হিন্দার প্রতিও, যার ইঙ্গিতে হযরত ওয়াহশী (রা.) রক্তঝরা গভীর বর্শাঘাতে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন। এরপরে গিয়ে হিন্দা ঐ লাশের সাথে অমানবিক আচরণ করেছিল। তাদের দু'জনের প্রতি রাসূল (সা.)-এর অসন্তুষ্টি ব্যক্তি বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতার কারণে ছিল না; আর তা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীলও নয়; বরং একজন মর্যাদাবান মুসলমানের মরদেহের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করাই ছিল তাঁর সমস্ত বেদনা ও অসন্তুষ্টির মূল কারণ। রাসূল (সা.) হযরত ওয়াহশী (রা.) ও হযরত হিন্দা (রা.)-কে বলেছিলেন, তোমরা আমার সামনে আসবে না। কারণ তোমাদের দেখলে আমার প্রিয় চাচা ও তার লাশের সাথে তোমাদের দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ে যায়। মোটকথা, হৃদয়ের গহীনে ব্যথা থাকলেও তিনি হযরত ওয়াহশী ও হযরত হিন্দা (রা.)-কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

হযরত ওয়াহশী (রা.) রাসূল (সা.)-এর খাঁটি অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও তিনি রাসূল (সা.)-এর ব্যথা মুছে তাঁর হৃদয় জয় করতে পারেন নি। এতে তিনি চরম মর্মাহত ও আত্মবিদগ্ধ হন। সারা জীবন তিনি এই দুঃখের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ান। রাসূল (সা.)-এর নিস্পৃহ আচরণ তাঁকে মর্মে মর্মে পুড়িয়ে মারে। তিনি সহ্য করতে পারেন না। মক্কা ছেড়ে চলে যান এবং দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত তায়েফের এখানে-ওখানে কাটান। এ সময় নিরবতা তাকে গ্রাস করে নেয়। সর্বদা গভীর চিন্তায় ডুবে থাকেন। তিনি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শত বেদনার মাঝেও তিনি ঈমান আঁকড়ে থাকেন।

দু'বছর পর অশান্ত হৃদয় শান্ত করতে তিনি মুসলিম বাহিনীতে শামিল হয়ে যান। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। ইয়ামামা যুদ্ধ চলাকালে তিনি জানতে পারেন যে, হযরত খালিদ (রা.) মুসাইলামাকে হত্যার চেষ্টায় রত। তিনি সেনাধ্যক্ষের ইচ্ছাকে নিজের কর্তব্য নির্ধারিত করেন এবং

আল্লাহ্র ফজলে সে কর্তব্য যথাযথ পালন করে দেখান।

এরপর হযরত ওয়াহ্শী (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীতে নিয়মিত থাকেন এবং পরপর কয়েকটি রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। সিরিয়া বিজয়ের পর তিনি ইসলামী বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমসে গিয়ে কোলাহলমুক্ত জীবন-যাপন করতে শুরু করেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর এ হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে লেখেন যে, হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যার অপরাধ পাহাড়ের মত রূপ ধারণ করে তাঁর অন্তরে চেপে বসেছিল। তিনি শরাব পান করতে শুরু করেন। কিন্তু তা বিলাসিতার কারণে ছিল না; বরং নিজেকে ভুলে যেতেই তিনি এ পন্থা বেছে নেন। হযরত উমর (রা.) নিজ শাসনামলে শরাব পানের অপরাধে তাকে ৮০ দোররা মেরে ছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর মাঝে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তিনি রীতিমত শরাব পান করতে থাকেন।

জীবনের শেষের দিকে এসে তার সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ দলে দলে শ্রদ্ধাভরে তার সাক্ষাতে আসতে থাকে। কিন্তু তিনি বেশিরভাগ সময় অস্বাভাবিক থাকতেন। স্বাভাবিক হলে মানুষকে হযরত হামযা (রা.) এবং মুসাইলামার হত্যার কিস্সা শোনাতেন। মানুষ দলে দলে এই কিস্সা শুনতেই তাঁর কাছে ভীড় জমাত। তিনি অনেকবার বর্শা হাতে নিয়ে বলেন—"অমুসলিম থাকা অবস্থায় এই বর্শাঘাতে আমি এক সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। অতঃপর মুসলমান হয়ে এই বর্শাঘাতেই এক সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামে পাঠিয়েছি।"

॥ উনিশ ॥

এক বিশিষ্ট ভদ্র মহিলার নাম উম্মে আম্মারা (রা.)। উহুদ যুদ্ধে তিনি ঐ মুসলিম নারীদের একজন ছিলেন, যারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে সৈন্যদের সাথে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ এক পর্যায়ে কুরাইশদের অনুকূলে চলে গিয়েছিল। তারা রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে প্রবল বেগে হামলা করে বসে। সাহাবায়ে কেরাম মানববর্ম রচনা করে রাসূল (সা.)-কে ঘিরে রেখেছিলেন। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, রাসূল (সা.)-এর নিরাপত্তা বাহিনীর বৃত্ত ভেঙ্গে যায়। ইবনে কুময়া নামক এক কুরাইশ রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

রাসূল (সা.)-এর ডানে হযরত মুছআব (রা.) ছিলেন। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) নিকটে কোথাও ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.)-কে বিপদের মুখে দেখে আহতদের সেবা ও পানি পান ছেড়ে রাসূল (সা.)-এর পানে দৌড়ে আসেন। তিনি যাবার পথে কোন লাশ বা মারাত্মক আহত কোন ব্যক্তির হাত হতে তলোয়ার উঠিয়ে নিয়ে যান।

ইবনে কুময়া রাসূল (সা.)-এর উপর আক্রমণ করার পরিবর্তে তাঁর দেহরক্ষী হযরত মুছআব (রা.)-এর দিকে ধাবিত হয়। হযরত মুছআব (রা.) বীরত্বের সাথে তার মোকাবিলা করেন। উম্মে আম্মারা (রা.) ইবনে কুময়ার কাঁধ লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানেন। কিন্তু সে বর্মাচ্ছাদিত থাকায় তরবারীর আঘাত ব্যর্থ হয়। ইবনে কুময়া ঘুরে পাল্টা হামলা চালায়। আঘাত এত জোরাল ছিল যে, তা হযরত উম্মে আম্মারার কাঁধে গিয়ে লাগলে তিনি মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। ইবনে কুময়া দ্বিতীয় আঘাত করে না। কেননা তার লক্ষ্য ছিল রাসূল (সা.)-এর প্রতি আক্রমণ করে তাঁকে ধরাশায়ী করা।

উম্মে আম্মারা (রা.) নিজ পুত্রের সাথে ইয়ামামা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে আসেন। এ যুদ্ধেও তিনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন যে, নারী হয়েও তিনি মুসাইলামাকে হত্যার মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন। তাঁর একটি হাত কাঁটা যায়।

৬৩২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ লগ্ন। অন্যান্য বছর এ সময় 'হাদীকাতুর রহমান' সবুজ-শ্যামলিমা ও রঙ-বেরঙের মাঝে সুসজ্জিত একটি মায়াকানন থাকত। অকৃপণ হাতে সে এ সময় লোকদেরকে ফল-মূল উপহার দিত। ক্লান্ত পথিকবর এখানে এসে নির্ভয়ে বিশ্রাম নিত। নানা ফুলের সুগন্ধে কাননটি মুখরিত ও সুরভিত ছিল। কিন্তু এতদিনের সে জীবন্ত কাননটি এখন মৃত্যুকাননে পরিণত। তার সৌন্দর্যচ্ছটা আর রূপের বাহার মানুষের তাজা রক্তে ডুবে গিয়েছিল। তার লাবণ্য লাশের নীচে চাপা পড়েছিল। মোহিনী সৌরভ রক্ত আর ছিন্ন-ভিন্ন গোশতের উৎকট গন্ধে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। যেখানে পাখিরা কিচির-মিচির ধ্বনি তুলে গান করত সেখানে আজ আহতদের আর্তচিৎকার। আহত ঘোড়াগুলো বল্গাহীন হয়ে উদভ্রান্তভাবে দৌড়ে ফিরছিল। তাদের ব্যথাদীর্ণ হ্রেষারব ছিল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অট্টহাসির মত।

মুসাইলামার নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুরতাদ বাহিনী প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নের পথ খোঁজে। তারা ইতোপূর্বেও পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথম থেকেই মুসলমানরা তাদের কাছে ভয়ংকর দানব ছিল। বাগিচায় এসে আরো এক হাজার মুরতাদ প্রাণ হারায়। তারা এখানে এসে এমনভাবে যুদ্ধ করে যেন পূর্ব থেকেই হেরে বসে আছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তারা শেষ রক্তবিন্দু উজাড় করে লড়াই জারী রাখে। কিন্তু নবী নিহত হওয়ার সংবাদ কানে গেলে তাদের সর্বশেষ শক্তিটুকুও লোপ পেয়ে যায়। হাতে অস্ত্র থাকলেও বাহুর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপরেও অনেকে পলায়নের পথ পরিষ্কার করতে তরবারী হেলাতে-দুলাতে থাকে। পরাজয় তাদের দেমাগে এঁটে গিয়েছিল।

রণাঙ্গনের অনতিদূরে মুসলমানদের লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রায় ছাউনীর মাঝে মাত্র একটি তাঁবু বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন একটি পরিচিত ঝড় এসে সেনাপতি ব্যতীত বাকী ছাউনীতে ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অক্ষত তাঁবুটি ছিল সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.)-এর। বনূ হানীফা প্রথম দিকে জয়লাভ করে মুসলিম সেনাছাউনীতে এভাবে টর্নেডোর মত আঘাত হেনে সব চুরমার করে দিয়েছিল। তারা হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতেও গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাদের সর্দার মুযাআ লোহার বেড়ি পরিহিত অবস্থায় বন্দী ছিল। তাঁবুতে হযরত খালিদ (রা.)-এর স্ত্রী লায়লাও ছিল। সৈন্যরা লায়লাকে হত্যা করতে কিংবা ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু মুযাআ তাদেরকে এই বলে ক্ষান্ত করেছিল যে, আগে পুরুষদের দিকে ধাবিত হও। নারীদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবার সময় এখনও আসেনি। তারা সর্দারের নির্দেশে তাঁবু ছেড়ে বেরিযে গিয়েছিল। এভাবে হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবু অক্ষত থেকে যায়।

হযরত খালিদ পত্নী লায়লা তাঁবুর বাইরে একটি উটে বসা ছিলেন। কোথাও যাবার ইচ্ছা তার ছিল না। তিনি উঁচু হয়ে রণাঙ্গনের অবস্থা নিরীক্ষণ করছিলেন। ময়দান ছিল জনশূন্য। বাগিচার উঁচু প্রাচীর আর গগনমুখী বৃক্ষের অগ্রভাগ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু বাগিচার অভ্যন্তরের দৃশ্য ছিল তার দৃষ্টির বাইরে। তিনি উট থেকে নেমে আসেন এবং সোজা তাঁবুর ভিতরে চলে যান।

"ইবনে মুরারাহ!" লায়লা মুযাআকে বলেন—তোমাদের নবী রণাঙ্গন ফেলে চলে গেছে। খোদার কসম। বনূ হানীফা পলায়ন করেছে।"

"আমি কোনদিন শুনিনি যে ১৩ হাজার সৈন্য ৪০ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত করেছে।" মুযাআ বলে, "রণাঙ্গণ ছেড়ে যাওয়াটা মুসাইলামার নয়া কৌশল হতে পারে, পিছপা নয়।"

"উভয় পক্ষ এখন বাগিচার অভ্যন্তরে।" লায়লা মুযাআকে জানান—"সবাই বাগিচায় ঢুকে থাকলে সেখান থেকে বনূ হানীফাই কেবল প্রাণ নিয়ে বের হবে।" মুযাআ বিন মুরারাহ আশ্চর্যের ভঙ্গিতে বলে—"আমার গোত্রের পিছু পিছু মুসলমানরা সত্যই যদি বাগিচায় ঢুকে থাকে, তাহলে নিশ্চিত মনে রেখ, মৃত্যুই তাদেরকে ওখানে টেনে নিয়ে গেছে। বনূ হানীফা জয়ের উর্ধ্বে।"

"আজ চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে"—লায়লা বলে—অপেক্ষা কর...ঘোড়ার ঘন্টাধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার স্বামীর দূতই হবে"—এই বলে লায়লা তাঁবু হতে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় এবং একটু পরে আনন্দচিত্তে বলেন—"দূত নিশ্চয় বিজয়ের খবর আনছে...এই তো সে এলো!"

॥ বিশ ॥

ঘোড়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে একেবারে লায়লার নিকটে এসে দাঁড়ায়। ঘোড়া থামতেই আরোহী লাফিয়ে নীচে নেমে আসে। হযরত খালিদ (রা.) নিজেই ছিলেন এই আরোহী। লায়লা তাঁকে একা দেখে প্রথমত খুব ঘাবড়ে যান। কারণ, সেনাপতির এভাবে ফিরে আসা এটাই প্রমাণ করে যে, তার অধীনস্ত সৈন্যরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে হারিয়ে পালিয়ে গেছে।

"রণাঙ্গনের কি খবর?" লায়লা উদ্বেগের সাথে জানতে চায়—আপনি একা এসেছেন কেন?"

" খোদার কসম! আমি বনূ হানীফাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছি।" হযরত খালিদ আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন—মুসাইলামা কাজ্জাব মারা গেছে।...সে কয়েদী কোথায়?"

লায়লা বিজয়ের সুসংবাদে হস্তদ্বয় উপরে তুলে আকাশ পানে তাকায় এবং প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—"মুযাআ বলছিল, বনূ হানীফা না-কি জয়ের উর্ধ্বে।"

"আমি জানতে চাচ্ছি সে এখন কোথায়? হযরত খালিদ (রা.) হাফ ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞাসা করেন—"তারা তাকে মুক্ত করে নিয়ে গেছে?"

"আমি এখানে ওলীদ পুত্র!" তাঁবুর অভ্যন্তর হতে মুযাআর কণ্ঠ ভেসে আসে—"আমি আপনার এ দাবী সত্য বলে বিশ্বাস করি না যে, মুসাইলামা নিহত হয়েছে।"

"আমার সাথে চল মুযাআ!" হযরত খালিদ (রা.) তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে বলেন—"তোমার কথা সত্যও হতে পারে। আমি মুসাইলামাকে চিনি না। তোমার গোত্রই এই চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেছে যে, মুসাইলামা মারা গেছে। আমার সাথে এস। অসংখ্য লাশের মাঝে তার লাশ চিহ্নিত করে আমাকে বল যে, এটা তার লাশ।"

তার কি হবে? মুযাআ জিজ্ঞাসা করে—"আমাকে মুক্ত করে দিবেন?"

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আমি ঐ গোত্রের এক নেতাকে স্বাধীন ছেড়ে দিব না, যে আমার দ্বীনের দুশমন। রেসালাতের মধ্যে অংশীর দাবীদার এবং এ দাবী সমর্থনকারীকে আমি কিভাবে ক্ষমা করতে পারি? আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তোমাকে ক্ষমা করতে পারে না।"

"ওহ্, ওলীদের পুত্র।" মুযাআ বিন মুরারাহ বলে—"আমি মুসাইলামার নবুওয়াতকে আন্তরিকভাবে কখনো স্বীকৃতি দিই নি। সে বাকশক্তির জোর এবং যাদুর কারসাজি ও ভেল্কিবাজি দেখিয়ে নবী হয়ে গিয়েছিল। আপনি তার মুরীদ ও

ভক্তবৃন্দের সংখ্যাও দেখেছেন। আমি তাকে নবী বলে মেনে না নিলে সে আমার পুরো গোত্রকে জীবন্ত পুড়ে মারত। গোত্র থেকে আমি নিজেকে বিচ্ছিন্নও করতে চাইনি। এখন যদি আপনি আমাকে হত্যার নির্দেশ দেন, তবে এটা সম্পূর্ণ অন্যায় হত্যা হবে।"

"যারা আমাদের তাঁবু লুটতে এবং ধ্বংস করতে এসেছিল এ লোকটি তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে"—লায়লা হযরত খালিদ (রা.)-কে জানান—"লোকটি লুটেরাদের এই বলে নিবৃত্ত করেছিল যে, আগে পুরুষদের পশ্চাদ্ধাবন কর...। তারা চলে যায়। লোকটি তাদেরকে এ কথাও বলে না যে, আমার পায়ের বেড়ি খুলে দাও।"

"এ নারীর প্রতি তোমার অনুগ্রহের কারণ কি মুযাআ?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"কারণ, আমার গোত্র আমাকে যে সম্মান করে একজন যুদ্ধবন্দী হওয়া সত্ত্বেও ইনি আমার সাথে তদ্রূপ সম্মানজনক আচরণ করেছেন।" মুযাআ বলে—"তিনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন আমি তার বদলা দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র।...আমি চাইলে এমনটি করতে পারতাম যে, আমার লোকদেরকে পায়ের বেড়ি খুলে দিতে বলতাম অতঃপর আপনার এই অপরূপ সুন্দর স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাঁদী করে রাখতাম?"

"নিঃসন্দেহে তুমি সম্মানের উপযুক্ত মুযাআ।" হযরত খালিদ (রা.) কৃতজ্ঞতার স্বরে বলেন—"আমি নিজেই তোমার পায়ের বেড়ি খুলে দিচ্ছি। তুমি আমার সাথে যাবে এবং মুসাইলামার লাশ শনাক্ত করে আমাকে দেখাবে।"

॥ একুশ ॥

মুযাআ বিন মুরারাহ হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে তাঁবু হতে বের হওয়ার সময় তার পায়ে বেড়ি ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) বাইরে এসে দেখেন যে, তার দুই নিরাপত্তা কর্মী দাঁড়ানো। তিনি তাঁবুতে আসার সময় তাদের অবগত করানোর সুযোগ পান নাই। এদিকে নিরাপত্তাকর্মীরা শুধু এতটুকুই জানতেন যে, হযরত খালিদ (রা.) এদিকে কোথাও এসেছেন। কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তা বাহিনী জানতে পারে যে, সেনাপতি এদিকে নেই। তিনি অন্য পথে কোথায় যেন চলে গেছেন। তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দুই নিরাপত্তাকর্মী এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে তাঁর তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌছান। তাঁবুর অভ্যন্তরে হযরত খালিদ (রা.)-এর আওয়াজ শুনে তারা নিশ্চিত হয় যে, তিনি এখানেই আছেন। ফলে তারা তাঁবুর বাইরে অবস্থান গ্রহণ করে। সেনাপতিকে শত্রু সমৃদ্ধ এলাকায় এভাবে একাকী ছাড়ার পক্ষপাতী তারা ছিল না।

মুযাআ স্বচক্ষে রণাঙ্গনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। তারই গোত্রের সারি সারি লাশ ছাড়া তার চোখে আর কিছু পড়ে না।

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না"—মুযাআ বিস্ময়কর কণ্ঠে বলে—"চাক্ষুষ দেখেও আমার বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না।...মুষ্টিমেয় মুসলমান এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে?"

"এটা মানুষের বিজয় নয়"—হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"এটা সত্য আকীদা-বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র সত্য রাসূলের বিজয়। বনূ হানীফা ভ্রান্ত বিশ্বাস লালন করে ময়দানে নেমেছিল। আমাদের তরবারী ঐ ভ্রান্ত আকীদাকে কেটে কুচিকুচি করেছে। ফলে সংখ্যায় তারা বিশাল হওয়া সত্ত্বেও পালিয়ে গেছে।"

তারা লাশের স্তূপ এবং অসংখ্য আহতদের ডিঙিয়ে বাগিচায় গিয়ে পৌছে। ভেতরে ঢুকলে সেখানেও লাশের পর লাশ পড়ে ছিল। মুসলমানরা নিহতদের অস্ত্র জমা করছিল। বনূ হানীফার মধ্য হতে যারা জীবিত ছিল তারা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) হযরত ওয়াহশী বিন হারব (রা.)-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসাইলামা মনে করে যাকে সে ঘায়েল করেছে তার লাশ কোথায়? হযরত ওয়াহশী (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে ঘটনাস্থলে নিয়ে যান। মুসাইলামার লাশের কাছে গিয়ে হযরত ওয়াহশী (রা.) ইশারা করে দেখান।

"না"—হযরত খালিদ (রা.) অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেন—"এই খর্বাকৃতির এবং কুৎসিত লোক কখনো মুসাইলামা হতে পারে না। এর চেহারা বড়ই কদর্য।"

"এটাই"—মুযাআ বলে—"এটাই মুসাইলামার লাশ।"

"যে ব্যক্তি হাজার হাজার লোককে ভ্রষ্টতার গোলক ধাঁধায় নিক্ষিপ্ত করেছে এটা তারই লাশ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"লোকটি আপাদ-মস্তক এক ফেৎনাই ছিল।"

"ইবনে ওলীদ!" মুযাআ হযরত খালিদ (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে—"বিজয় লাভে আত্মতুষ্ট হবেন না। আপনার জন্য আসল মোকাবিলা সামনে অপেক্ষমাণ।"

"কার সাথে?" হযরত খালিদ (রা.) চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেন।

"বনূ হানীফার সাথে"—মুযাআ জবাবে বলে—"যারা ময়দানে এসে লড়াই করেছে তারা বনূ হানীফার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। আরো বিশাল বাহিনী ইয়ামামায় কেল্লার অভ্যন্তরে প্রস্তুত হয়ে আছে। নিজেদের প্রাণহানি দেখুন এবং চিন্তা করুন যে, আপনার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য কি কেল্লার তেজোদ্যম বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে? তদুপরি আপনার সৈন্য ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) লাশে আটা পূর্ণ বাগিচায় নজর ফিরান। তাঁর সৈন্যরা বাস্তবেই লড়ার উপযোগী ছিল না। জানবাজি রাখার মত পরিস্থিতি বর্তমানে ছিল না বললেই চলে। আহত সৈন্যের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। যারা অক্ষত ছিল তারাও এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, যেখানেই খালি জায়গা পায় সেখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তিনগুণ বেশী সৈন্যের সাথে তারা সারাদিন বীর-বিক্রমে লড়েছে। তাদের রেস্টের খুবই প্রয়োজন ছিল।

"আপনি আমার একটি প্রস্তাব মেনে নিলে আমি কেল্লায় গিয়ে সন্ধির আলোচনা করতে পারি"—মুযাআ বলে—"আশা করি আমার গোত্র আমার কথা ফেলবে না।"

হযরত খালিদ (রা.) যোগ্য সেনাপতি ছিলেন। সমর নেতৃত্বে তাঁর উপমা তিনি নিজেই। রাসূল (সা.)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি আবেগ দ্বারা পরিচালিত হতেন না। বড়ই চৌকস এবং বাস্তববাদী লোক ছিলেন। দুশমনকে কেবল ময়দানে হারিয়ে দেয়াকেই তিনি বিজয় মনে করতেন না, বরং পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের এলাকা করায়ত্ত করতে পারাই ছিল তার দৃষ্টিতে বিজয়ের পূর্ণাঙ্গতা। তাঁর নীতি ছিল, দুশমনকে জ্যান্ত সাপ মনে কর। তার মস্তক পিষ্ট করেও একবার চেয়ে দেখ যে, মৃদু নড়াচড়াও সে করে কি-না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর মাঝে নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা ছিল স্বভাবজাত। কিভাবে দক্ষ হাতে সৈন্য পরিচালনা করতে হয় তা তিনি ভাল করেই বুঝতেন। নিয়মতান্ত্রিকতায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত কট্টর। এতদসত্ত্বেও কোন জটিল পরিস্থিতি সামনে এলে তিনি সহ সেনাপতিদের ডেকে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। মুযাআ বিন মুরারাহ সন্ধির প্রস্তাব তুললে তিনি একদিকে শত্রুদের পিছুহটা এবং অপরদিকে মুজাহিদদের লড়াইয়ের অনুপযুক্ততার বিষয়টি সামনে রেখে বাস্তবসম্মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নায়েব সালারদের ডেকে পাঠান। তারা জমা হলে তাদের সামনে উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং সকলকে জানান যে, বনূ হানীফার এক সর্দার-মুযাআ বিন মুরারাহ-সন্ধির প্রস্তাব পেশ করছে।

"আসল ফিৎনা শেষ"—হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন—"মুসাইলামার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বনূ হানীফার মনোবল ভেঙ্গে গেছে। দুশমনকে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থন কিংবা সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে এখনই ইয়ামামার কেল্লা অবরোধ করাকে আমি ভাল মনে করছি।"

"কেবল ইয়ামামা নয়"—হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বলেন—"বনূ হানীফা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ছোট ছোট কেল্লায় আত্মগোপন করেছে। প্রথমে তাদের বন্দী করা জরুরী। এরপরে সন্ধির আলোচনায় বসা যেতে পারে।"

"সন্ধির শর্তাবলী অবশ্যই আমাদের হতে হবে"—হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন।

"সৈন্যদের দৈহিক নাজুক অবস্থার কথা তোমরা ভেবেছ কি?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"শহীদ এবং আহত সৈন্যের গণনা এখনও চলছে। খোদার কসম! এ পর্যন্ত কোন যুদ্ধ আমাদের এত রক্ত পান করেনি, যা এ যুদ্ধ পান করল এবং হয়ত সামনে আরও রক্ত দিতে হতে পারে।...এটা কি ভাল হয় না যে, পরাজিত শত্রুরা যারা এখানে ওখানে লুকিয়ে আছে তাদের খুঁজে বন্দী করা হোক, যাতে তারা ইয়ামামার কেল্লায় গিয়ে আমাদের মোকাবিলা করার সুযোগ না পায়?"

"অবশ্যই এটা যথোচিত প্রস্তাব"—হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন—"তাদের বন্দী করতে পারলে সন্ধিরও বিশেষ কোন যৌক্তিকতা থাকবে না।"

"মুযাআ দাবী করছে যে, যাদের সাথে আমাদের লড়াই হয়েছে তাদের চেয়ে আরো বেশী সৈন্য নাকি ইয়ামামার অভ্যন্তরে বিদ্যমান।"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তোমরা আমার এই কথা সত্য বলে মনে কর যে, আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত-শ্রান্ত; লড়াইয়ের উপযুক্ত নেই? তোমরা আরো দেখেছ, আমাদের মুজাহিদরা ক্লান্তিতে এতই ভেঙ্গে পড়েছে যে, তারা যেখানেই জায়গা পাচ্ছে সেখানেই বসে পড়ছে এবং গভীর নিদ্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের রিজার্ভ কোন বাহিনীও নেই। সৈন্য চেয়ে পাঠালেও তাদের আসতে অনেক দিন লেগে যাবে। ইতোমধ্যে শত্রুপক্ষ পুরোদমে সুসংগঠিত ও ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। ফলে তাদের মানসিকতায় আমরা যে চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি তা আর বাকী থাকবে না। তারা নয়া শক্তিতে ঘুড়ে দাঁড়াতে পারে।"

"ইবনে ওলীদ!" হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন—"আপনি নিজেও হয়ত এ ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করেছেন।"

"হ্যাঁ, ইবনে উমর!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন—"আমার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে এখানে ওখানে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের বন্দী করা হবে এরপর গিয়ে আমরা ইয়ামামা কেল্লা অবরোধ করব। এর মধ্যে মুযাআ ইয়ামামায় গিয়ে অন্যান্য নেতাদের সাথে সন্ধিব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবে। সন্ধির মধ্যে এই শর্ত অবশ্যই থাকবে যে, বনূ হানীফা পরাজয় স্বীকার করে আমাদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবে।"

"এটাই ভালো।" হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন।

"আমার কাছেও এ প্রস্তাব যথোচিত মনে হয়।" হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন—"তাহলে এ পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ এখনই শুরু করে দাও।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"সৈন্যদের এদিক-ওদিক পাঠিয়ে দিয়ে বল, বনূ হানীফার

পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা যাকেই যেখানে দেখবে বন্দী করে নিয়ে আসবে।"

বিভিন্ন প্লাটুন চতুর্দিকে পাঠিয়ে হযরত খালিদ (রা.) মুযাআকে নিজের সামনে এনে বসান।

"ইবনে মুরারাহ!" হযরত খালিদ (রা.) মুযাআকে বলেন—"তোমার উপর আমার আস্থা আছে। আর আমি তোমাকে এ কাজের যোগ্যও মনে করি। যাও, অন্যান্য নেতাদের গিয়ে বল, আমরা সন্ধির জন্য প্রস্তুত। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাদের হাতিয়ার পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে।"

"আমি এই শর্তের উপর সন্ধির করাতে চেষ্টা করব।" মুযাআ বলে—কিন্তু ইবনে ওলীদ! নিজের বাহিনীর নাজুক অবস্থার কথা চিন্তা করুন।"

"অতিরিক্ত রক্তপাত থেকে আমি দূরে থাকতে চাই।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তুমি কি চাওনা, আমাদের এবং তোমাদের যারা এখনও জীবিত আছে তারা জীবিত থাকুক? নিজ গোত্রে গিয়ে দেখ, আজ কত হাজার বধূ বিধবা এবং কত হাজার সন্তান ইয়াতিম হয়েছে এবং এটাও মাথায় রেখ যে, বনূ হানীফার কত মহিলা আমাদের বাদী হতে চলেছে।"

সে যুগের পাণ্ডুলিপি হতে জানা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর এই কথা শুনে মুযাআর ঠোঁটে এমন মুচকি হাসি খেলে যায়, যার মধ্যে ঠাট্টা কিংবা বিদ্রূপের আভাস ছিল। সে আর কথা বাড়ায় না। ইয়ামামায় যেতে উঠে দাঁড়ায়।

মুযাআ বলে—"আমি তাহলে চলি। ইবনে ওলীদ! আপনার অভিলাষ পূরণ করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

হযরত খালিদ (রা.) মুযাআকে বিদায় দিয়ে নিজের তাঁবুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি পথিমধ্যে লাশ এবং তাঁবু নিরীক্ষণ করতে করতে চলছেন। লায়লা দূর থেকে হযরত খালিদ (রা.)-কে একা দেখে দৌড়ে চলে আসেন।

"আপনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন?" লায়লা হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে জানতে চান।

হযরত খালিদ (রা.) তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, তিনি কোন উদ্দেশ্যে মুযাআকে ছেড়ে দিয়েছেন।

লায়লা বলেন—"ইবনে ওলীদ! এত মানুষের হত্যার দায়-দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে? এক সাথে এত লাশ আমি ইতোপূর্বে দেখিনি।"

হযরত খালিদ (রা.) গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন—"পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত মানুষের মাঝে ব্যক্তি হীনস্বার্থ হাসিলের মানসিকতা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত মানুষের রক্ত এভাবে ঝরতেই থাকবে। আমি নিজেও একত্রে এত লাশ

দেখিনি। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর চেয়েও অধিক লাশ দেখবে। সত্য মিথ্যার সংঘর্ষ চলতেই থাকবে।...আমি এ জন্যই সন্ধির চেষ্টা করছি। যেন আর রক্তপাতের ঘটনা না ঘটে।...তুমি আর সামনে এগিয়ো না। সামনের দৃশ্য তুমি বরদাশত করতে পারবে না।"

ইতোমধ্যে আকাশের বুক চিরে শকুনের পাল বিমানের মত নেমে এসে লাশের দেহ খাবলি দিয়ে খেতে শুরু করে। কতক মুসলমান লাশের স্তূপের মাঝে আহত সাথীদের তল্লাশী ও উদ্ধার কাজ করছিল। আহতদের উদ্ধার কারে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বাকী সৈন্যরা বনূ হানীফার লুকানো লোকদের গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল।

রাতে হযরত খালিদ (রা.) সংবাদ পেতে থাকেন যে, বনূ হানীফার লোকদের আনা হচ্ছে। অনেকের সাথে স্ত্রী-সন্তানও ছিল। হযরত খালিদ (রা.) মহিলা এবং বাচ্চাদেরকে ঠাণ্ডা ও ক্ষুধা হতে রক্ষা করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু পূর্বেই তাঁবু লুণ্ঠনের শিকার হওয়ায় সেখানে খাদ্যের মারাত্মক সংকট ছিল। হযরত খালিদ (রা.) বন্দী নারী ও শিশুদের উদরপূর্তি করার এবং নিজেদের উপবাস থাকার নির্দেশ দেন।

খাদ্য সংকট সাময়িকভাবে কাটিয়ে উঠতে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় যে, শহীদ মুজাহিদদের দেহের সাথে বাঁধা খেজুর ইত্যাদির থলে খুলে এনে তা দ্বারা বন্দী নারী-শিশুদের আপ্যায়ন করবে। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক সৈন্য পানাহারের হাল্কা ব্যবস্থা সাথে রাখতেন।

পর প্রভাতে মুযাআ ইয়ামামা থেকে ফিরে আসে এবং সোজা হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে গিয়ে হাজির হয়।

হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান, "কি সংবাদ নিয়ে এলে ইবনে মুরারাহ!"

মুযাআ জবাবে বলে, "খবর মন্দ নয়। কিন্তু তা হয়ত আপনার মনঃপুত হবে না।...বনূ হানীফা পূর্বোক্ত শর্তে সন্ধি করতে প্রস্তুত নয়। তারা আপনাদের গোলামী করতে রাজি নয়।"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "খোদার কসম! আমি তাদেরকে আমার গোলাম বানাতে চাই না। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর অনুসারী। আমি তাদেরকে এই সত্য রাসূল (সা.)-এর আকীদা-বিশ্বাসের গোলাম বানাতে চাই।"

মুযাআ বলে, "তারা এ শর্তও মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এ কথাও বিবেচনায় রাখবেন যে, আপনার সৈন্য মুষ্টিমেয় বৈ নয়। আমি ইয়ামামায় ঢুকে সুসজ্জিত একটি বাহিনী দেখেছি, যারা আপনার এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে

দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। ইয়ামামায় গিয়ে অবরোধ করার মত বোকামী করবেন না। তাহলে আস্ত ফিরবেন না। আবেগ ছেড়ে বাস্তবে আসুন। বিচক্ষণতার পরিচয় দিন। শর্ত নমনীয় করুন। আমি বনূ হানীফাকে অনেকটা ম্যানেজ করে ফেলেছি। সেখানকার প্রতিটি সৈন্যের চোখে প্রতিশোধের রক্ত টগবগ করছে।"

হযরত খালিদ (রা.) গভীর চিন্তায় ডুবে যান। মুযাআ তাকে নতুন কোন কথা বলে না। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও দেখেছিলেন যে, তার বাহিনীর যারা বর্তমানে বেঁচে আছে তারা যুদ্ধের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। তাদের যথেষ্ট আরামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা রাতভর লুকিয়ে থাকা শত্রুদের অনুসন্ধান এবং বন্দী করতে থাকে। দীর্ঘ পরিশ্রম আর অনিদ্রায় রাত যাপনের দরুণ সকালে মুজাহিদদের মাথা রীতিমত ঢুলতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) গভীর চিন্তা হতে মাথা উঠিয়ে বলেন—"ইবনে মুরারাহ" তোমার হয়ত জানা নেই, যে সমস্ত নেতা এই যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের কাছ থেকে জেনে নিও যে, বনূ হানীফার কত অর্থ-সম্পদ আমাদের হস্তগত হয়েছে এবং কত বাগ-বাগিচা ও কয়েদী আমাদের হাতে বন্দী। ফিরে যাও এবং ঐ নেতাদের গিয়ে বল, মুসলমানরা অর্ধেক মালে গনিমত, অর্ধেক বাগ-বাগিচা এবং অর্ধেক বন্দী ফিরিয়ে দিবে। তাদেরকে বুঝাবে, গোয়ার্তুমি করে যেন ইয়ামামা ও তার আশপাশের অঞ্চলকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়।"

ইবনে মুরারাহ চলে যায়। এরই মধ্যে ধৃত কয়েদীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

মুযাআ সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফিরে এসে জানায় যে, বনূ হানীফার কোন সর্দার মুসলমানদের শর্ত মানতে রাজি নয়। মুযাআ এটাও উল্লেখ করে যে, বনূ হানীফা তাদের পরাজয় ও হাজার হাজার নিহতের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হযরত খালিদ (রা.) ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বলেন—"আমার কথা কান খুলে শোন ইবনে মুরারাহ! যদি বনূ হানীফা এটা মনে করে থাকে যে, সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে আমরা ভীত হয়ে পড়ব, তবে তাদের গিয়ে বল, মুসলমান জানের বাজী দিবে তবুও তোমাদের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিবে না।"

মুযাআ বলে—"ক্রোধে ফেটে পড়বেন না। জনাব! আমাদের থেকে লব্ধ মালে গনিমত, বাগ-বাগিচা এবং কয়েদীদের এক-তৃতীয়াংশ আপনারা রাখুন আর বাদ বাকী আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করে ফেলুন। সন্ধিপত্র অবশ্যই লিখিত হতে হবে।"

হযরত খালিদ (রা.) পুনরায় চিন্তার জগতে চলে যান।

হযরত খালিদ (রা.)-কে গভীর চিন্তামগ্ন দেখে তাঁকে আরো প্রভাবিত করতে মুযাআ নড়েচড়ে বসে এবং সন্ধির পেছনে তার অবদানের কথা তুলে ধরে।

মুযাআ বলে—"আমি আপনাকে আরেকবার সতর্ক করছি ওলীদের পুত্র! এটা বলতে আপত্তি নেই যে, বনূ হানীফাকে সন্ধিতে রাজী করানোর কৃতিত্ব আমারই। এর জন্য তাদের অগণিত অভিসম্পাত আর অভিশাপ আমাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। তারা আমাকে গাদ্দারও বলেছে। তারা বলছে, তুমি মুসলমানদের থেকে অর্থ খেয়ে আমাদেরকে তাদের গোলাম বানাতে চাও। তারা আরও বলে, আমাদের সংখ্যা কম হলেও আমরা সন্ধি করতাম না। যুদ্ধ সামগ্রী, খাদ্য কোন কিছুরই আমাদের কমতি নেই। কমতি থেকে থাকলে তা মুসলানদেরই আছে। তারা বলছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মাঝে মুসলমানরা কতদিন পর্যন্ত অবরোধ করে বসে থাকবে? রাতের বরফ পড়া শীতে তারা খোলা আকাশের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারবে না। তারা এটাও জানে যে, আপনার ক্ষুদ্র বাহিনীর নিকট রাত যাপনের তাঁবুও নেই।...ভাবুন, গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করুন! আমার কথায় আপনার সন্দেহ হলে একটু এগিয়ে গিয়ে ইয়ামামার প্রাচীরের উপর দিয়ে একটিবার নজর বুলান। সেখানে দু'টি দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখতে পাবেন। একটি হলো কেল্লার প্রাচীর। আর দ্বিতীয়টি হলো ঐ প্রাচীরের উপরে মানব দেহের তৈরী আরেকটি প্রাচীর।"

এটা ঠিক যে, হযরত খালিদ (রা.) নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে পুরো অবগত ছিলেন। কিন্তু তাই বলে শত্রুর প্রতিটি শর্ত তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি তাঁবু হতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। সহ সেনাপতিগণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে তারা জানতে চান যে, সন্ধির আলোচনা কতদূর গড়ালো!

হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "আমর সাথে এস।"

সেনাপতিগণ হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে রওয়ানা হন। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে ব্রিফিং দিতে থাকেন এবং মুযাআ সর্বশেষে সন্ধির যে শর্ত উল্লেখ করেছে তাও তাদেরকে অবহিত করেন। তারা ইয়ামামা অভিমুখে চলতে থাকেন। এমন স্থানে গিয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়েন যেখান থেকে ইয়ামামা শহরের প্রাচীর দেখা যাচ্ছিল। তারা দেখতে পান যে, সমগ্র প্রাচীর সৈন্যে সুসজ্জিত। তারা নিশ্চিত হয়ে যান যে, শহর প্রাচীরের উপরে আরেকটি মানব প্রাচীর আছে বলে মুযাআ যে তথ্য দিয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। প্রাচীরের এই অবস্থা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, শহরের অভ্যন্তরে বিপুল সৈন্য রয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) অন্যান্য সেনাপতিদের লক্ষ্য করে বলেন—"আমার ধারণা, এমতাবস্থায় শহর অবরোধ করলে আমরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হব। প্রাচীরের উপরে যাদের দেখলাম তাদের তীর আমাদেরকে প্রাচীরের ধারে-কাছে

পৌঁছতে দিবে না। ব্যাপক মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়ার জন্য এত লোক আমাদের নেই।"

এক সেনাপতি বলেন—"আমি সন্ধির পক্ষেই রায় দিব।"

আরেক সেনাপতি বলেন, "যে ফিৎনার মূলোৎপাটন করতে আমরা এসেছিলাম তা চিরতরে খতম হয়ে গেছে। এখন আমরা সন্ধি করলে কে আমাদের সম্মুখে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলবে?"

হযরত খালিদ (রা.) অন্যান্য সেনাপতিদের সাথে মতবিনিময় করে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসেন এবং মুযাআকে জানান যে, তিনি সন্ধির জন্য প্রস্তুত। তৎক্ষণাৎ সন্ধিনামা লেখা হয়। এতে বনূ হানীফার পক্ষ হতে মুযাআ বিন মুরারাহ এবং খেলাফতের পক্ষ হতে হযরত খালিদ (রা.) সই করেন। এ সন্ধির একটি পয়েন্ট এই ছিল যে, ইয়ামামায় কোন লোককে যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে পারবে না।

মুযাআ সন্ধিপত্র চূড়ান্ত করে ফিরে যায়। ঐ দিনই মুযাআ ইয়ামামার দরজা খুলে দেয় এবং হযরত খালিদ (রা.)-কে শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হয়।

হযরত খালিদ (রা.) অধীনস্ত সেনাপতি ও কমান্ডারদের নিয়ে ইয়ামামার নগর প্রাচীরের প্রধান ফটকের সামনে এসে পৌঁছান। তারা প্রাচীরের উপরে নজর বুলান। সেখানে একটি সৈন্যও ছিল না। কেল্লাও ছিল জনশূন্য। হযরত খালিদ (রা.) ধারণা করছিলেন, মুযাআ তাদেরকে যে সৈন্যের ভয় বারবার দেখায়, তারা হয়ত কেল্লার অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু কেল্লায় পা দিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। সেখানে সৈন্যের কোন নাম-নিশানা ছিল না। ইতস্তত মহিলা, বাচ্চা এবং বৃদ্ধরা ছিলমাত্র। একজন যুবককেও দেখতে পাওয়া যায় না। মহিলারা নিজ নিজ বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কতক আশে-পাশের বাজারে বসা ছিল। অধিকাংশ মহিলা কাঁদছিল। তাদের কারো পিতা, কারো ভাই, কারো পুত্র, কারো স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) মুযাআকে জিজ্ঞাসা করেন—"সৈন্যরা কোথায় গেল?"

বিভিন্ন দরজা ও ঘরের ছাদে অসহায়ভাবে দাঁড়ানো মহিলাদের প্রতি ইশারা করে মুযাআ বলে—"আপনি সৈন্যদের দেখতে পারছেন জনাব খালিদ! এরাই ঐ সৈন্য যারা তীর-কামান আর বর্শায় সুসজ্জিত হয়ে প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়েছিল।"

হযরত খালিদ (রা.) বিস্মিত হয়ে বলেন—"এই নারীরা?"

মুযাআ বলে—"হ্যাঁ, জনাব খালিদ! শহরে সৈন্য বলতে কেউ নেই। এখানে কেবল যুদ্ধাক্ষম বৃদ্ধ, নারী আর শিশুরা রয়েছে।"

হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান—"এরা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত?" নারীরা প্রতিরোধে নেমে আসত?"

মুযাআ বলে—"না ইবনে ওলীদ! এটা আমার একটি চাল ছিল মাত্র। শহরের সকল পুরুষ মূল লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে চলে গিয়েছিল। শহরে যুবক বলতে কেউ ছিল না। আমি নিজের গোত্রকে কৌশলে বাঁচাতে চেয়েছি মাত্র। আমিই সকল নারী, বৃদ্ধ এবং বালকদের বর্মাচ্ছাদিত এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিয়েছিলাম। অতঃপর তাদের হাতে তীর-তূণীর এবং বর্শা দিয়ে প্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম। আমি নিজে বাইরে গিয়ে তাদের কৃত্রিম সৈন্যের অভিনয় দেখেছিলাম। খোদার কসম ইবনে ওলীদ! আমি নিজেও ধরতে পারছিলাম না যে, এরা নারী, বৃদ্ধ এবং বালকের সমন্বয়ে গঠিত কৃত্রিম বাহিনী; বরং আমার চোখেও এদেরকে নিয়মিত সৈন্যের মত মনে হয়েছে। আমি এদের এভাবে প্রস্তুত করে আপনাকে এক নজর দেখার জন্য সুযোগ দিয়েছিলাম। যাতে আপনি আমার ফাঁদে পা দেন এবং আপনার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইয়ামামায় বাস্তবেই অনেক সৈন্য রয়েছে।...এরপর আমার পরিকল্পনা মত সবকিছু চলে। আপনি দেখে শুনে এবং যাচাই করে আমার ফাঁদে পা দিলেন।"

হযরত খালিদ (রা.) ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি মুযাআকে এই চরম প্রতারণার সমুচিত শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু যে চুক্তিপত্রে তিনি একবার স্বাক্ষর করেছেন তার কোন শর্ত ভঙ্গ করতে তিনি রাজি ছিলেন না।

হযরত খালিদ (রা.) মুযাআকে বলেন—"খোদার কসম! তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ।"

মুযাআ বলে—"আমি আপনাকে ধোঁকা দিতে পারি কিন্তু আমার গোত্রের সাথে গাদ্দারী করতে পারি না। আপনার তলোয়ার থেকে তাদের বাঁচানই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি তাদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"তোমার কপাল ভাল যে আমি মুসলমান। ইসলাম কৃত চুক্তি ভঙ্গের অনুমতি দেয় না। সন্ধিপত্রে আমার স্বাক্ষর হয়ে গেছে। নতুবা আমি তোমার গোত্রের এই সকল নারীকে বাদীতে পরিণত করতাম।"

মুযাআ বলে—"আমার জানা ছিল যে, সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরের পর আপনি এমনটি করবেন না।"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"কিন্তু একটি কথা মনে রেখ ইবনে মুরারাহ! আমার সন্ধি কেবল ইয়ামামা শহরবাসীদের জন্য। আশ-পাশের অঞ্চলের লোক এর আওতাধীন নয়। ইয়ামামা শহরের কোন ব্যক্তিকে আমি যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দিয়ে হত্যা করব না ঠিকই কিন্তু ইয়ামামার বাইরে যাকে আমি হত্যার যোগ্য বলে মনে করব তার মস্তক ধরায় লুটাতে আমি সন্ধিপত্রের তোয়াক্কা করব না।

॥ বাইশ ॥

ধর্মান্তরিতের হেড কোয়ার্টার ছিল ইয়ামামায়। হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদ বাহিনীর বুলডোজার দিয়ে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলিস্যাৎ করে দেন। ভণ্ড নবীকে নিপাত করে তার মরদেহ শহরের অলি-গলিতে প্রদর্শন করান হয়। মুসাইলামার ভক্তদের বলা হয়, সত্যিকার অর্থে তোমাদের নবীর কাছে অলৌকিক শক্তি কিংবা মোজিযা থাকলে ৪০ হাজারেরও বেশী সৈন্যের এমন শোচনীয় পরাজয় মাত্র ১০ হাজার সৈন্যের হাতে হত না।

মুসলমানরা ইয়ামামার অলি-গলিতে ঘোষণা করতে থাকে—"বনূ হানীফা! নারীদের ভয় নেই। তাদেরকে বাদী বানানো হবে না। শহরের অভ্যন্তরের কোন পুরুষ, শিশু কিংবা নারীর উপর হাত তোলা হবে না। মুসাইলামা আস্ত ভণ্ড এবং প্রতারক ছিল। সে তোমাদেরকে ধোঁকার জালে বন্দী করে তোমাদের ঘর-বাড়ী আজ বিরান করে গেছে।"

ভয়, আতংক আর মৃত্যু ইয়ামামাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। মহিলারা শহর থেকে বাইরে বের হতে রীতিমত ভয় পাচ্ছিল। এ ভয় ও আতংক মুসলমানদের কারণে ছিল না। স্বজনদের বিভৎস লাশ চোখে পড়ার ভয়ে তারা আতংকিত ছিল। নগর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে তারা শহরের বাইরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল। চিল, শকুন আর নেকড়ে বাঘের ভয়ংকর আওয়াজ তারা শুনতে পাচ্ছিল। হিংস্র ও বন্যপ্রাণীগুলো রণাঙ্গনে পড়ে থাকা মৃত সৈন্যদের লাশ খাচ্ছিল।

ইয়ামামা ও তার আশে-পাশের অঞ্চলের লোকেরা এত বিপুল প্রাণহানির কথা ইতোপূর্বে কখনো শুনেনি এবং দেখেনি। এটা গযব নাযিল হওয়ার মত ছিল। ঘরে ঘরে শোক আর মাতম চলে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে সেজদাবনত হতে আকুলি-বিকুলি করছিল যিনি তাদের উপর এভাবে গযব নাযিল করেছেন। মুসলিম বাহিনীর মাঝে তখনও অনেক হাফেজ ও কারী সাহাবা ছিলেন। তারা লোকদেরকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে বুঝিয়ে দিতে থাকেন যে, তাদের বিনাশকারী গায়েবী শক্তির উৎস কি বা কোথায়?

ঐতিহাসিকদের অভিমত, বনূ হানীফার যারা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেছিল তাদের সংখ্যা ২০ হাজারের মত ছিল। তারা এদিক-ওদিক আত্মগোপন করার মাধ্যমে লাপাত্তা হয়ে যায়। মুসলমানরা খুঁজে খুঁজে তাদের ধরে আনতে থাকে। তারাও ছিল রীতিমত ভীত ও আতংকিত। অনেকে অনুতাপ এবং অনুশোচনায় দগ্ধও হতে থাকে। কেননা তারা এমন এক ভণ্ড নবীর হাতে বাইয়াত হয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যে তাদেরকে এই কথা বলে

প্রতারিত করেছিল যে, খোদা তাকে এমন এক শক্তি দান করেছেন যার ফলে বিজয় তাদেরই হবে আর মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বীনের তাবলীগ এবং ইসলামের ব্যাপক পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয় না তাদের। অধিকাংশই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

বনূ হানীফার নেতৃত্বের প্রশ্নে মুযাআ বিন মুরারা মুসাইলামার স্থলাভিষিক্ত ছিল। গোত্রের লোকদের গণহারে মুসলমান হতে দেখে সে এটা ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর অন্তরে তার প্রতি যে অসন্তুষ্টি রয়েছে এতে নিশ্চয় তার অবসান হবে।

বনূ হানীফার লোকেরা বানের ঢলের মত হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে বাইয়াত হতে আসতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) তাদের মধ্য হতে নেতৃস্থানীয় কিছু লোকের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করেন এবং খলিফাতুল মুসলিমীনের হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্য তাদের মদীনায় প্রেরণ করেন।

এ যুদ্ধে হযরত খালিদ (রা.)-কে চড়া মূল্য দিতে হয়। প্রাচীন নথিপত্র এবং অন্যান্য সূত্রের বরাতে অনুমিত হয় যে, বিশাল এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভের আশা হযরত খালিদ (রা.)-এর অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তিনি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার উপর আস্থা এবং নিজের সমর যোগ্যতার বলে লড়েছিলেন। তাঁর মেরুদণ্ড ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

ইয়ামামা যুদ্ধের ভয়াবহতার অনুমান এভাবে করা যেতে পারে যে, এ যুদ্ধে বনূ হানীফার ২১ হাজার সৈন্য প্রাণ হারিয়েছিল। আহতদের সংখ্যা ছিল গণনার বাইরে। এর বিপরীতে মুজাহিদ বাহিনীর শহীদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২ শত। শহীদদের মধ্যে ৩০০ ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেয।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইয়ামামা যুদ্ধে ৩০০ হাফেযে কুরআন সাহাবীর শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। প্রতি রণাঙ্গনে এভাবে হাফেয সাহাবা শহীদ হতে থাকলে পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যৎ কি হবে—এই প্রশ্ন তাঁকে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। তিনি লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে কাতেবে ওহী হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-এর কাঁধে এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি পবিত্র কুরআনের অরক্ষিত ও বিক্ষিপ্ত মূল কপি এক ফাইলে জমা করে সংরক্ষণ করবেন। ভলিউম আকারে আজ যে কুরআন আমাদের কাছে শোভা পাচ্ছে, তা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঐ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ও পরবর্তিতে হযরত উসমান (রা.)-এর কৃতিত্ব ও অবদানের ফল।

ইয়ামামা যুদ্ধের পর হযরত খালিদ (রা.) ভীষণ ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি লোপ পেয়েছিল প্রায়। লায়লা তাঁর অবসন্ন শরীরে শক্তি যোগাতে চেষ্টা করেন। তাঁকে প্রবোধ দেন। ভেঙ্গে পড়তে দেন না। তাঁর মানসিক শক্তি জাগিয়ে তোলেন। অকল্পনীয় প্রাণহানিতে তিনি সাময়িকভাবে মুষড়ে পড়লেও দ্রুত নিজেকে সামলে নেন। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ইতিপূর্বের কোন যুদ্ধে মুসলমানদের এত প্রাণহানি ঘটেনি। কেবল এই একটি যুদ্ধই তাদের ১ হাজার ২ শত সাথীকে কেড়ে নেয়। সাথীদের এহেন ব্যাপক শাহাদাতে অবশিষ্ট মুজাহিদগণের উপর দুঃখের পাহাড় নেমে আসে। হযরত খালিদ (রা.) শোকাহত হলেও দ্রুত সে শোক কাটিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। অন্যদের মত শোকে পাথর হয়ে গেলে কিংবা বিলাপচারিতায় নিজেকে হারিয়ে ফেললে নেতৃত্ব দান অব্যাহত রাখতে পারতেন না। অথচ তাঁর সামনে ইরাক এবং সিরিয়া বিজয়ের হাতছানি ছিল। ধর্মান্তরিতের ফিৎনার মূলোৎপাটন করে দূর দিগন্তে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে কুদরত তাঁকে আহ্বান করছিল। ফলে তিনি নিজেকে শোকে পাথর হতে দেননি। দুঃখ-বেদনা হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

একদিন লায়লা হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন—"ওলীদের পুত্র! এই মহান বিজয়ে আমি আপনাকে একটি উপঢৌকন দিতে চাই।"

হযরত খালিদ (রা.) বলেন—"আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কি আমার জন্য যথেষ্ট নয়?"

লায়লা বলেন—"সেটা তো আপনি পেয়েই গেছেন। আপনি আল্লাহ্র তরবারী। আমি পার্থিব একটি উপঢৌকনের কথা বলছিলাম। আপনি আসলে ভীষণ ক্লান্ত।"

হযরত খালিদ (রা.) সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন—"তা সে উপঢৌকন কি জানতে পারি?"

লায়লা বলেন—"মুযাআ বিন মুরারার কন্যা। আপনি তাকে দেখেননি। আমি তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। অপূর্ব সুন্দরী। ইয়ামামার হীরা। সে আপনাকে ভালবাসে। সে আপনার প্রশংসা করে বলে, হযরত খালিদ (রা.) একজন বড় মাপের মানুষ। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েও ঘোষণা করেছেন যে, কোন নারীকে বাঁদী বানানো হবে না। অথচ এই নারীরাই তাকে ধোঁকা দিয়েছিল।"

তৎকালীন আরবে সতীন কালচার ছিল না। একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা গর্বের বিষয় ছিল। স্ত্রীরাও স্বামীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে নিজেরাই সুন্দরী-রূপসী পাত্রী খুঁজে বিবাহ করিয়ে দিত। তাদের মধ্যে বর্তমানের সংকীর্ণতার নাম-গন্ধও ছিল না। লায়লার প্ররোচনা ও পীড়াপীড়িতে হযরত

খালিদ বিন ওলীদ (রা.) বিবাহ করতে রাজী হন। তিনি মুযাআ বিন মুরারার কাছে গিয়ে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন যে, তিনি তার কন্যার পাণিপ্রার্থী। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর অতর্কিত এ প্রস্তাবে মুযাআ এত বিস্মিত হয় যে, সে নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করাতে পারে না। সে এটাকে কর্ণভ্রম কিংবা দিবাস্বপ্ন বলে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পরক্ষণে হযরত খালিদ (রা.) এর উপর চোখ পড়তে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। হযরত খালিদ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে কি যেন বলছেন। কিন্তু কি বলছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় সে।

মুযাআ জিজ্ঞাসা করে-"কি বললেন জনাব খালিদ!"

হযরত খালিদ (রা.) পূর্বের প্রস্তাব আওড়ান-"তোমার কন্যাকে আমি বিবাহ করতে চাই।"

মুযাআ বলে—"এতে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের উভয়ের প্রতি রুষ্ট হবেন না?"

মুযাআ প্রথমে আপত্তি করলেও হযরত খালিদ (রা.)-এর আগ্রহ দেখে তিনি রাজি হয়ে যান। অতঃপর এক শুভক্ষণে মুযাআর যুবতী রূপসী কন্যার সাথে হযরত খালিদ (রা.)-এর শুভ পরিণয় হয়ে যায়। এই নতুন বিবাহের খবর মদীনায় পৌছলে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর বরাবর পত্র লিখেন "

"উহ্ ওলীদের পুত্র! তোমার হলোটা কি? তুমি এ কি শুরু করলে? একের পর এক বিবাহ করে যাচ্ছ। অথচ তোমার তাঁবুর বাইরেই তো বারশ মুসলমানের রক্ত ঝরেছে। শহীদদের রক্তও তুমি শুকাতে দিলে না।"

হযরত খালিদ (রা.) পত্র পড়েই মন্তব্য করেন—"এটা হযরত উমর (রা.)-এর কাজ।"

মোটকথা, ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায় না। পত্রযোগে ভর্ৎসনার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে এ পয়গামও প্রেরণ করেছিলেন যে, তিনি ইয়ামামাতেই অবস্থান করবেন এবং হেড কোয়ার্টার থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবেন। হযরত খালিদ (রা.) খলিফার নির্দেশ মোতাবেক মুযাআর কন্যা এবং লায়লাকে নিয়ে ইয়ামামার নিকটবর্তী ওবার উপত্যকায় যান এবং সেখানে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকেন। দীর্ঘ দু'মাস পরে তিনি পরবর্তী নির্দেশ পান।

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ। ১১ হিজরীর জিলকদ মাসের শেষ লগ্ন। এ সময়ে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে এক বিশেষ

সাক্ষাতে মদীনায় এক ব্যক্তির আগমন হয়। তিনি নিজেকে মুসান্না বিন হারেস নামে পরিচয় প্রদান করেন। খোদ খলীফা এবং মদীনাবাসীর নিকট তিনি অতি সাধারণ বরং একজন অপরিচিত বলে প্রতিপন্ন হন। এ জাতীয় লোক কোন বাদশাহর দরবারে গেলে নিঃসন্দেহে তাকে সেখান থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হত। কিন্তু মহামতি হযরত আবু বকর (রা.) কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাধারণ বাদশা ছিলেন না, বরং তিনি দোজাহানের সম্রাট রাসূল (সা.)-এর খলীফা ছিলেন, যার দ্বার যে কোন ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকত।

খলীফার দরবারে প্রবেশের সময় আগন্তুকের চেহারায় ক্লান্তি আর বিনিদ্র রজনীর গভীর ছাঁপ ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ ধুলিময় এবং তিনি নিজ শক্তিতে কথাও বলতে পারছিলেন না।

হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন—"এই ভিনদেশী অতিথির পরিচয় কেউ বলতে পারে কি?"

"মুসান্না বিন হারেস নামে নিজেকে পরিচয় দানকারী কোন সাধারণ ব্যক্তিত্ব নন"—হযরত কায়েস বিন আসেম আল মুনকিরী (রা.) জবাবে বলেন— "আমিরুল মুমিনীন! লোকটির এখানে আসার পেছনে কোন দুরভিসন্ধি নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে সে ইতোমধ্যে যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছে তা রীতিমত ঈর্ষণীয়। ইরাকের পারস্য সেনাপতি হুরমুজ এবং সর্বত্র খ্যাতি অর্জনকারী তার সৈন্যরা পর্যন্ত এই মুসান্না ইবনুল হারিস এর নাম শুনে কেঁপে ওঠে।"

আরেকজন বলেন—"আমীরুল মুমিনীন! আপনার ভিনদেশী মেহমান বাহরাইনের বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের একজন সম্মানিত সদস্য। যারা ইসলাম গ্রহণ করে কুফর ও মুরতাদের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাঝেও ইসলামের চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছেন ইনি তাদের অন্যতম। আমাদের সেনাপতি হযরত আলা ইবনে হাযরমী (রা.)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকায় মুরতাদদের বিরুদ্ধে অসংখ্য রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন।"

আগন্তুকের উচ্চ পরিচয় পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেহারা আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। এবার তিনি হযরত মুসান্না বিন হারেস (রা.)-এর প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকান। এ দৃষ্টি ছিল সম্মান নিংড়িত শ্রদ্ধা বিজড়িত। সাথে সাথে তাঁর চোখে ভেসে ওঠে আরব মুসলমানের ঐ সমস্ত গোত্র যারা এক সময় ইরানীদের প্রজা ছিল। ইরাক অঞ্চল জুড়ে ছিল এদের আবাদ-বসতি। বনূ লাখাম, বনূ তাগাল্লুব, বনূ আয়াদ, বনূ নাম্বার এবং বনূ শায়বান ছিল তাদের অন্যতম। এক তথ্য অনুযায়ী তারা আদি আরব ছিল। এক যুদ্ধে ইরানীরা তাদেরকে যুদ্ধবন্দী

করে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে দজলা এবং ফোরাতের মোহনাবর্তী এলাকায় পুনর্বাসিত করে।

তারা ইরানীদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হলেও নিজেদের সনাতন আকীদা-বিশ্বাস এই নতুন আবাসেও আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। আরব ভূখণ্ডে ইসলামের জাগরণ শুরু হলে তারাও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যায়। ইরাক থেকে সায্যাহ্ এর মত লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী তুললে এই আরব প্রজারা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তারা এ ফিৎনার মোকাবিলায় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ইসলাম রক্ষায় তারা নিজ উদ্যোগে পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করে।

এদিকে ক্রমে মুসলিম বাহিনী এমন এক সমর শক্তিতে রূপ নেয় যে, তাদের সামনে মুরতাদ এবং কুফরীবাদের সম্মিলিত শক্তিও টিকে থাকতে পারে না। রণাঙ্গনের বাইরেও মুসলমানরা যে অমায়িক আচরণ ও কালজয়ী আদর্শ পেশ করত তা যে কোন ব্যক্তির অন্তরে রেখাপাত এবং গভীর প্রভাব সৃষ্টি করত। এভাবে মুসলমানরা দিকে দিকে সমর ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা অগ্নিপূজারী তৎকালীন পরাশক্তি ইরানীদের বিরুদ্ধে লড়ার উপযুক্ত হয়েছিল না। তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষ শক্তিধর এক বিশাল সাম্রাজ্য ছিল ইরান। এ সাম্রাজ্য এতই বিস্তীর্ণ ছিল যে, তার আয়তন বা সীমানার কোন হিসাব ছিল না। সেনা সংখ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আধিক্যে তারা সমকালীন পরাশক্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। ইরান শক্তির মোকাবিলা করার মত তৎকালে কেবল রোম শক্তিই ছিল। রোম শক্তির সাথে নিয়মিত সংঘর্ষের ফলে শেষের দিকে এসে ইরান শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল।

বিপুল সমর শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবু বকর (রা.) ইরান সাম্রাজ্যে রাসূল (সা.)-এর পয়গাম পৌছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ইরানীরা ইসলাম গ্রহণে কেবল অপ্রস্তুতই ছিল না; বরং তারা ইসলাম নিয়ে রীতিমত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মুসলিম কোন দূত তাদের শাসনাধীন কোন এলাকার গভর্নরের কার্যালয়ে প্রবেশ করলে তাকে অপমান করত এবং কাউকে বন্দীও করে রাখত।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাধারাই ভিন্ন প্রকৃতির। বড় বৈচিত্র্যময় তাদের স্বভাব। তাদের চিন্তা-ভাবনার গতি সমঝোতা ও পরিস্থিতি কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। যে কোন মুহূর্তে তারা সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে। কিন্তু আপামর জনতার চিন্তাজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জযবা-অনুপ্রেরণা। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির বিরুদ্ধেও তারা বুক টান-টান করে দাঁড়িয়ে যায়।

নাঙ্গা তলোয়ার

(৪র্থ খণ্ড)

। এক ।

সে সময় ইরাক ছিল ইরানের একটি প্রদেশ। প্রখ্যাত যুদ্ধবাজ এবং নির্ভীক সেনাপতি হুরমুজ ছিল তার গভর্নর বা শাসক। জালেম এবং দুশ্চিরিত্রবাজ হিসেবেও সে সমান কুখ্যাতি লাভ করেছিল। জুলুম এবং অভদ্রতার প্রবাদে পরিণত হয় তার নাম। সমাজে কেউ অভদ্রতা কিংবা অসদাচারণ করলে মানুষ তাকে এই বলে ভর্ৎসনা করত যে, "সে হুরমুজ থেকেও অভদ্র ও জঘন্য।"

দজলা এবং ফোরাতের মোহনায় পুনর্বাসিত সংখ্যালঘু মুসলমানরাই ছিল হুরমুজের অকথ্য নির্যাতনের করুণ শিকার। মুসলমান হওয়াটাই ছিল হুরমুজের দৃষ্টিতে তাদের অপরাধ। কোন ইরানীর হাতে কোন মুসলমান নিহত হওয়া কিংবা কোন মুসলিম নারীকে অপহরণ হুরমুজের কাছে কোন অপরাধই ছিল না। মুসলমানদের কষ্ট দিয়ে, সামান্য বাহানায় তাদের ঘর-বাড়ী লুট এবং জ্বালিয়ে দিয়ে খ্রিস্টানদের মত ইরানীরাও পৈশাচিক স্ফূর্তি করত। মুসলমানদের জীবন কাটত ভীতি আর আতংকের মধ্য দিয়ে।

মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার জমি স্বর্ণ প্রসব করত। তরি-তরকারী এবং ফল-মূল উৎপাদনে এলাকাটি বড়ই উর্বর ও উপযোগী ছিল।

সবুজের সমারোহ, বৈচিত্র্য ফুলের বাহার, ফলের মিষ্টি সুবাস, পাখিদের কলকাকলি, আকাশের নিলীমা, মৃদুমন্দ হাওয়া, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দজলার কলতান, ফোরাতের উর্মিমালা ছাড়াও প্রাকৃতিক অপূর্ব শোভার কারণে ৩০০ মাইল আয়তনের সেই এলাকাটি নয়নাভিরাম নৈসর্গিক একটি ভূখণ্ড ছিল। মানুষ রাজধানীতে বাস করলেও তাদের হৃদয়ে গাঁথা থাকত এই এলাকার ভূবনমোহিনী রূপ। তাই শাসকশ্রেণী সুযোগ পেলেই এই এলাকায় অবকাশ যাপন করতে আসত এবং দীর্ঘদিন তার মায়ায় কাটিয়ে দিত। আরাম-আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দময় জীবনযাপন করতে মুসলমানদের এখানে পুনর্বাসিত করা হয় নাই; বরং চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকাকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে তাদের এখানে রাখা হয়। তারা রাত-দিন কঠোর পরিশ্রম আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটির বুক চিরে সোনার ফসল ফলাত, তরি-তরকারি আর ফল-মূল উৎপাদন করত। কিন্তু এ ফসল তাদের বাড়ী-ঘরে যেত না। জীবিত থাকার জন্য যতটুকু না হলে নয় ঠিক ততটুকুই তারা লাভ করত মাত্র। অবশিষ্ট ফসলের সবই চলে যেত শাসকের ঘরে এবং ইরানী ফৌজের পেটে। মুসলমান চাষীদের জন্য দরিদ্রতা এবং ইরানীদের ঘৃণাই শুধু রয়ে যেত।

মুসলিম সংখ্যালঘুরা যুবতী কন্যাদেরকে গৃহে লুকিয়ে রাখত। কারণ, কোন ইরানী সৈন্যের দৃষ্টি যদি কোন মেয়ের উপর পড়ত আর তাকে তার ভাল লাগত তবে যে কোন বাহানা দিয়ে অথবা সে পরিবারের প্রতি কোন অপবাদ আরোপ

করে তাকে সাথে নিয়ে চলে যেত। কোন বাহানা ছাড়াই ইরানী সৈন্যরা মুসলিম যুবতীদের জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু গোলামীর জিঞ্জিরে শৃঙ্খলিত এবং নির্যাতনের পাত্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ ঠিকই জাগ্রত ছিল। প্রথম দিকে জোরপূর্বক অপহরণের ঘটনা ঘটতে থাকলে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে দু'তিন সৈন্যকে ধরে হত্যা করে ফেলে। কন্যা বাঁচাতে গিয়ে ফৌজ হত্যার মত গুরুতর অপরাধের জন্য তারা কঠিন শাস্তি র সম্মুখীন হলেও জোরপূর্বক অপহরণের প্রক্রিয়া এখানেই থেমে যায়।

অগ্নি উপাসক ইরান সম্রাট ফৌজদেরকে ষাঁড়ের মত পালত। প্রতিটি সৈন্য বর্মাচ্ছাদিত হত। মাথায় ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ এবং বাহুতে লোহার পোষাক এমনভাবে ফিট করত যে, বাহু নাড়াতে কোনরূপ অসুবিধা হত না। তাদের হাঁটুর নিম্নাংশও ভারী চামড়া অথবা অন্য কোন ধাতুর মাধ্যমে হেফাজত করত।

অস্ত্র-শস্ত্র ছিল বিপুল। প্রতিটি সৈন্যের কাছে একটি তলোয়ার, একটি বর্শা এবং একটি লৌহগদা অবশ্যই থাকত। লৌহগদা চালনায় ইরানীরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। এছাড়া প্রত্যেক সৈন্যের কাছে একটি ধনুক আর ৩০টি তীর সমৃদ্ধ একটি তূণীর থাকত। আয়েশী জীবন-যাপন, যথেচ্ছা পানাহার ও লুটতরাজের অবাধ অনুমতি ছিল তাদের। বীরত্ব এবং রণযোগ্যতায় তারা বাস্তবিকই প্রশংসার উপযুক্ত ছিল। তাদের দুর্বলতা বলতে যা ছিল তা হলো, তারা সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে বেশ পারঙ্গম ছিল এবং যুদ্ধও করত প্রাণপণে। কিন্তু এত যুদ্ধাস্ত্র সাথে থাকায় তারা স্বাচ্ছন্দে নড়াচড়া করতে পারত না। একটি ইউনিট কিংবা একটি বাহিনী তড়িৎ এক স্থান হতে অপর স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে তারা কাঙ্ক্ষিত সময়ে সেখানে পৌঁছতে পারত না। এত অস্ত্রপাতির বোঝা তাদেরকে অতি দ্রুত ক্লান্ত করে ফেলত। কিন্তু সৈন্য সংখ্যার বিপুলতার দরুণ তাদের এই দুর্বলতা ধরা পড়ত না।

দজলা এবং ফোরাতের মোহনার দক্ষিণে ইরাক এবং আরবের সীমান্তবর্তী এলাকা ছিল 'উবলা'। তৎকালে উবলা একটি বড় নগরী ছিল। এর আশেপাশের অঞ্চল অত্যন্ত শস্য-শ্যামল ও উর্বর ছিল। সেখানে সুন্দর-সুন্দর গাছপালা এবং আকর্ষণীয় পাহাড়ও ছিল। ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান এটা। আজও সেখানে বিধ্বস্ত ভবনের অংশ বিশেষ কালের ইতিহাস আগলে ধরে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ সমস্ত বিরান ধ্বংসাবশেষ নীরব ভাষায় ইতিহাস বর্ণনা করে শোনায়। প্রত্যেকটি ইতিহাস শিক্ষনীয় ছবকে ভরপুর।

যারা ভোগ-বিলাসকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং প্রজাদেরকে মানুষের কাতার থেকে বের করে দিয়েছিল এ এলাকায় সে সমস্ত জাতির ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের নিদর্শনও আছে। আল্লাহ্ তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে রাসূল প্রেরণ করলে তারা তাদেরকে বিদ্রূপের পাত্র বানায় এবং বলে, তুমি তো

আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। দুনিয়ায় তোমার কোন প্রতিপত্তি বা সামাজিক মর্যাদাও নেই। তাহলে কিভাবে তুমি আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হয়ে গেলে?

পরিশেষে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও ও ধ্বংস করেছেন যে, তাদের মহল আর বসতি এলাকা লণ্ডভণ্ড এবং ভগ্ন প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্‌পাক তাদের কথা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে এসেছে ঃ

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল... ।"**(সূরা মুমিন-৮২)**

"বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে।" **(সূরা নমল-৬৯)**

"তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে অযথা নিদর্শন স্থাপন করছ এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?" **(সূরা শোআরা-১২৮-১২৯)**

সেদিন তাদের অবাধ্যতার কারণে গযব নাযিল হওয়ায় তাদের যে প্রাসাদ ও মহল ভূতলে ধসে গিয়েছিল আজ সে সমস্ত জীর্ণ মহল ও বিধ্বস্ত স্মৃতিসৌধ জ্বলন্ত ইতিহাস হয়ে বের হচ্ছে।

তাদের পরেও অনেক অর্বাচীন সম্রাট এসেছে এবং একের এক ভগ্ন প্রাসাদ উপহার দিয়ে প্রস্থান করেছে। ড়াবেল প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভূখণ্ডে অতীতে আশুরী এসেছে, সামানী এসেছে। তারা দোর্দান্ত প্রতাপে রাজত্ব করে ইতিহাস হয়ে গেছে। বর্তমানে মদীনায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত চলাকালে দজলা এবং ফোরাতের এই অপরূপ নৈসর্গ ও ঐতিহ্যবাহী ভূখণ্ডে ইরানীদের একচ্ছত্র দাপট চলছিল। অগ্নি উপাসক এই অর্বাচীন জাতিও প্রাগুক্ত জাতিদের মত বিদ্যমান ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করতে থাকে। ক্ষণস্থায়ী দাপটে তাদের মাঝে অহমিকার সৃষ্টি হয়। প্রজাদের রীতিমত খোদা বনে যায়।

॥ দুই ॥

এক তরুণী স্বীয় বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করছিল—"বিনতে সাউদ! খুদ্দাম এখনও আসেনি?"

জোহরা বিনতে সাউদের চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

বান্ধবী জোহরাকে বলে—"তুমি বলেছিলে সে তোমাকে ধোঁকা দিবে না। আল্লাহ্ না করেন, সে যেন ঐ নরপিশাচ ইরানীর খপ্পরে আবার না পড়ে।"

জোহ্রা বিনতে সাউদ বলে–আল্লাহ্ পাক না করুন, সে নিশ্চয়ই আসবে।... চারদিন পার হয়ে গেছে।...ঐ ইরানীর সাথে যাওয়া আমার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব না। মৃত্যুকে বরণ করে নিব তবুও তাকে গ্রহণ করব না। খুদ্দাম আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না।"

বান্ধবী বলে–জোহ্রা! বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ইরানী কমান্ডারকে মেনে নেওয়াই কি সঙ্গত নয়? তোমার পরিবারের জন্যও এটা মঙ্গলজনক হবে। মূল সমস্যা যেটা তাহলো তোমার ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তন করতে হবে, তবে সারাটা জীবন কিন্তু বেশ আয়েশেই কাটিয়ে দিতে পারবে।"

জোহ্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলে–"আমি যে আল্লাহ্র পরিচয় পেয়েছি কেবল তারই ইবাদত করে যাব। অগ্নি আল্লাহ্তা'য়ালাই সৃষ্টি করেছেন। সে নিজে সৃষ্টি হয়ে আবার স্রষ্টা হয় কিভাবে? আমি আল্লাহ্র বর্তমানে অন্য কোনকিছুর পূজা করব না।"

"ভেবে দেখ জোহ্রা!" বান্ধবী বলে–তুমি স্বেচ্ছায় তাকে বরণ না করলে সে তোমাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাকে বাধা দেয়ার সাধ্য কারো নেই। শাহী ফৌজের কমান্ডার সে। তোমার পরিবারের শিশুদেরও পর্যন্ত সে বন্দী করাতে পারে। আমিও তো মুসলিম কন্যা। আমি আল্লাহ্রই ইবাদত করি এবং তাঁর নামেই শপথ করি। কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের কোন্ সাহায্যে এলেন? তুমি নিশ্চিত বলতে পার যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন?

"শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য না পেলে নিজের প্রাণ নিজে হরণ করব" জোহ্রা বলে– এবং আল্লাহকে বলব, এই নিন। আমার দেহে আপনি প্রাণ সংহার করে থাকলে তা ফিরিয়ে নিন।" এরপর অঝোর ধারায় তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

জোহ্রা তার মত এক সুন্দর নবযুবক খুদ্দাম বিন আসাদের প্রতি আসক্ত ছিল। খুদ্দামও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। তাদের বিবাহ হতে পারত কিন্তু শিমুর নামে এক ইরানী কমান্ডার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টি জোহ্রা বিনতে সাউদের উপর পড়েছে। সে তাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করে। শিমুর জোহ্রার পিতাকে বলেছে, সে চাইলে যে কোন সময় তার মেয়েকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে এমনটি করতে চায় না।

শিমুর বলেছে–"তোমার মেয়েকে মালে গণিমত হিসেবে নিয়ে যাব না। দু'ঘোড়া বিশিষ্ট গাড়ীতে করে নিয়ে যাব, যাতে বর বধূকে নিয়ে যায়। তুমি বুক ফুলিয়ে মানুষকে বলবে, তোমার কন্যা এক ইরানী কমান্ডারের স্ত্রী।"

"কিন্তু কমান্ডার সাহেব! সাধ্যানুযায়ী আপনার যত্ন খায়ের করা আমাদের কর্তব্য। মেয়ে আপনার বধূ হতে চাইলে আমরা বাধা দিব কেন? জোহ্রার পিতা বলে।

ইরানী কমান্ডার ঘৃণার দৃষ্টি হেনে স্বভাবজাত কণ্ঠে বলে–"তোমরা বর্বর আরব। কন্যা জীবিত গ্রোথিতকারী জাতি তোমরা। অথচ বলছ, মেয়ে তার নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজেই নিবে। বাহ্ ! চমৎকার। জরথুস্ত্রের শপথ! তোমার কন্যা যদি আমাকে বরণ না করে তবে তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে কুষ্ঠরোগী যেখানে আবদ্ধ থাকে সেখানে বন্দী করে রাখব।...দ্রুত সিদ্ধান্ত নাও। বেশী সময় তোমাকে দিব না বুড়ো!"

কমান্ডারের সাথে আরো তিন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তারা বিকট আওয়াজে অট্টহাসি হেসেছিল।

এক সেপাই তাকে ধাক্কা দিয়ে বলেছিল–"মদীনা অনেক দূর অপদার্থ বুড়ো! তোমার আমীরুল মুমিনীন তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না।"

জোহরার পিতা আর তার ভাই ভাল করেই জানত যে, ইরানের এক সামান্য সেপাইয়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তাদের নেই। আর এ তো এক কমান্ডার। বড় মাপের লোক। তারা এও জানত যে, শিমুর তাদের আদরের দুলালীকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে গেলেও তাদের করার কিছু থাকবে না। কিন্তু অত্র এলাকার মুসলমানদের অন্তরে অগ্নিপূজকদের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল সংখ্যালঘু হিসেবে তারা ইরানী সরকারের গোলাম হলেও এই নরপিশাচদের গোলামী না করতে তারা তাদের জোর বাধা দিচ্ছিল। তাই এর পরিণাম যতই ভয়াবহ হোক না কেন, আল্লাহ্‌র উপর তাদের অগাধ আস্থা ছিল।

* * *

জোহরা এবং খুদ্দামের প্রীতি সাক্ষাৎ রুখবার কোন উপায় ছিল না। তারা উভয়ে ক্ষেতে কাজ করত। যেদিন শিমুর জোহরাদের বাড়ীতে গিয়েছিল তার আগের দিন জোহরা খুদ্দামের সাথে দেখা করে এবং ভীতকণ্ঠে খুদ্দামকে জানায় যে, ইরানী কমান্ডার তাকে ও তার পিতাকে বিভিন্ন হুমকি প্রদান করছে।

জোহরা জিজ্ঞাসা করে–" আমরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি?"

খুদ্দাম গম্ভীরভাবে জবাব দেয়–"না। আমরা দু'জন অজানার পথে পাড়ি দিলে এই ইরানী নরপিশাচ তোমার এবং আমার পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্যকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করবে।"

জোহরা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে–"তাহলে উপায় কি হবে?"

জোহরা দাঁতে দাঁত চেপে আওড়ায় এবং বলে–"খোদা! খোদা! যে খোদা আমাদের সাহায্য করতে পারে না... ।"

খুদ্দাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে–"জোহরা! খোদা অনেক সময় বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন, বান্দা কখনো খোদার পরীক্ষা নিতে পারে না।" এরপর খুদ্দাম গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

জোহরা উদাস কণ্ঠে বলে–"এটা তো সম্ভব নয় যে, তুমি এই অগ্নিপূজকদের মোকাবিলা করবে।"

খুদ্দাম গভীর চিন্তায় ডুবে থাকে। কোন উত্তর দেয় না। যেন জোহরার কথা তার কর্ণকুহরে প্রবেশই করেনি।

কি চিন্তা করছ? জোহরা তার পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বলে–"তুমি লোকটিকে হত্যা তো করতে পার! আমাদের সামনে পথ এখন এই একটিই খোলা।

খুদ্দাম তাকে আশ্বস্ত কর বলে–"আল্লাহ্ পরিস্থিতি উত্তরণের পথ দেখিয়ে দিবেন।"

জোহরা বলে–"আরেকটি পথের সন্ধান তোমাকে আমি দিতে পারি। নিজের তলোয়ার দ্বারা আমাকে মেরে ফেলে তুমি বেঁচে থাক।"

খুদ্দাম বলে–"একটু কুরবানী তো করতেই হবে। শিমুর প্রতি তোমার অন্তরে পুঞ্জীভূত ঘৃণার অনুমান আমি ঠিকই করছি। কিন্তু আপাতত তুমি তার সাথে কৃত্রিম এই আচরণ করে যাও যে, তুমি তাকে ভালবাস। কটা দিন তাকে প্রতারণায় ফেলে ঠেকিয়ে রাখ। কিছুদিনের জন্য আমি গায়েব হয়ে যাব।"

জোহরা চমকে জিজ্ঞাসা করে–কোথায় যাবে? আর কি করতেই বা যাবে?

খুদ্দাম সতর্ক হওয়ার ভঙ্গিতে বলে–সব কথা জানতে চেয়ো না জোহরা! খোদায়ী সাহায্য লাভ করতে আমি যাচ্ছি।

জোহরা তার কাঁধে হাত রেখে বলে–"খোদার কসম খুদ্দাম! তুমি আমাকে ধোঁকা দিলে আমার প্রেতাত্মা তোমাকে নিশ্চিত বেঁচে থাকতে দিবে না। আমৃত্যু তোমাকে পেরেশান করতে থাকবে। একদিনের জন্য আমি ঐ কাফেরের স্ত্রী হতে পারব না। তার সাথে বিবাহ হওয়ার অর্থ আমার থেকে শুধু তুমিই নও, আমার ধর্ম-বিশ্বাসও হারিয়ে যাবে।"

খুদ্দাম দৃঢ়তার সাথে বলে–"ধর্মের প্রতি তুমি এত আস্থাশীল ও মজবুত হয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন।"

জোহরা নিরাশ কণ্ঠে বলে–"খুদ্দাম! ধর্মের প্রতি আমি ঠিকই মজবুত কিন্তু আল্লাহ্র ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে।"

খুদ্দাম আরো কিছু বলতে মুখ খুলেছিল কিন্তু এরই মধ্যে বাগিচায় কর্মরত শ্রমিকদের মাঝে হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। তিন-চার সাথী শ্রমিক খুদ্দামকে ডাক দেয়। জোহরা দ্রুত উঠে পড়ে ঘন গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। খুদ্দাম দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি জানতে চেষ্টা করে। কিছু দূরে ইরানী কমাণ্ডারকে ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে। সে দূর থেকেই শ্রমিকদের লক্ষ্য করে হাঁক ছাড়ে যে, খুদ্দামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। খুদ্দাম শম্বুক গতিতে শিমুরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

খুদ্দামকে ধীরগতিতে আসতে দেখে শিমুর ঘোড়া থামিয়ে দূর থেকে বলে–"দ্রুত আস।"

খুদ্দামের চলনে পরিবর্তন আসে না। যথারীতি শ্লথ। শিমুর পুনরায় গর্জে ওঠে তাকে দ্রুত পা চালাতে বলে। খুদ্দাম নিজ গতিতেই চলতে থাকে । শিমুর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে কোমড়ে হাত রেখে দাঁড়ায়। বাগিচার অসহায় শ্রমিকরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারা নিশ্চিত হয়ে হয়ে যায় যে, আজ শিমুর খুদ্দামের হাড়-গোড় ভেঙ্গে এক করে দিবে। কিন্তু পরক্ষণে সবাই রাজ্যের বিস্ময় চোখ করে অবলোকন করে যে, খুদ্দাম তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শিমুর তাকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা তার প্রতি হাত পর্যন্তও তোলে না।

শিমুর অবজ্ঞার কণ্ঠে খুদ্দামকে বলে–"শোন্ ইতর প্রাণী! আমি তোর বাপ এবং তোর যৌবনের উপর রহম করছি। এর পরে আর কোনদিন যেন তোকে ঐ মেয়ের সাথে না দেখি।"

খুদ্দাম সাহসে ভর দিয়ে জানতে চায়–"দেখলে কি করবেন?"

শিমুর বলে– তাহলে তোর মুখে কেবল এক-দুই থাপ্পড়ই মারব না। তোকে গাছের সাথে উল্টে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখব। দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।"

শিমুর এ কথা বলে আর অপেক্ষা করে না। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসে এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। খুদ্দাম সেখানেই দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকে। যতক্ষণ তার ঘোড়া চোখের আড়াল না হয়ে যায় অপলক নেত্রে তার গমন পথে চেয়ে থাকে।

তাকে এভাবে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি কণ্ঠ ডেকে বলে–"খুদ্দাম! এদিকে এস।"

এদিক-ওদিক থেকে আরো ৩/৪টি কণ্ঠের আহবান তার কানে পৌঁছে–"এসে পড় খুদ্দাম! চলে আস।"

সে উল্টো পায়ে পিছনে ঘোড়ে এবং আহবানকারী সাথী শ্রমিকদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শিমুর তাকে কি বলে গেল তা সবাই জানতে চায়। খুদ্দাম সব খুলে বলে। ইরানী কমান্ডার খুদ্দামের প্রতি কেন এত বিরাগ তা সকলের জানা ছিল। যদি তারা পরাধীন না হয়ে স্বাধীন জাতি হত, ইসলামী রাষ্ট্র হত এবং সামাজিক কালচার মুসলিম এতিহ্যবাহী হত, তবে এক তরুণীকে এভাবে কাছে বসিয়ে আলাপচারিতার জন্য অবশ্যই তারা খুদ্দামকে ভর্ৎসনা করত। কিন্তু এখানকার পরিবেশ ছিল ভিন্ন। বিধর্মী কালচার গড়ে উঠেছিল এবং চলত সবকিছু। জোহরার সাথে খুদ্দামের প্রণয় চললেও সকলের কাছে খুদ্দাম একজন সচ্চরিত্রবান যুবক ছিল। সবাই তাকে ভাল বলেই জানত। তাই খুদ্দামের প্রতি ইরানী কমান্ডারের অন্যায় আচরণে সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মাঝে ক্ষোভ দানা বেঁধে ধূমায়িত হতে থাকে। ইরানীর বিপক্ষে সকল মুসলমান ছিল ঐক্যবদ্ধ। হঠাৎ কর্মরত এক শ্রমিক আলোচনার টেবিলে এই বলে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে যে, এই অগ্নিপূজক এ অসময়ে এখানে কি কাজে এসেছিল?

এই প্রশ্নে আলোচনা জমে ওঠে এবং কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুনোর মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে অনেক রহস্য।

এক বিজ্ঞ কণ্ঠ বলে–"নিশ্চয়ই তাকে আনা হয়েছে। আর যে নিয়ে এসেছে সেও আমাদেরই লোক হবে নির্ঘাত।"

অভিজ্ঞ এক বয়োঃবৃদ্ধ আহবান করে বলে–"তদন্ত করে বের কর সে কে? এটি একটি ছেলে কিংবা মেয়ের প্রশ্ন নয়, জালিম আর মজলুমের ব্যাপার। এটা আজ রীতিমত আমাদের স্বাধীনতা এবং ঐতিহ্য-স্বকীয়তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সামান্য বিষয়ে আজ যে গোয়েন্দাগিরি করেছে সে ভবিষ্যতে বড় গাদ্দারী করতে পারে।"

বিষয়টির গভীরতা ও স্পর্শকাতরতা সকলেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এমন বিশ্বাসঘাতকতা তাদের কেউ করতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস হতে চায় না। গাদ্দারকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে–এমন দৃঢ় প্রত্যয় সকলের চোখে মুখে। হয়ত প্রত্যেকেই এর সুরাহা নিয়ে ভাবছিল। সকলের মাঝে পিনপতন নিরবতা। পুরুষের পিছনের সারিতে দাঁড়ানো এক আধা বয়সী মহিলার জবান চলমান নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে সরব হয়ে ওঠে।

মহিলা সবাইকে চমকে দিয়ে উপস্থিত সকলের চেহারায় নজর বুলায়। "আমি বলছি সে কে। সেখানে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতি মহিলার সন্ধানী দৃষ্টি আটকে যায়। হঠাৎ সে হাত লম্বা করে তর্জনী উঁচিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করে–"আবু নসর! তুমি ওখানে টিলার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?"

আবু নসর থতমত খেয়ে যায়। সে সন্দেহ এড়াতে মুখ খুলে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। এতে সবাই বুঝতে পারে যে, ইরানী কমান্ডারের গোয়েন্দা সেই। কিন্তু সে দ্রুত নিজেকে সামলে নেয় এবং অপরাধ স্বীকার করে না।

মহিলাও নাছোড় বান্দা সে অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে ।

মহিলা বলে–"আমি তোমাকে ফলো করতে থাকি। তুমি হঠাৎ কাজ ছেড়ে উঠে গেলে আমার সন্দেহ হয়। টিলার আড়ালে চলে গেলে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়। এরপর আমার কাছে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যখন ঐ স্থান থেকে শিমুরকে বেরিয়ে আসতে দেখি।"

এক বৃদ্ধ বলে–"শোন আবু নসর! আমরা এ ভয় করি না যে, তুমি শিমুরকে এ কথাও জানিয়ে দিবে যে, আমরা তোমাকে গোয়েন্দা এবং গাদ্দার বলেছি। কিন্তু মনে রেখ ঐ অগ্নিপূজক তোমাকে মর্যাদার চোখে দেখবে না; বরং সে বলবে, তুমি তাদের গোলাম বিধায় তাদের হয়ে গোয়েন্দাবৃত্তি ও গাদ্দারী করা ফরজ।"

আবু নসরের মস্তক অবনত। সত্যের কাছে তার মিথ্যার দেয়ালের এক একটি ইট খুলে খুলে তার চোখের সামনে পড়তে থাকে। এদিকে ভর্ৎসনা আর

গালির শত তীরও চতুর্দিক থেকে এসে তার সারা দেহে বিদ্ধ হতে থাকে। যার মুখে যা আসে তাই ফেলতে থাকে তার ঘাড়ে। বিদ্রূপ আর গালির তীর বর্ষণের মাধ্যমে জনতার ক্ষোভ আর ঘৃণা খতম হলে আবু নসর ধীরে মাথা উঁচু করে। তার চেহারা অশ্রুস্নাত ছিল এবং বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত দু'চোখের কোণ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে বেয়ে যাচ্ছিল। অনুতাপ-অনুশোচনা আর দগ্ধ বিজরিত এ অশ্রুর ফোয়ারা দেখে সবার মাঝে আবার নীরবতা নেমে আসে। সকলেই মনে করে, আবু নসর এখন মুখ খুলবে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হলেও আবু নসরের কণ্ঠ কারো কানে ভেসে আসে না। থমথমে পরিবেশ। বাকরুদ্ধ কণ্ঠ। অবনত চাহনী।

মুরুব্বী পর্যায়ের এক লোক জিজ্ঞাসা করে-"তুমি কত মূল্য পেতে?"

দীর্ঘশ্বাস নেয়ার ভঙ্গিতে আবু নসর বলে-"কিছুই নয়। আমার জীবনে এটাই প্রথম গোয়েন্দাগিরি। তোমরা এর জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলে আমি প্রস্তুত।"

একজন বলে-"আমরা জানতে চাচ্ছি, কেন? শেষ মেষ তুমি এমনটি কেন করতে গেলে?"

আবু নসর জবাবে বলে-"বাধ্য হয়ে। গত পরশুর ঘটনা। ইরানী কমান্ডারের সাথে রাস্তায় আমার দেখা হলে সে আমাকে জোহরার বাড়ীর উপর নজর রাখার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশের অর্থ ছিল জোহরা যেন বাড়ী ছেড়ে পালাতে না পারে এবং তার সাথে কোন যুবক একাকী কথা বললে আমি যেন তাকে অবহিত করি।...আমি তাকে বলি যে, জোহরার উপর নজর রাখতে আমার কোন সমস্যা নেই কিন্তু প্রশ্ন হল আমার দুই মেয়েকে কে নজরে রাখবে? আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, শাহী ফৌজের কমান্ডার এবং সেপাইরা আমাদের মেয়েদের প্রতি কুনজরে তাকায়।...

শিমুর আমার মনের ভাব বুঝতে পারে। সে বলে ভবিষ্যতে কোন কমান্ডার বা সৈন্য তোমার মেয়েদের প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। সে আমাকে পাক্কা ওয়াদা দেয় যে, আমার কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সে করবে।...

বৃদ্ধ মন্তব্য করে-"খোদার কসম! তুমি মুসলমান কথিত হওয়ারও যোগ্য নও। তুমি নিজ কন্যাদের ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে অপর ভাইয়ের কন্যার ইজ্জতের ব্যাপারটি চিন্তা করনি।"

আরেকজন ক্ষুব্ধ মন্তব্য করে-" তোমার উপর খোদার গযব পড়ুক আবু নসর! তুমি জাননা, এই অগ্নি পূজকদের ওয়াদার কোন দাম নেই। তাদের একজনও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যে মুসলমানদের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেছে।"

আরেকজন বলে-"কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমরা নিজেরা প্রস্তুত । তোমার কন্যা আমাদের সকলেরই কন্যা।"

জোহ্‌রার পিতা সাউদ বলে–"আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

খুদ্দাম বলে–"আমিও তাকে ক্ষমা করে দিলাম। খোদার কসম! আমি শিমুর হতে কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ নিব।"

মুরুব্বী তাকে সতর্ক করে বলে–"আবেগে অধীর হয়ো না বৎস! কিছু করতে চাইলে বাস্তবে করে দেখাও। কিন্তু সাবধান! আবেগতাড়িত হয়ে মুখে কিছু বলো না। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব।"

পরদিন সকালে বাগ-শ্রমিকদের মাঝে খুদ্দাম ছিল না। প্রায় প্রত্যেকেই খুদ্দামের পিতার কাছে জানতে চায়, খুদ্দাম কোথায়? পিতা নিজেও চিন্তিত ছিল। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে সে জানতে পারে যে, খুদ্দাম গায়েব।

খুদ্দামের পিতা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে–"জরথুস্ত্রের এই পূজারী আমার পুত্রকে উধাও করে দিয়েছে। হয়ত সে ধোঁকা দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।"

অতঃপর সন্দেহ বিশ্বাসে রূপ নেয়। তার পিতার সম্ভাবনাই সকলের কাছে একমাত্র সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু জোহরা। খুদ্দামের সাথে তার সর্বশেষ যে আলোচনা হয়েছিল তার আলোকে সে এই বিশ্বাসই লালন করে যে, খুদ্দামকে কেউ গায়েব করেনি; বরং সে নিজেই কোথাও চলে গেছে। কেননা, সে তাকে বলেছিল, কয়েকদিনের জন্য সে লাপাত্তা হয়ে যাবে। জোহ্‌রা এ রহস্য কারো কাছে ফাঁস করে না; বরং উল্টো সে এ কথার উপর জোর দেয় যে, ইরানীরাই খুদ্দামকে গায়েব করে দিয়েছে। জোহ্‌রা প্রাণের সখীর কাছে পর্যন্ত মুখ খুলে না। বরং তাকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, সে আগামী দু'তিন দিন খুদ্দামের অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে সে না এলে দরিয়ায় ডুবে মরবে।

* * *

তিন-চার দিন পরের ঘটনা। এক রাতে শিমুর নিকটস্থ একটি ফাঁড়িতে বসে মনের আনন্দে দুই উঠতি তরুনীর চোখ ধাঁধানের নৃত্য দেখছিল। সুন্দর, সুশ্রী এবং আকর্ষণীয় তরুণীদের এমন নাচ-গান ইরানের শাহী দরবারের সাধারণ ব্যাপার ছিল। এদেরকে নর্তকী বলা হত। বিবস্ত্র প্রায় পোশাকে সাজানো হত তাদের। পাতলা এবং সংক্ষিপ্ত পোশাকে তাদের যৌবনাঙ্গগুলো দর্শকের চোখে মাদকতা জাগাত। প্রতিটি পুরুষের পৌরুষ চাঙ্গা ও উৎকীর্ণ হয়ে উঠত।

শিমুর শাহী বংশের লোক ছিল। ঘটনার দিন রাতে সিপাহীদের চিত্তবিনোদনের জন্য সে এই নর্তকী দ্বয়কে ভাড়া করে এনেছিল। মদ পানের পর্ব চলতে থাকে। সিপাহীরা নতর্কী দ্বয়কে চিৎকার করে করে সাবাস দিচ্ছিল। নেশায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'তিন সিপাহী মঞ্চে উঠে নতর্কীদের সাথে নাচতে শুরু করে দেয়। শিমুরের নির্দেশে অন্য সিপাহীরা এই মাতাল সিপাহীদের ধরে ফাঁড়ির বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসে।

ছোট আকারের এই ফাঁড়িটি একটি মিনি কেল্লা ছিল। কিন্তু কেল্লার দ্বার রাতেও উন্মুক্ত থাকত। অপর কোন শত্রুর আক্রমণের আশংকা তাদের ছিল না। তারা নিজেদেরকে হামলার উর্ধ্বে জ্ঞান করত। একদিকে নৃত্য-গীত যখন তুঙ্গে পৌঁছে এবং অপরদিকে মদের নেশা শিমুর ও তার সাথীদের চেতনা লোপ করতে থাকে, তখন শা শা আওয়াজ তুলে বিদ্যুৎ বেগে একটি তীর এসে শিমুরের গর্দানের এক দিক দিয়ে ঢুকে অপর দিকে তার ফলা বেরিয়ে যায়। শিমুর দুই হাত গলায় চেপে ধরে উঠে পড়ে। সিপাহীদের মাঝে হুলস্থুল আর ছুটোছুটি পড়ে যায়। যে যেখানে ছিল সবাই শিমুরের পাশে এসে জমা হয়। আবার তিন চারটি তীর ছুটে আসে। সাথে সাথে তিন-চারবার আর্তচিৎকারও ওঠে। যারা তীরবিদ্ধ হয় তারা লুটিয়ে পড়ে। এরপর ইরানীদের মাঝে কেয়ামতের বিভীষিকা সৃষ্টি হয়। অস্ত্রহীন থাকায় তারা মোকাবিলার মোটেও সুযোগ পায় না। প্রাণ রক্ষারও সুযোগ তাদের ছিল না। তীব্র আক্রমণে তারা শুধু আহত আর নিহত হতে থাকে। যারা পালিয়ে দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিল তারা দরজাতেই মৃত্যুর শিকার হয়।

ফাঁড়ির সিপাহীদের সাহায্যের সকল পথ রুদ্ধ ছিল। কারো পক্ষে দরজা গলিয়ে বাইরে বের হওয়া সম্ভব হয় না। অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র আনার সুযোগও তারা পায় না।

এটি একটি মরুঝড় ছিল, যা হঠাৎ উত্থিত হয়ে মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। প্রস্থানকালে ফাঁড়িস্থ সকল মালামাল সাথে নিয়ে যায়। শুধু রয়ে যায় লাশের সারি, অসংখ্য আহত এবং কতক অক্ষত সিপাহী। যারা প্রলয়ের সময় জীবন বাঁচাতে লাশ আর আহতদের সাথে মাটি কামড়ে পড়েছিল।

॥ তিন ॥

পরের প্রভাত। স্নিগ্ধ সকাল। প্রাত্যহিক কাজ শেষে মুসলমানরা অন্যান্য দিনের মত নিজ নিজ ক্ষেত বা বাগিচায় যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এরই মধ্যে ইরানী সৈন্য এসে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। অজ্ঞাত হামলাকারীরা হামলা শেষে যখন নিরাপদে ফিরে যায় তখন অন্যান্য ফাঁড়ির সৈন্যরা আক্রান্ত ফাঁড়ি সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু ততক্ষণে অজ্ঞাত শত্রু বহুদূরে চলে যায়। কাছে মুসলিম বসতি থাকায় প্রধান সন্দেহ ভাজনের টার্গেটে অটোমেটিক তাদের নাম চলে আসে। তাই সকালের পাখি না ডাকতেই ঘোড়া ছুটিয়ে ইরানী ফৌজ হাজির। তারা এলাকা সিল করে মুসলমানদেরকে কর্মস্থলে যেতে বাধা দেয়। পুরুষদের আলাদা স্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘর থেকে মহিলাদের বের করে এনে তাদেরও পুরুষদের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। কিছু সৈন্য তাদের পাহারায় থেকে বাকীরা ঘরে ঘরে ঢুকে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। তারা ঘরের বিছানা, বেডসীড পর্যন্ত উল্টিয়ে দেখে।

তাদরে চিরুণী অভিযান ব্যর্থ হয়। এমন কোন জিনিস উদ্ধার করতে পারে না, যা তাদের সন্দেহের উদ্রেক করে। অবশ্য তল্লাশী চালাবার সময় তাদের পছন্দসই বস্তু পকেটস্থ করতে তারা ভুলে না। এরপর তারা পুরুষ-মহিলাদের জমা করে কড়া হুমকি-ধমকি দেয়। মুসলমানদের সাথে তাদের এই ব্যবহার কোন নতুন ঘটনা নয়। যে কোন তুচ্ছ বাহানায় যখন তখন তাদের বাড়ী ঘরে এভাবে তল্লাশী চলত। অন্য সময়ে কৃত্রিম ইস্যু নিয়ে এলেও এবার তাদের হাতে বাস্তব ইস্যু ছিল।

এক ইরানী কমান্ডার মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলে–“উবলার সীমান্তবর্তী সেনাফাঁড়িতে গতরাতে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীরা গেরিলা হামলা চালিয়েছে। উক্ত হামলায় আমাদের এক কমান্ডার এবং ষাটজন সিপাহী মারা গেছে। আর আহতের সংখ্যা অসংখ্য। তোমাদের কোন পুরুষ বা মহিলা তাদের একজনকেও যদি ধরিয়ে দিতে পার, তবে বিরাট অঙ্কের নগদ পুরস্কার দেয়া হবে। এ ছাড়া আগত ফসলের অর্ধেক তাকে দিয়ে দেয়া হবে।”

এরপর সে দ্রুত সবার প্রতি নজর বুলিয়ে বলে–“একে অপরকে দেখে বল, তোমাদের মধ্যে কে অনুপস্থিত।”

সকলে একে অপরের দিকে চায়। কিন্তু কেউ অনুপস্থিত আছে কিনা তা খেয়াল করে না। কয়েকটি চোখ খুদ্দামকে খোঁজে। সে গত তিন-চারদিন ধরে অনুপস্থিত ছিল। সকলে অবাক হয়ে দেখে যে, খুদ্দাম সেখানে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। এতে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এরপর অনেকগুলো কণ্ঠ একসাথে বলে ওঠে যে, তাদের কেউ অনুপস্থিত নেই।

ইরানী সৈন্য চলে গেলে যারা খুদ্দামের গায়েব হওয়ার কথা জানত তারা এক এক করে তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে থাকে যে, সে কোথায় চলে গিয়েছিল।

খুদ্দাম সকল প্রশ্নকারীকে একই জবাব দেয়–“আমি শিমুরের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম।”

খুদ্দামের পিতা সবাইকে জানায় যে, গতকাল রাতের শেষ প্রহরে খুদ্দাম বাড়ীতে ফেরে।

সেদিন বাগিচায় কাজ করতে করতে খুদ্দাম আর জোহরা সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ সরে পড়ে। তারা এমন স্থানে গিয়ে বসে তাদের দেখার সম্ভাবনা ছিল না। জোহরা আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেতে থাকে। সে বারবার গভীর আবেগে খুদ্দামের নাম ধরে ডাকছিল।

সে হর্ষ-তরঙ্গায়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে–“এটা কিভাবে ঘটল খুদ্দাম? এটা হল কিভাবে?”

খুদ্দাম বলে–“এটাকে আল্লাহ্‌র সাহায্য বলো জোহরা! এখন আর বলতে পারবে না যে, আল্লাহ্ সাহায্য করে না।”

জোহরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, যেন সে জীবনে কখনো হাসেনি এবং তার ঠোঁট মুচকি হাসি কাকে বলে তাও চেনে না। খুদ্দামের চেহারায় গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিঞ্চিত চিন্তার স্বরে বলে–"সত্য করে বল খুদ্দাম! শিমুরের ঘাতক তুমি নও তো?...শুনেছি মরু ডাকাতের এক বিরাট দল রাতে শিমুরের ফাঁড়িতে ঐ সময় গেরিলা হামলা চালায় যখন সে মদ আর নৃত্য-গীতে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। এমন তো নয় যে, তুমি ঐ ডাকাতদের সাথে মিলে... ।"

খুদ্দামের আকস্মিক অট্টহাসি বিনতে সাউদের কথা শেষ করতে দেয় না। সে হাসতেই থাকে এবং জোহরার কোমরে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে নেয়। এতে জোহরার শরীরে এমন উষ্ণ শিহরণ সৃষ্টি হয় যে, খুদ্দামকে সে কি বলতেছিল তা বেমালুল ভুলে যায়।

* * *

খুদ্দাম অট্টাহাসির মাঝে একটি রহস্য লুকিয়ে ফেলে। জোহরাকে গভীর আবেগে ঠেলে দিয়ে স্পর্শকাতর রহস্যটি তার মনের মুকুর ও দৃষ্টিপথ হতে সরিয়ে নেয়। খুদ্দাম অসাধারণ সাহসী, আত্মমর্যাদাশীল এবং দৈহিক দিক দিয়েও শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা হওয়ায় জোহরার নারী হৃদয়ে এই আতঙ্ক দোলা দেয় যে, প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে শিমুরকে হত্যার জন্য দুর্ধর্ষ অপরাধী চক্রের সাথে হাত মেলায়নি তো! সেকালে মরু ডাকাতরা বড়ই দুঃসাহসী হত। ইরানী সৈন্যদের মত তারা বিভিন্ন স্থানে ঝড়-তুফান উঠাত। পথচারীদের সম্পদ লুট করাই ছিল তাদের পেশা। ফৌজের সাথেও তারা লিপ্ত হত এবং যুদ্ধ করতে করতে এমনভাবে গায়েব হয়ে যেত, যেন মরুভূমির বালু এবং টিলা তাদের আস্ত গিলে ফেলেছে।

জোহরা কিছুদিন ধরে গভীরভাবে লক্ষ্য করে যে, তাদের এলাকায় কয়েকজন অপরিচিত লোক এসে নিজেদেরকে অনেক দূরের মুসাফির পরিচয় দিয়ে কোন এক মুসলমানের বাড়ীতে রাতে অবস্থান করে এবং অতি প্রত্যুষে উঠে চলে যায়। তারা যখনই আসে খুদ্দাম এবং তার মত আরো ৩/৪জন যুবক তাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে। মুসাফিররা তাদের এলাকা ছেড়ে চলে গেলে এই যুবক গ্রুপটিকে ভীষণ তৎপর দেখা যায়।

জোহরা আরো লক্ষ্য করে যে, ভীন দেশীরা চলে গেলে মুসলমানদের বয়োবৃদ্ধ নেতাকে গভীর চিন্তামগ্ন এবং কানাকানি করে কথা বলতে দেখা যায়। এরপর যখন মুসলমানরা নিজেদের ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচাসহ অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের মাঝে ঘুরাফেরা করে এবং উপদেশ দানের ভাষায় কথা বলে।

মুরুব্বী মানুষের মাঝে এই জাতীয় কথা বলে–"স্বীয় ধর্মচ্যুত হবে না। যে মহান খোদার প্রেরিত রাসূলের আদেশ মান্য করে, তোমরা চল তাঁর সাহায্য

আসছে।... অগ্নিপূজারীরা শক্তিশালী, খুব বলবান; কিন্তু তাই বলে তারা আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক শক্তিশালী নয়।...দৃঢ় অবিচল থাকবে।... জালিমের দিন শেষ প্রায়।... মজলুমদের সাথে আল্লাহ্ আছেন।"

"কবে?...সাহায্য কবে নাগাদ আসবে শুনি?"–একদিন এক ব্যক্তি ঝাঁঝালো কণ্ঠে উপদেশদাতা মুরুব্বীর কাছে জানতে চায়–"আপনি তো এটাই চান যে, আমরা মুখ বুজে শত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে থাকি এবং আপনার আশ্বাস বাণী শুনে ব্যথা-বেদনার কথা ভুলে যাই। আজ যদি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেই যে, আমরা মুসলমান নই; ইসলামের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, তাহলে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে সাথে সাথে মুক্ত হয়ে যাব।... আল্লাহর সাহায্য আসছে...কবে নাগাদ আসছে?" "তাকে বল" মুরুব্বী তার পাশে কর্মরত আরেক লোককে বলেন "তাকে ভালভাবে বুঝাও... তাকে জানাও যে, অত্র এলাকায় শত বছর পূর্বের যে সমস্ত জরাজীর্ণ ও বিধ্বস্ত প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহতা'য়ালার পরাশক্তির বহিঃপ্রকাশ এর মধ্য হতে ঘটবে এবং তা জালিমের শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেবে।" বয়োবৃদ্ধ লোকটির অন্তরে ঐ রহস্য লুক্কায়িত ছিল, যা খুদ্দাম জোহরা বিনতে সাউদ থেকে গোপন রেখেছিল।

ইরানী কমান্ডার শিমুরের সেনাচৌকিতে যে দুর্ধর্ষ গেরিলা হামলা চালানো হয় তা নতুন কোন ঘটনা ছিল না। অবশ্য উবলা এলাকায় এমন ঘটনা এই প্রথম। এ ফাঁড়িটি বসতি এলাকার সন্নিকটে থাকায় মুসলমানরা আক্রমণের খবর জানতে পারে। এই ঘটনার পরে মুসলমানদের বাড়ী-ঘর তল্লাশী না করা হলে হয়ত এ ঘটনাও তাদের অজানা থেকে যেত। ইরাকের সীমান্ত এলাকায় দ্বিতীয়, তৃতীয় রাতে কোন না কোন ফাঁড়িতে নিয়মিত গেরিলা হামলা চলতে থাকে। হামলাকারীরা মুহূর্তে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত ঘটিয়ে সেখানে যা কিছু পেত তা নিয়ে উধাও হয়ে যেত।

দু'বার ইরানী সৈন্যরা অদৃশ্য শত্রুর পিছু নেয়। হামলাকারীদের পদচিহ্ন ধরে ধরে অনেক দূর এগিয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। কারণ খানিক দূর এগিয়ে যেতেই সবুজ-শ্যামল ভূমি শেষ হয়ে বিস্তৃর্ণ মরু এলাকা শুরু হয়ে যেত। মরু এলাকাটি মোটেও সমতল ছিল না; যত্রতত্র অসংখ্য বালুর ঢিবি ও উঁচু উঁচু টিলা ছিল। সামনে বিস্তীর্ণ নিম্নাঞ্চল থাকলেও সেখানে বিচিত্র আকৃতির অসংখ্য টিলা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে-সেখানে বালুর পাহাড় ছিল। আগুনের লেলিহান ফুলকি তার অভ্যন্তর হতে উদ্‌গত হচ্ছে মনে হত। মাইলের পর মাইল জুড়ে এই ভয়ঙ্কর মরু এলাকায় চৌকস মরুভেদী ব্যক্তিই কেবল যেতে পারত। কোন নতুন লোকের পক্ষে এখানে যাওয়াই সম্ভব ছিল না। আর গেলেও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ইরানী সৈন্যরা মরুভূমির গোলক ধাঁধার সাথে পরিচিত ছিল না। তারা প্রতিশোধ স্পৃহায় গেরিলা বাহিনীর পিছু পিছু এই মরু অঞ্চলে গিয়ে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হয়। ইরানের অশ্বারোহী বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে মানুষ ও ঘোড়ার পদচিহ্ন পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে। তারা এটাকে গেরিলা বাহিনীর পদচিহ্ন মনে করে চিহ্ন ধরে ধরে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু এই চিহ্নের অনুসরণ তাদেরকে সরাসরি মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। দুর্গম অঞ্চলে ইরানী সৈন্যরা পা দিতেই তাদের উপর তীরের বৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম চোটেই কতক অশ্বারোহী এবং কয়েকটি ঘোড়া ঘায়েল হয়। আহত ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে এদিক-ওদিক ভেগে যায়। পুরো বাহিনীতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। এদিকে তীর মুষলধারায় আসতে থাকে কিন্তু ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার কারণে তীর অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে থাকে।

দুর্গম এই নিম্নাঞ্চল থেকে কয়েকজন অশ্বারোহী বেরিয়ে আসে। তাদের হাতে বর্শা ছিল। তাদের পরনে লম্বা কোর্তা এবং মাথায় কালো কাপড় এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, তাদের গর্দান এবং চেহারাও ঢাকা পড়েছিল। চোখ দু'টো খোলা ছিল মাত্র। কারো সাধ্য ছিল না তাদের চেনা কিংবা চিহ্নিত করা। অশ্বের পায়ে এবং অশ্বারোহীদের বাহুতে এমন ছন্দময় বিদ্যুৎ গতি ছিল যে, পূর্ব হতেই আতঙ্কিত ইরানী বাহিনী অস্ত্র ধরার কথা ভুলে যায়। তারা অসহায়ভাবে নেকাবধারীদের বর্শার আঘাতে আঘাতে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়তে থাকে। কতক প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালায়। তারা টিলা এবং ঢিবি অধ্যুষিত নিম্নাঞ্চল থেকে বের হতে পারলেও বিস্তৃর্ণ মরুভূমির গোলক ধাঁধাঁয় গিয়ে পতিত হয়। টিলাগুলো একই ধরনের হওয়ায় দিশেহারা হয়ে চক্কর খেতে থাকে। বিপদজনক এ ধরনের টিলা অসংখ্য এবং মাইলের পর মাইল জুড়ে থাকায় কোন নতুন ব্যক্তি এর মধ্যে একবার পা দিলে তার পক্ষে এ মরুফাঁদ মুক্ত হয়ে বের হওয়া সম্ভব হত না। ক্রমে সে গভীর থেকে গভীর মরু অঞ্চলে হারিয়ে যেত। একসময় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে হাল ছেড়ে দিত। পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। অতঃপর মরুভূমির এই অদ্ভুত বালিফাড়ি বড় নির্দয় ও করুণভাবে তার প্রাণ সংহার করত।

আরেকবার ইরানী সৈন্যরা গেরিলা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে গেলে নতুন এক স্থানে তারা আক্রমণের শিকার হয়। প্রচণ্ড তীরবৃষ্টির মুখে সৈন্যরা দিগ্বিদিক হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় তাদের কণ্ঠকুহরে একটি আওয়াজ ভেসে আসে "যরথুস্ত্রের ভক্তরা; আমি মুসান্না বিন হারেছা।...যরথুস্ত্রেকে আসতে বলবে।... মুসান্না বিন হারেছা।... হুরমুজকে এ নামটি জানিয়ে দিবে... মুসান্না বিন হারেছা।" ইরানী সৈন্যদের মধ্য হতে যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় তারাও আধামরা ছিল। তারা পরে তাদের কমান্ডারকে মরুভূমির এই রহস্যময় কণ্ঠ সম্পর্কে অবহিত করে।

এরপরে ইরানীদের সীমান্তবর্তী চৌকিতে লাগাতার গুপ্ত হামলা চলতে থাকে। কিন্তু তারা গেরিলা বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন এবং তাদের অনুসন্ধান করার সাহস করেনি। কোন কোনদিন গুপ্ত হামলার সাথে সাথে এই আওয়াজও শোনা যেত " আমি মুসান্না বিন হারেছা।... আগুন পূজারীরা শোন! আমার নাম মুসান্না বিন হারেছা।"

এরপর থেকে মুসান্না বিন হারেছা নামটি ভীতি, ভূত-পেত্নী-প্রেতাত্মা ইত্যাদি নামে পরিণত হয়। ইরানী সৈন্যরা এ নামটি শুনলেই আঁৎকে উঠতে থাকে। তারা মুসান্না বিন হারেছা কিংবা তার গ্রুপের কোন এক সদস্যকে ধরতে প্রাণান্তচেষ্টা চালায় কিন্তু অসীম সাহসী হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা গেরিলা বাহিনীর কবলে পড়ত, চরম আতঙ্ক এবং ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেত।

॥ চার ॥

৬৩৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একদিনে মুসলিম জগতের খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)-এর সামনে এক সাধারণ দূরদেশীর মত যিনি বসা ছিলেন তিনিই হলেন এই হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.)। তিনি দক্ষিণ ইরাকের অধিবাসী এবং স্বীয় গোত্র-বনূ বকরের নেতা ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ও নেপথ্যের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। শুধু নিজ গোত্র নয়; বরং অত্র এলাকায় অবস্থানরত প্রত্যেকটি গোত্রের ইসলাম গ্রহণ তাঁরই অনবদ্য কৃতিত্বের ফল ছিল।

ইয়ামামা যুদ্ধের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে যখন মুরতাদ ফেতনার অবসান ঘটে দক্ষিণ ইরাকে তখন হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.) ইরানীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জিহাদ শুরু করেন। ইরান সাম্রাজ্যের মুসলিম প্রজাদের তিনি নিজের পক্ষে টেনে নেন এবং তাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করেন। গেরিলা হামলার মাধ্যমে তিনি জিহাদের সূচনা ঘটান। লক্ষ্যস্থল ও টার্গেট হিসেবে প্রাথমিকভাবে সীমান্তবর্তী সেনা ব্যারাকগুলো নির্বাচন করেন। প্রতি রাতে কোন না কোন চৌকিতে গুপ্ত হামলা চলতেই থাকে। তাদের গেরিলা আক্রমণ এত তীব্র ও দ্রুত হত যে, ব্যারাকের সৈন্যরা ঘুরে দাঁড়াবার ফুসরৎ পেত না। চোখের পলকে কার্য সিদ্ধি করে তারা নিরাপদে বেরিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।

হযরত মুসান্না বিন হারেছার নেতৃত্বাধীন দুর্ধর্ষ জিহাদী দলটি মরুভূমির বেশ ভেতর এক দুর্গম স্থানকে নিজেদের আস্তানা হিসেবে বেছে নেয়।

ক'দিনের সফল অপারেশনেই আস্তানা গনীমতের মালে টইটুম্বর হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা কেবল ইরানী অধ্যুষিত এলাকায় গেরিলা আক্রমণ চালাতে শুরু করে। মুসান্না বিন হারেছা (রা.) সীমান্ত এলাকায় ইরানী সৈন্যদের ব্যাপক নাকানি-চুবানি খাইয়ে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করে ছাড়ে। ইরানী বাহিনীর

একাধিক সিনিয়র কমান্ডার এক এক করে মুসান্নার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। ফলে সৈন্যরা ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের পিছু নেয়া ছেড়ে দেয়।

হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.) আরেকটি পদক্ষেপ নেন। দক্ষিণ ইরাকে যে সমস্ত মুসলিক গোত্র ইরানীদের নির্যাতনে মানবেতর জীবন-যাপন করছিল তাদের মাঝে সর্বোচ্চ প্রভাব বিস্তার করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। তিনি অধীনস্ত দেরকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেন। একদল ছিল গেরিলা হামলার দায়িত্বে নিয়োজিত আর অপর দলটিকে তিনি মুসলিম আবাসিক এলাকায় রাখেন। তাদের দায়িত্ব ছিল পারস্পরিক একতা টিকিয়ে রাখা এবং রণাঙ্গনের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের অবগত করিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা। গেরিলা বাহিনীর প্রতিনিয়ত সফলতার সংবাদ এলাকাবাসী এভাবে জানতে পারছিল। ফলে অনাস্থা দূর হয়ে তাদের মাঝে ক্রমে আস্থা সৃষ্টি হতে থাকে। তারা মুক্তির সূর্যোদয় দেখতে বড়ই উন্মুখ ও পাগলপারা ছিল। এটাই ছিল খোদায়ী মদদ, যার প্রতীক্ষায় তারা ইরানীদের সকল নির্যাতন-নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে আসছিল এবং ইসলাম ধর্ম বুকে আঁকড়ে রেখেছিল। নতুবা ইসলাম ত্যাগ করে অগ্নিপূজারী হওয়ার মাধ্যমে তারা অতি সহজে ইরানীদের নির্যাতনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারত।

'তিন-চার দিন সে গায়েব হয়ে যাবে'– খুদ্দাম জোহরাকে একথা বলে মুসান্না বিন হারেছার নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে চলে গিয়েছিল এবং তাদেরকে ইরানী কমান্ডার শিমুর বাড়াবাড়ির ঘটনা সব খুলে বলেছিল। গেরিলা বাহিনী খুদ্দামের আহ্বানে সাড়া দেয়। ইরানীদের বিনোদনের দিনকে তারা অপারেশনের জন্য বেছে নেয়। খুদ্দাম নিজেই গেরিলা বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। গেরিলা বাহিনী অতি নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে সফল হামলা চালায়। গেরিলা দল হামলা করেই দ্রুত মারকাজে ফিরে যায়। এদিকে খুদ্দামও তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ী ফিরে আসে।

পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা এবং ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে আরব মুসলিম গোত্রসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার এবং তাদেরকে ইসলামের উপর দৃঢ়-অবিচল রেখে ইরানীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তোলার বিস্তারিত রিপোর্ট হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রা.) কে প্রদান করেন।

"আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন ইবনে হারেছা।" খলীফা তার নাতিদীর্ঘ বিবরণ শুনে বলেন "তুমি ইরানীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যে এলে আমাকে এর জন্য ভাবতে হবে। তুমি কি জাননা ইরানী সৈন্যসংখ্যা যেমন বেশী তেমনি তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ সামগ্রীর কোন অভাব

নেই? উপায়-উপকরণ বিহীন এবং হেড কোয়ার্টার থেকে এত দূরে গিয়ে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শক্তিধর বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করার যোগ্য এখনো আমরা হয়ে উঠিনি। কিন্তু তাই বলে পারস্য সাম্রাজ্যের বিষয়টি আমার বিবেচনাধীন নেই তা নয়।"

"আমীরুল মু'মিনীন!" মুসান্না (রা.) বুকে হাত রেখে বলেন-"যদি এক ব্যক্তি এত বড় রাষ্ট্রের সৈন্যদের সাথে টেক্কা দিতে পারে এবং তাদের অন্তরে মুসলিম সৈন্যদের ব্যাপারে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলে আমি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে বলতে পারি যে, একটি সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে পারে। আমি ঐ আগুনপূজারী সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ করুণ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। শাহী খান্দানের লোকেরা রাজ সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আপনার জানা আছে যে, ইতোমধ্যে সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারস্য বাহিনীকে নিনওয়া এবং দস্তাযারদ দুই রণাঙ্গনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। হিরাক্লিয়াসের সৈন্যরা পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়। এরপর ইরানীরা তাদের হারানো গৌরব আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। তাদের আয়েশী জীবন ও বিলাসিতার প্রতি তাকালে মনে হয় তারা নিজেদেরকে সামলে নিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন তাদের মাঝে রাজমুকুট নিয়ে রশি টানাটানি চলছে। ইয়ামান তাদের হাত থেকে খসে গেছে। ইয়ামানের গভর্নর বাযান ইসলাম গ্রহণ করেছে। তার অধীনস্থ প্রজারা ইরানী জিঞ্জির ভেঙ্গে ফেলতে ভীষণ উদগ্রীব। ইরানীদের শাসনাধীন দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলমান গোত্রগুলো আমার ইশারা এবং মদীনার সৈন্যদের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমাণ।"

"তোমার উপর আল্লাহর রহমত অঝোর ধারায় বর্ষিত হোক মুসান্না!" আমীরুল মু'মিনীন বলেন "নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিটি কথা আমার অন্তরে গেঁথে যাচ্ছে। তুমি যা চাচ্ছ আমি তাই করতে চাই। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সেনাপতিদের সাথে আলোচনা করলে ভাল হয় না?"

"সম্মানিত আমিরুল মু'মিনীন!" মুসান্না (রা.) বলেন-"পরামর্শ সাপেক্ষে সিদ্ধান্তই সর্বোত্তম। তবে আমিরুল মু'মিনীনের কাছে আমার কথা শেষ করার অনুমতি চাইব এবং বিনীত অনুরোধ জানাব যেন তিনি আমার কথাগুলো সেনাপতিদের বৈঠকে তুলে ধরেন।...

দজলা এবং ফোরাতের মিলন মোহনার নিকটবর্তী একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় আরব গোত্রসমূহের বসবাস। সকলেই মুসলমান। ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুসলমান হওয়ায় তারা অগ্নি উপাসক সম্রাটের জুলম-নির্যাতনের ব্লাকবোর্ডে পরিণত হয়েছে। ন্যূনতম মসজিদেও তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত নেই। ইরানীদের হাতে তাদের জান নিরাপদ নয়। ইজ্জত-আবরু সতত হুমকির সম্মুখীন।...

সেখানে মুসলমানরা প্রচুর রবিশস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করে কিন্তু বেচারাদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না। ক্ষেতের ফসল এবং বাগিচার ফল পাকতেই আগুন পূজারী ভূস্বামী এবং ইরানী সৈন্যরা জোরপূর্বক সমস্ত ফসল ও ফল নিয়ে যায়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমকারী মুসলমানদেরকে তারা সাধারণ শ্রমিক ও ধিকৃত জাতি বলে মনে করে। তারা সারাক্ষণ ভীত ও তটস্থ থাকে। মুসলমান হওয়াই তাদের একমাত্র অপরাধ। তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হল, তারা কুফরীর সয়লাবের মাঝেও ইসলামের চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছে। তারা মদীনাকে আলোর মিনার মনে করে।...

"আমিরুল মু'মিনীন! দুশমন শক্তিশালী–এই প্রশ্ন মনে জায়গা দিলে ক্রমে তাদের শক্তি বাড়বে বৈ কমবেনা। অপরদিকে নির্যাতিত মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় তারা নিরাশ হয়ে নিজেদের মুক্তির স্বার্থে এমন পন্থা অবলম্বন করতে পারে যা ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আমার গেরিলা বাহিনী যে সফলতা অর্জন করেছে এবং আপনার সৈন্যদের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা শত্রুর করতলগত হয়ে যেতে পারে।... রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন না?"

"আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাব" খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) বলেন এবং পাশে বসা এক সেনাপতির কাছে জানতে চান যে, ওলীদের পুত্র খালিদ বর্তমানে কোন এলাকায় আছে?"

"ইয়ামামায় আপনার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন" সেনাপতি উত্তরে বলেন।

"দ্রুতগামী কোন দূত মারফৎ খালিদকে জরুরী নির্দেশ দিয়ে পাঠাও যে, সে যেন জলদি মদীনা এসে পৌঁছে।" খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) বলেন "আল্লাহর তরবারী ছাড়া ইরান সম্রাটের সাথে আমরা টক্কর লাগাতে পারি না।" এরপর তিনি হযরত মুসান্না (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন "আর তুমি মুসান্না এখনই তোমার দেশে ফিরে যাও এবং আরব গোত্র হতে লড়াইয়ের যোগ্য যত লোক সংগ্রহ করা সম্ভব করে ফেল। এখন তোমাদেরকে প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্য তোমরা গেরিলা পন্থায়ও লড়াই অব্যাহত রাখতে পার। কিন্তু এখন তুমি নিজ ইচ্ছায় লড়তে পারবে না। খালিদ সর্বাধিনায়ক থাকবে। তুমি তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলবে।"

"যথা আজ্ঞা আমিরুল মু'মিনীন!" মুসান্না বিন হারেছা বলেন "আরেকটি আবেদন করতে চাই।... ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কিছু খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম-বিশ্বাসের লোকও আছে। তারা সবাই অগ্নিপূজারীদের বিরোধী। পারস্যের অগ্নিপূজকরা মুসলমানদের সাথে যে নির্দয় আচরণ করে তাদের সাথেও ঠিক তেমন নির্মম ব্যবহার করে। যদি আল্লাহ্ আমাদের বিজয়

দান করেন তবে আমার অনুরোধ থাকবে অমুসলিম আরবদের সাথে যেন তেমন সদয় আচরণ করা হয়, মুসলমানদের সাথে যেমন করা হবে।"

"ঠিক আছে; এমনটিই হবে" আমীরুল মু'মিনীন বললেন–"যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি ইসলাম তাদের মাথাব্যাথার কারণ হবে না।... তুমি আজই রওয়ানা হয়ে যাও।"

হযরত খালিদ (রা.) তখন ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন। হেড কোয়ার্টার থেকে তার প্রতি এ নির্দেশই ছিল। লায়লা উরফে উম্মে তামীম এবং বিনতে মুযাআ–দুই নববধূ তাঁর সঙ্গেই ছিল। দূত মারফৎ আমীরুল মু'মীনিনের জরুরী তলব পেয়েই হযরত খালিদ (রা.) ইয়ামামা থেকে রওয়ানা হয়ে যান এবং সোজা মদীনায় গিয়ে পৌছেন।

"মুসান্না বিন হারেছার নাম কখনো শুনেছ ?" খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.) এর কাছে জানতে চান।

"জ্বী শুনেছি," হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন–"এ কথাও আমার কানে এসেছে যে, ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সে সীমিত পর্যায়ের যুদ্ধ শুরু করেছে তবে আমার সঠিক স্থান জানা নেই যে, তার এ সীমিত পর্যায়ের যুদ্ধ নিছক ব্যক্তিস্বার্থ নাকি ইসলামের স্বার্থে সে এ যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছে।"

"সে এখানে এসেছিল"– আমীরুল মু'মিনীন বললেন–"যে জিহাদের অবতারণা সে শুরু করেছে তাতে তার কিঞ্চিৎ ব্যক্তিস্বার্থ নেই। আমি তোমাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, মুসান্নার সাহায্যে আমরা এখনই লাব্বায়েক বলব নাকি পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে টক্কর দেয়ার মত শক্তি সঞ্চয়ের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করব?"

"সে কোন্ ধরনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান। হযরত আবু বকর (রা.) এ তথ্য জানিয়ে বলেন যে, মুসান্না বর্তমানে গেরিলা ধরনের আক্রমণ চালাচ্ছে এবং সে ইতোমধ্যে ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

"তার সবচেয়ে বড় সফলতা হলো" খলীফা বলেন–"সে যরথুস্ত্রের প্রজাধীন মুসলমানদেরকে এক প্লাটফর্মে সমবেত করে রেখেছে এবং তাদের মাঝে এমন প্রেরণা সৃষ্টি করেছে যে তারা যরথুস্ত্রের চরম নির্যাতন নিপীড়নের মধ্য দিয়েও ইসলামকে বুকে আগলে রেখেছে। উবলা এবং ইরাকের মুসলিম জনবসতি এলাকা ইরানীদের বর্বরতা অনুশীলনস্থলে পরিণত হয়েছে। চরম এ সংকটময় মুহূর্তে নিজের ধর্ম-বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকা অর্থহীন প্রতিভাত হয়। তারা মুখে শুধু এতটুকুই যদি বলে দেয় যে, ইসলাম এবং মদীনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তবে মুহূর্তে তাদের সকল বিপদ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। এটা সম্পূর্ণ মুসান্না এবং তার কয়েকজন সাথীর কৃতিত্ব ও অবদান যে, তাঁরা এ ক্রান্তি

লগ্নেও তথাকার মুসলমানদেরকে ইসলাম চ্যুত হতে দেয়নি। বরং উল্টো তাদের চেতনা-বিশ্বাসকে এমন দৃঢ় ও পরিপক্ক করে দিয়েছে যে, তারা যরথুস্ত্রের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এ্যাকশন ও অপরেশানে সদা তৎপর থাকে।"

"আমিরুল মু'মিনীন!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "মুসান্না কি করল না করল এটা বড় কথা নয়; আসল কথা হলো মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো যারা মুসলমান হওয়ার কারণে অমুসলিমদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার তাদের ভরপুর সাহায্য করা।"

"তুমি কি বলতে চাও, এখনই আমাদের ইরানীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত?" খলীফা জিজ্ঞাসা করেন।

"জ্বী হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "ইরানীদের বিরুদ্ধে লড়তে আমাদের অসুবিধা কোথায়? সেখানকার পরিস্থিতিই তো ভিন্ন; আমাদের অনুকূলে, আপনার বর্ণনা হতে জানা গেছে যে, মুসান্না ইতোমধ্যে সেখানে কিছুটা সফলতা লাভ করেছে এবং আক্রমণের জন্য সে আমাদের পথকে সুগম করে দিয়েছে। নৈশ হামলাকারী এবং গেরিলা বাহিনীর দ্বারা ঠিক ততটুকু সম্ভব যা মুসান্না করেছে। তাদের দ্বারা কোন এলাকা অধিকার করা সম্ভব নয়; এটা নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর কাজ। এ কাজটি যে কোন মূল্যে আমাদের করতেই হবে। মুসান্নার সফলতাকে আমরা এগিয়ে না নিলে তার ক্ষতি দু'টি। একটি হলো, তার সকল সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দ্বিতীয় হলো যরথুস্ত্ররা মুসান্না এবং মুসলমানদের থেকে এর জঘন্য প্রতিশোধ নিবে। তা ছাড়া ইরানীদের সাহস বেড়েও যেতে পারে। ...

মুসান্না তো আপনাকে জানিয়েছে যে, সে ইরানীদের এমন ক্ষতিসাধন করেছে যে, তাদের আবেগে বিরাট ভাটা পড়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদেরকে হাফ ছাড়ার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে তারা নবোদ্যমে জেগে উঠবে এবং মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করবে। তারা সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে এবং ভবিষ্যৎ কন্টকমুক্ত করতে আলোচ্য সীমান্তবর্তী এলাকার নিয়ন্ত্রণ মজবুত করবে। তারা তাদের সীমান্ত এলাকা ঝুঁকিমুক্ত করতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও অধিকার করে নিতে পারে। এই বিপদ মোকাবিলার একটিই মাত্র পথ খোলা ; আর তা হলো কালক্ষেপণ না করে মুসান্নার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং যরথুস্ত্র আমাদের উদ্দেশে সৈন্য মার্চ করার পূর্বেই তাদের দেশে আমাদের পৌঁছে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করা।"

অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে জলদি ইরাক অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)কে বিদায় জানান।

"খালিদের" বিদায় মুহূর্তে খলীফা বলেন "তোমার অধীনস্থ সৈন্যদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন স্বীয় পরিবার-পরিজন থেকে দূরে এবং অনেক যুদ্ধে তারা

অংশগ্রহণ করেছে। ইরানীদের মত শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো মনে হয় ঠিক হবে না। এর জন্য চাই তাজাদম বাহিনী। জিহাদী জযবায় উজ্জীবিত একঝাক সৈন্যের। কেবল এমন সৈন্যই পারবে জানের বাজি দিতে। পাহাড়ের মত অবিচল হয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে। বাধ্য করে কাউকে রণাঙ্গনে পাঠানোর পক্ষাপাতী আমি নই। সবচেয়ে ভাল হয় তুমি নিজেই একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে নাও। তাদের মধ্যে এমন ধরনের লোক রাখবে যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তোমার বাহিনীতে হয়ত এমন লোকও আছে যারা পূর্বে মুরতাদ বাহিনীতে ছিল। পরে পরাজিত হয়ে ইসলামী বাহিনীতে ঢুকে পড়ার মাঝে মঙ্গল দেখে সামিল হয়ে গেছে। এমন লোকদেরকে তোমার বাহিনীতে রাখবে না। আমরা বিরাট শক্তিধর শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। ফলে আমি কোনরূপ বিপদের ঝুঁকি নিতে চাই না।"

"আমিরুল মু'মিনীন!" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন–"মুরতাদ বাহিনী হতে যারা আমার বাহিনীতে ঢুকেছে তাদেরকে আমার বাহিনী হতে বিদায় করে দেবার অনুমতি দিচ্ছেন?" "বিদায় করে দেয়া ভিন্ন কথা ওলীদের বেটা!" খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) বলেন–"তুমি গিয়ে সৈন্যদের বলবে, যারা ঘরে ফিরে যেতে চায় তাদের যাবার অনুমতি রয়েছে। এরপর দেখবে তোমার সাথে কতজন থাকে। যদি থেকে যাওয়া সৈন্যদের সংখ্যা খুবই কম হয় তাহলে খেলাফত এই কমতি কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ করবে।... যাও ওলীদের পুত্র। আল্লাহ্ তোমার সহায় হোন।"খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) দৃঢ় ইচ্ছা এবং ঈমানে বলীয়ান ছিলেন। ইরাকে হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি যে কোন মূল্যে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চান। হযরত খালিদ (রা.) এরও আন্তরিক চাহিদা ছিল তাঁর একের পর এক লড়াইয়ের সুযোগ আসুক। তিনি খলীফার ইচ্ছাকে আরো সুদৃঢ় ও মজবুত করে দেন।

॥ পাঁচ ॥

ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নদীর মিলন মোহনার নিকটবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলে মুসলমানদের আবাস ছিল। জুলুম এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তারা কালাতিপাত করত। এখন সেখানকার হালচিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে পূর্বের মতই নির্যাতিত এবং চলাচলকারী লাশ বলেই মনে হত। কিন্তু ঘরে ঘরে তাদের শুরু হয়েছিল ব্যাপক তৎপরতা। তারা গোপনে তীর–ধনুক এবং বর্শা তৈরি করতে থাকে। মুসান্না বিন হারেছার পক্ষ হতে যে নির্দেশ তারা পেত তা কানে কানে সকলের পর্যন্ত পৌঁছে যেত। দিনে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে যে তীর বর্শা তৈরি হত রাতের আঁধারে তা মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলে মুসান্নার হেড কোয়ার্টারে পাচার করা হত। এলাকার যুবক শ্রেণীর লোকও উধাও হতে থাকে। ইরানীদের সীমান্তবর্তী চৌকিতে এবং তাদের সেনাবহরে মুসলমানদের গেরিলা

হামলা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। মুসলমানরা শত্রুদের আগোচরে নিয়মিত সেনারূপে সুসংগঠিত হচ্ছিল এবং দৈনন্দিন তাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইয়ামামায় হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। হযরত খালিদ (রা.) ইয়ামামায় গিয়ে সৈন্যদেরকে ঘরে ফেরার ইখতিয়ার দিলে ১০ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ২ হাজার রয়ে যায়। আর বাকী ৮ হাজার সবাই সাধারণ অনুমতি পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। হযরত খালিদ (রা.) খলীফার নামে পত্র লিখে পাঠান। তিনি পত্রে সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করে লেখেন যে, এখন তার সাথে মাত্র ২ হাজার সৈন্য রয়েছে। তিনি বিশেষভাবে তাগাদা দিয়ে আরো লেখেন যে, অচিরেই তার সেনা সাহায্যের প্রয়োজন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের আসনে উপবিষ্ট। হযরত খালিদ (রা.) এর দূত এসে হযরত আবু বকর (রা.) কে তাঁর প্রেরীত পত্র

হস্তান্তর করেন। হযরত আবু বকর (রা.) পত্র পেয়েই জোরে জোরে পড়তে শুরু করেন। উপস্থিত পরামর্শদাতা ও অন্যান্যদের বিষয়টি শুনানো এবং এ ব্যাপারে তাদের অভিমত জানাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

"আমীরুল মু'মিনীন!" পত্র পাঠ শেষ হলে এক পরামর্শদাতা বলেন- "খালিদের জন্য সেনা সাহায্য দ্রুত পাঠানো দরকার। মাত্র ২ হাজার সৈন্য নিয়ে যরথুস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার কল্পনাও করা যায় না।"

"কা'কা বিন আমরকে ডাক!" আমিরুল মু'মিনীন নির্দেশ দেন। একটু পরে বলিষ্ঠ দেহবিশিষ্ট মধ্যমাকৃতির এক সুদর্শন যুবক খলীফার সামনে এসে দাঁড়ায়।

"কা'কা!" আমীরুল মু'মিনীন আগত যুবকের উদ্দেশে বলেন-"খালিদের সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে ইয়ামামার উদ্দেশে রওয়ান হয়ে যাও। সেখানে পৌঁছে খালিদকে বলবে, আমিই তোমার সাহায্য।"

"শ্রদ্ধাবর আমীরুল মু'মিনীন!" এক পরামর্শদাতা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেন "জানি আপনি উপহাস করছেন না। কিন্তু যে সেনাপতির ৮ হাজার সৈন্য চলে গেছে তাঁকে সাহায্য হিসেবে মাত্র এক ব্যক্তি প্রদান করা উপহাসই লাগছে।"

আমীরুল মু'মিনীন অস্বাভাবিক গভীর ছিলেন। তিনি হযরত কা'কা (রা.)-এর আপাদ-মস্তক একবার গম্ভীর নিরীক্ষণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন "যে মুজাহিদ বাহিনীতে কা'কা-এর মত টগবগে যুবক থাকবে তারা পরাজিত হবে না।"

হযরত কা'কা (রা.) তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় চেঁপে বসেন এবং মদীনা ছেড়ে বেরিয়ে যান। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা তবারী, ইবনে ইসহাক, ওকিদী এবং সাইফ বিন উমর এই ঘটনা বর্ণনা করে লেখেন যে, এর পূর্বেও এমন ঘটনা আরেকবার ঘটেছিল। হযরত ইয়াম বিন গনাম (রা.) নামক এক সেনাপতি এক রণাঙ্গন হতে জরুরী সেনা সাহায্য চেয়ে মদীনায় দূত পাঠালে খলীফা হযরত আবু

বকর (রা.) শুধু হযরত আবদ ইবনে আউফ আল হিময়ারী (রা.)–কে সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তখনও উপস্থিত লোকজন বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের ঐ জবাবই দিয়েছিলেন, যা তিনি কা'কা (রা.)–কে হযরত খালিদ (রা.)-এর উদ্দেশে প্রেরণের সময় দেন।

আসল ঘটনা হলো, খলীফা হযরত খালিদ (রা.)-কে নিরাশ করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাকে ব্যাপক সাহায্য করার মত মদীনায় তখন সৈন্য ছিল না। কেননা রণাঙ্গন এই একটি মাত্র ছিল না। প্রখ্যাত সেনাপতিদের সকলেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধরত ছিলেন। এ সকল যুদ্ধ মুরতাদদের বিরুদ্ধে জারী ছিল। ইসলামের শত্রুরা যখন নিশ্চিত হয়ে যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের পরাজিত করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয় তখন তারা ইসলামকে দুর্বল করে করে শেষ করে দিতে এই পন্থা অবলম্বন করে যে, কিছু লোক নবুওয়াতের দাবী করে বসে এবং চানক্য পন্থায় মানুষদেরকে নিজের ভক্ত ও অনুসারী বানাতে থাকে। ইসলাম গ্রহণকারী কতক গোত্রও ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং ইসলাম বিচ্যুতির এই ধারাবাহিকতা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। ধর্মান্তরিতের প্রাদুর্ভাবের পশ্চাতে ইহুদীবাদীর হাত ছিল। তারাই নেপথ্যে থেকে এ ফেৎনা ছড়ায়।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতের পুরো সময়টা এই ফেৎনার মূলোৎপাটনের পিছনে ব্যয় হয়। কেবল ওয়াজ-নসিয়ত আর তাবলীগের দ্বারা এই ফেৎনা দমানো যেত না। এর জন্য সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন ছিল। এ পর্যায়ে কয়েকটি রণাঙ্গন একই সময়ে সৃষ্টি হয়। মদীনায় আপাতত কোন সৈন্য ছিল না। কোন রণাঙ্গনে সৈন্য ঘাটতি দেখা দিলে অপর রণাঙ্গন হতে সৈন্য এনে সে ঘাটতি পূরণ করা হত।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত খালিদ (রা.)-এর সাহায্যে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি প্রেরণ করলেও এটাই সাহায্যের শেষ ছিল না। তিনি মুজার এবং রবীয়া নামক পার্শ্ববর্তী দু'গোত্রের উদ্দেশে এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, তারা যেন হযরত খালিদ (রা.)-কে অধিকহারে সৈন্য সরবরাহ করে।

* * *

"মাত্র এক জন?" হযরত কা'কা' বিন আমর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)–এর সমীপে পৌঁছলে খালিদ (রা.) নিজ তাবুতে রাগে পায়চারি করতে করতে বলেন "এক ব্যক্তি মাত্র?...আমীরুল মু'মিনীনকে তো আমি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছি যে, আমার অধীনে বর্তমানে মাত্র ২ হাজার সৈন্য রয়েছে। খেলাফতও আমার থেকে এই আশা রাখে যে, আপাদমস্তক বর্মাচ্ছাদিত ইরানী সৈন্যদের সাথে আমি সংঘর্ষে লিপ্ত হব।"

"শ্রদ্ধেয় সেনাপতি!" হযরত কা'কা' (রা.) বলেন "৮ হাজার সৈন্যের স্থান আমি পুরো করতে না পারলেও অপূর্ণ রাখব না। সময় আসতে দিন। যে আল্লাহর

রাসূলের কালেমা উচ্চারণ করি তার পবিত্রাত্মার সামনে আপনার মস্তক অবনত হতে দিব না।"

"ধন্যবাদ আরব রত্ন!" অনিন্দ্য সুন্দরী লায়লা হযরত কা'কা' (রা.) এর কাঁধে জোরে হাত রেখে বলেন "তুমি যে ধর্মের পূজারী তোমার মত নব যুবকরা তা কেয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখবে।"

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী বিনতে মুযাআ অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন "এই নওজোয়ান ৮ হাজার সৈন্যের শূন্যতা পূরণ করতে পারে।"

"আমি ইয়ামামায় বসে থাকব না" হযরত খালিদ (রা.) নিজের মনের সাথে কথা বলার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে থাকেন, "মুসান্না নিশ্চয়ই আমার পথ চেয়ে আছে। আমি তাকে নিঃসঙ্গ হতে দেব না। ..." এটুকু বলেই তিনি চুপ করে যান এবং ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলেন "জগতের মালিক প্রভু ওগো ! আমি তোমার নামে শপথ করছি স্বীয় নামের খাতিরে অন্তত আমাকে সাহায্য কর। আমাকে পাহাড়সম হিম্মত এবং দৃঢ়তা দান কর, যেন আমি ঐ আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তাকে নির্বাপিত করতে পারি যরথুস্ত্রে যার ইবাদত করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তোমার রাসূল।"

"জনাব খালিদ! আপনি সাহস হারিয়ে ফেলছেন?"-লায়লা হযরত খালিদ (রা.) ভেঙ্গে পড়তে দেখে বলেন-"আপনি কি বলতেন না যে, যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করেন?"

"আমি সাহস হারাব না"-হযরত খালিদ (রা.) লায়লার সান্ত্বনার জবাবে বলেন- "কিন্তু কথা হলো, আমি পরাজিত হতে অভ্যস্থ নই।... আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করবেন। খোদার কসম! আমি সম্মান-মর্যাদা ও সুনাম-সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষী নই। ইরান সম্রাটের শাহী সিংহাসনও আমি চাইনা। আমি চাই আল্লাহর জমিন ইসলামের অধীনে চলে আসুক এবং আল্লাহর জমীনে বসবাসরত প্রত্যেকটি লোক আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এ বিশ্বাসী ও তাঁদের অনুগত হোক।

* * *

হযরত খালিদ (রা.)-এর পাশে রয়ে যাওয়া দু'হাজার সৈন্য ইয়ামামার একটি ময়দানে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে দণ্ডায়মান। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার পিঠে আসীন।

"বীর মুজাহিদ সেনানীরা!"-হযরত খালিদ (রা.) মুষ্টিমেয় সৈন্যদের উদ্দেশে তেজস্বীকণ্ঠে বলেন-"ইসলামের সুমহান বাণী দূর-দূরান্ত পৌঁছে দিতে আল্লাহপাক আমাদের নির্বাচন করেছেন। পরিবার-পরিজন এবং পার্থিব ধন-সম্পদ যাদের অতি প্রিয় তারা চলে গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ কিংবা

অভিযোগ নেই। তারা বিভিন্ন রণাঙ্গনে জান বাজি দিয়ে আমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করেছে। এক দীর্ঘ সময় ধরে তারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে যথাযথ পুরস্কৃত করুন।... তোমরা আমার সঙ্গ ছাড়নি। এই ত্যাগের বিনিময় আমি নই ; আল্লাহ্ নিজেই তোমাদের দিবেন। আমরা বড়ই পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছি। আমাদের সংখ্যার স্বল্পতার দিকে তাকাবে না। বদরে তোমরা কতজন আর কুরাইশদের সংখ্যা কত ছিল? উহুদেও মুসলমারা সংখ্যায় কম ছিল। আমি সে সময় শত্রু পক্ষের একজন ছিলাম। তোমাদের মাঝেও অনেক এমন আছে যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বদর প্রান্তরে মুসলামানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলে। তখন আমরা বড়ই আস্ফালন করে বলেছিলাম যে, আমরা এই মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যদেরকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষে মারব। তোমাদের মনে নেই সেদিন সংখ্যায় যারা বেশী ছিল তারাই এক সময় স্বল্প সংখ্যক বাহিনীর হতে চরম মার খেয়ে পিছু হটে গিয়েছিল?... কেন এমন হয়েছিল?... কারণ ছিল একটাই, আর তা হলো মুসলমানরা হকের উপর ছিল; আর আল্লাহ্ হকপন্থীদের সাথে থাকেন। আজ তোমরা হকের ঝাণ্ডাবাহী।"

হযরত খালিদ (রা.)– এর হাতে একটি কাগজ ছিল। তিনি এ সময়ে সেটি খুলে নিজের সামনে রাখেন।

আমীরুল মু'মিনীন আমাদের উদ্দেশে একটি পত্র লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি খালিদ বিন ওলীদকে পাঠালাম। খেলাফতের পক্ষ হতে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত তোমরা খালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। যে কোন পরিস্থিতিতে খালিদকে ছেড়ে যাবে না। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না। তোমরা তো তারাই, যারা ঘরে ফেরার ইখতিয়ার পেয়েও 'আল্লাহর তরবারী'– খালিদের সঙ্গ ছাড়নি। তোমরা সবকিছুর উপরে ঐ রাস্তা অবলম্বন করেছ যাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা বলা হয়। কল্পনা কর ঐ বিরাট সওয়াবের কথা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীরা যা প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তোমাদের সহায় ও সহায়ক হবেন। তোমাদের সৈন্য ঘাটতি তিনিই পূর্ণ করবেন। সকল অবস্থায় তাঁর সন্তুষ্টি ও সন্তোষ অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।"

এই দু'হাজার মুজাহিদকে কোনরূপ ওয়াজ কিংবা উত্তেজিত করার প্রয়োজন ছিল না। তারা প্রথম থেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে ছিল। তাদের অধিকাংশই এমন ছিল যে, তারা রাসূল (সা.)–এর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাদের মধ্যে এই ভাবধারা কাজ করে যে, রাসূল (সা.) এর পবিত্রাত্মা এখনও তাদের নেতৃত্ব দিয়ে চলছে।

রাসূল প্রেমে দিওয়ানা এই সৈন্যরা হযরত খালিদ (রা.)-এর অনুমতিক্রমে এক নয়া কৌশল অবলম্বন করে। তারা ঘোড়ায় চেপে ইয়ামামার আশে-পাশের অঞ্চলে বেরিয়ে পড়ে এবং বসতিতে গিয়ে গিয়ে অশ্বারোহণের বিভিন্ন কৌশলী মহড়ার প্রদর্শন করে ফেরে। ছুটন্ত ঘোড়া হতে নামা এবং খানিক পর আবার তার পিঠে সওয়ার হওয়া, ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, ছুটন্ত ঘোড়ায় থেকে অস্ত্রচালনা মহড়ার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল। এভাবে মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারা যুবক শ্রেণীকে ফৌজে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং জিহাদের ফযিলত ও লাভ সম্পর্কে তাদের জানাত।

সাথে সাথে তারা তাদেরকে এ ব্যাপারেও সতর্ক করত যে, যদি তারা মুসলিম ফৌজে ভর্তি না হয় তবে ইরানীরা এসে তাদের গোলামে পরিণত করবে। তাদের থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম নিবে কিন্তু বিনিময়ে দেবেনা কিছুই। উপরন্তু তাদের বোন, কন্যা এবং স্ত্রীদেরকে ভোগের সামগ্রিতে পরিণত করবে। এই অঞ্চলের লোকদের তিন শাসনামলের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তারা ইরানীদের শাসনামল দেখেছিল। ভণ্ড নবীর ভেল্কিবাজিও তাদের সামনে ছিল। বর্তমানে তারা মুসলমানদের শাসনাধীন। মুসলমানরা অত্র এলাকা করায়ত্ত করে তাদের গোলাম বানায়নি। জনগণ গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে যে, মুসলমানদের চাল-চলন, আচরণ ও শাসন রাজা-বাদশাহ কিংবা দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের মত নয়। ক্ষমতাধর হয়েও তারা সাধারণ জীবন-যাপন করে। সকলের সাথে মিলেমিশে থাকে। সবার কথা শুনে এবং সবার সাথে কথা বলে। তাদের নারী জাতির ইজ্জত-সম্ভ্রম সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

ইয়ামামার জনতার মাঝে কিছু লোক এমনও ছিল যারা ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু মুসাইলামা ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছিল। ফলে ভণ্ড নবীর খপ্পরে পড়ে তারা ইসলাম থেকে সরে গিয়েছিল। মুসলমানদের হাতে মুসাইলামার নবুওয়াতের ভণ্ডামী উন্মোচিত হতে তারা দেখেছিল। মুসাইলামার বিশাল সমরশক্তি স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের বীরত্বের সামনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার দৃশ্য তাদের সামনে ছিল। মুসাইলামার পরাজয় তাদের অন্তর্চক্ষু খুলে দিয়েছিল। তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জমেছিল যে, যারা সংখ্যায় স্বল্প হয়েও এত বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করতে পারে তারা নিশ্চয়ই সত্যপন্থী এবং সঠিক আদর্শবাদী হবে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, যে অদৃশ্য শক্তি সত্যকে মিথ্যার উপর এবং হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করে তা একমাত্র ইসলামেই নিহিত। ফলে তারা হযরত খালিদ (রা.) এর ফৌজে নাম লিখাতে থাকে। এটা মুজাহিদদের মেহনত আর চেষ্টার ফসল ছিল।

* * *

ইয়ামামায় হঠাৎ শোরগোল পড়ে যায়। কিছু লোক উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বসতি এলাকার বাইরে চলে যায়। মাহিলারা নিজ নিজ ঘরের ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দূরের খোলা আকাশে ধুলোর মেঘমালা উড়ছিল। জমিন হতে উৎক্ষিপ্ত ধুলো ক্রমশ উর্ধ্বপানে উঠছিল এবং অতি দ্রুত ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

"ধূলিঝড় আসছে।"

"সৈন্য তারা... কোন সেনাবাহিনী আসছে"

"সাবধান!...হুসিয়ার!!...প্রস্তুত হও।"

হযরত খালিদ (রা.) পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য কেল্লা সদৃশ একটি ভবনে ওঠেন। গভীর নিরীক্ষণের পর তিনি নিশ্চিত হন যে, এটা কোন মরুঝড় নয়; বরং সশস্ত্র সেনাফৌজ। মুরতাদ শ্রেণী ছাড়া অন্য কারও সৈন্য হতে পারে । হযরত খালিদ (রা.) এর আফসুস হতে থাকে যে, তিনি কেন তার সৈন্যদের ঘরে ফিরে যাবার ইখতিয়ার দিলেন। উড়ন্ত ধুলিমেঘ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক বিশাল বাহিনীই ইয়ামামা পানে ধেয়ে আসছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর অধীনে মাত্র দুই হাজার সৈন্য কিংবা সর্বোচ্চ ঐ সৈন্যরা ছিল যারা সবেমাত্র ফৌজে যোগ দিয়েছে। তাদের উপর আস্থা রাখার মত এখনও তারা হয়ে উঠেছিল না। তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা ছিল যে, অবস্থা প্রতিকূল দেখলে তারা শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলাতে পারে কিংবা নিজেরাই শত্রু হয়ে পশ্চাৎ হতে আক্রমণ করতে পারে।

"মুজাহিদগণ!" হযরত খালিদ (রা.) কেল্লাসদৃশ ভবনের ছাদ হতে উচ্চস্বরে বলেন–"চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় দ্বারপ্রান্তে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তোমাদের সহায় নেই।" এটুকু বলেই হযরত খালিদ (রা.) নীরব হয়ে যান। কারণ ইতিমধ্যে তাঁর কানে আগত বাহিনী হতে সমরসঙ্গীত ও ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসে।

আক্রমণকারীরা কখনো যুদ্ধ-সঙ্গীত বাজাতে বাজাতে আসে না। সঙ্গীতের সুর ক্রমে উচ্চকিত হতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) দূরে দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন। ধুলোও ততক্ষণে নিকটে এসে গিয়েছিল। ধুলোর চাদর ভেদ করে উট ঘোড়া দেখা যেতে থাকে। ধুলোর পর্দার অন্তরাল হতে আগত বাহিনী 'নারায়ে তাকবীর' দিচ্ছিল।

"ইসলামের কাণ্ডারীগণ!" হযরত খালিদ (রা.) উপর থেকে চিৎকার করে জানাল "আল্লাহ্র সাহায্য আসছে।... সামনে এগিয়ে যাও। তাদের অভ্যর্থনা জানাও। খোঁজ নাও তারা কারা।"

হযরত খালিদ (রা.) এক প্রকার ছুটে নীচে চলে আসেন। ঘোড়ায় চেপে বসে বাতাসের বেগে বসতি এলাকা থেকে বেরিয়ে যান। ওদিকে আগন্তুক বাহিনীও বসতির কিছু দূরে এসে থেমে যায়। সেখান থেকে দু'টি ঘোড়া সামনে অগ্রসর হয়। হযরত খালিদ (রা.) ততক্ষণ তাদের পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং সামনে দু'অশ্বারোহীকে দেখে ঘোড়া হতে নেমে আসেন। অপর অশ্বারোহীদ্বয়ও নেমে আসে। তারা মুজার এবং রবীয়া গোত্রের নেতা ছিল।

"মদীনা থেকে খবর আসে আপনার সাহায্যের খুব প্রয়োজন।" –হযরত খালিদ (রা.)-কে চিনতে পেরে এক নেতা তাঁকে বলে–"আমি চার হাজার সৈন্য এনেছি। তাদের মাঝে উষ্ট্রারোহী, অশ্বারোহী এবং পদাতিকও আছে।"

"আর চার হাজার সৈন্য আমার গোত্রের আছে"–অপর নেতা জানায়।

হযরত খালিদ (রা.) আনন্দের আতিশয্যে উভয়কে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং প্রচণ্ড খুশীতে কম্পিত কণ্ঠে বলেন " আল্লাহর কসম! তিনি কখনো আমাকে নিরাশ করেননি।"

* * *

হযরত খালিদ (রা.)-এর অধীনে এখন দশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী। তিনি মুজার এবং রবীয়া গোত্রপতিকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন যে, তাদের গন্তব্য কোথায় এবং শত্রু কেমন শক্তিধর।

"আমরা আপনার সাহায্যার্থে এসেছি জনাব খালিদ!" এক নেতা বলেন "আমাদের মঞ্জিল তথায় যেখানে আপনি যেতে চান।"

মদীনা হতে আমাদের এটাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "সম্মিলিত সৈন্যের আমীর আপনি"–অপর নেতা বলেন, "অতএব যেখানেই যেতে বলবেন সেখানেই আমরা যাব। শত্রু যেমনই হোক না কেন লড়ব।"

হযরত খালিদ (রা.) ইরান সাম্রাজ্যের এক গভর্নর–হুরমুজের নামে একটি পত্র লেখেন। তৎকালে ইরাক ইরান সাম্রাজ্যেরই একটি প্রদেশ ছিল। তার গভর্নর বা প্রশাসক ছিল হুরমুজ। বর্তমান কালের জেলা প্রশাসকের মত অবস্থান ও ক্ষমতা ছিল তার। ইতোপূর্বেও তার সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা হয়েছে। সে বড়ই জঘন্য প্রকৃতির, মিথ্যাবাদী এবং ধোঁকাবাজ ছিল। অভদ্রতার ক্ষেত্রে তার নাম প্রবাদবাক্য স্বরূপ ব্যবহৃত হত।

হযরত খালিদ (রা.) তার নামে নিম্নোক্ত ভাষায় পত্র লিখেন :

আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলে নিরাপদে থাকবেন। এতে সম্মত না হলে আপনার শাসনাধীন এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত করে দিন। এর প্রশাসক আপনিই থাকবেন। ইসলামী খেলাফতের রাজধানী মদীনাতে নির্ধারিত কিছু কর প্রেরণ করবেন। এর বিনিময়ে আমরা আপনার জনগণ এবং এলাকার শান্তি স্থিতিশীলতা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিব। এটাও মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তখন নিজের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার নিজের কাঁধেই থাকবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন আপনার পরিণতি কি হবে। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে; কিন্তু আমি আপনাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া জরুরী মনে করছি যে, আমরা ঐ জাতি যাদের কাছে মৃত্যু ততধিক প্রিয় যেমন বেঁচে থাকা আপনাদের কাছে প্রিয়।... আমি আল্লাহর পয়গাম আপনার পর্যন্ত পৌছে দিলাম।"

হযরত খালিদ (রা.) পত্রটি এক দূতের হাতে দিয়ে বলেন, দু'মুহাফিজ সাথে নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হয়ে যাও এবং পত্রটি হুরমুজকে হস্তান্তর করে তার জবাব নিয়ে আসবে।

"তোমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আমি ইয়ামামায় বসে থাকবো না।" হযরত খালিদ (রা.) দূতকে বলেন, "ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকার কোথাও আমাকে খুঁজবে। উবলা নামটি মনে রাখবে। সেখানে গেলে তুমি আমার ঠিকানা পেয়ে যাবে।"

দূত রওয়ানা হয়ে যাবার পর হযরত খালিদ (রা.) ১০ হাজার বাহিনীকেও মার্চ করার নির্দেশ দিলেন।*

হযরত খালিদ (রা.) এর জানা ছিলনা যে, তার জন্য আল্লাহর আরো সাহায্য অপেক্ষমাণ। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর-পূর্ব আরব এলাকায় বসবাসরত তিন গোত্রের প্রধান মাজউর বিন আদী, হুরমুলা এবং সুলামা–বরাবর পত্র প্রেরণ করেন যে, নিজ নিজ গোত্রের অধিক সংখ্যক যোদ্ধাদেরকে মুসান্না বিন হারেছার কাছে নিয়ে যাও। এ সমস্ত লোক যেন যুদ্ধ-অভিজ্ঞ এবং বীর বাহাদুর হয়। তাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) ফৌজ নিয়ে আসছে। সেই হবে সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

উবলা সহ ইরানের শাসনাধীন অন্যান্য আরব মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার চিত্র কিছুটা ভিন্নতর ছিল। প্রথমদিকে মুসান্না বিন হারেছা (রা.) অত্র এলাকার কতক আগ্রহী যুবককে ইরানী সেনাচৌকি এবং ফৌজ কাফেলায় গুপ্ত হামলা চালাবার জন্য নিজের সাথে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর প্রয়োজন পড়ে ঐ এলাকা হতে একটি বাহিনী তৈরি করার। কিছু সৈন্য তিনি নিজ গোত্র বকর ইবনে ওয়ায়েল থেকে সংগ্রহ করেন। এ সকল সৈন্য হযরত আলী ইবনে হাজরনী (রা.) নামক মদীনার এক সেনাপতির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইরাকের সীমান্তবর্তী এলাকায় মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। হযরত মুসান্না (রা.) আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এক গোপন বার্তায় জানান যে, যুবক শ্রেণীর মধ্য হতে যারা ইরানীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দুর্গম আস্তানায় আসতে পারে তারা যেন শীঘ্রই চলে আসে।

মুসলমানদের পক্ষে এলাকা ছেড়ে যাওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ যরথুস্ত্রের সেনারা মুসলিম বসতিগুলোর উপর কড়া নজর রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল, বিভিন্ন চৌকিতে গেরিলা হামলার পশ্চাতে অবশ্যই মুসলমানদের হাত আছে। এখন সেই সাথে আবার যোগ হয় হেড কোয়ার্টার থেকে আগত নতুন নির্দেশ। এই নির্দেশদাতা ছিল ইরাক প্রদেশের শাসনকর্তা হুরমুজ।

হুরমুজের এই নয়া নির্দেশের পশ্চাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর দূত ছিল অন্যতম কারণ। হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজের উদ্দেশে এক পত্র লিখে দূত মারফত পাঠিয়ে দেন। দূত যথাসময়ে পত্র নিয়ে পৌঁছে। দূত এখন ইরান সাম্রাজ্যের এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার দরবারে। হুরমুজকে যখন জানানো হয় যে, মদীনার সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.)–এর দূত এসেছে; সে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী, তখন হুরমুজের চেহারায় ঘৃণা ও তুচ্ছতার ছাঁপ ফুটে ওঠে।

"কোন মুসলমানের চেহারা আমি দেখতে চাই না" হুরমুজ বলে—" কিন্তু আমি জানতে চাই তার আসার উদ্দেশ্য কী?

"যরথুস্ত্রের কসম!" এক মন্ত্রী দাঁড়িয়ে হুরমুজকে বলে—"খালিদের দূত নিশ্চয় এমন কোন পয়গাম নিয়ে এসেছে, যা তার মৃত্যুর পয়গাম হিসেবেই বিবেচিত হবে।"

"তাকে ভিতরে নিয়ে এসো"— হুরমুজ বলে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর দূত দুই সশস্ত্র দেহরক্ষীর সাথে অত্যন্ত দ্রুতবেগে হুরমুজের দরবারে প্রবেশ করে এবং সোজা হুরমুজের দিকে এগিয়ে যায়। দুই বর্শাধারী এসে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। কিন্তু দূত তাদের এড়িয়ে হুরমুজের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"আসসালামু আলাইকুম!" দূত বলে—"অগ্নি পূজারী হুরমুজকে মদীনার সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)-এর সালাম। আমি তাঁর এক পত্র নিয়ে এসেছি" "আমরা ঐ সেনাপতির সালাম গ্রহণ করব না যার দূতের মাঝে আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনুধাবনের যোগ্যতা পর্যন্ত নেই" হুরমুজ তাচ্ছিল্যভরে বলে"— মদীনায় কি সব জংলী আর গোঁয়ার বসবাস করে? তোমাকে আসার সময় কেউ বলে দেয়নি যে তুমি এক শাহী দরবারে যাচ্ছ? দরবারের ভদ্রতা ও রীতি-নীতি তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়নি?"

"মুসলমান একমাত্র আল্লাহর দরবারের শিষ্টাচার সম্বন্ধে অবহিত হয়।" দূত অসীম সাহসে মাথা আরেকটু উঁচু করে বলে " ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনই মর্যাদা নেই যে মানুষের মাঝে দরবারের প্রভাব সৃষ্টি করতে চায়। আমি আপনার দরবারী (আমত্য) নই। আমি ঐ সেনাপতির দূত যাকে আল্লাহর রসূল (সা.) 'আল্লাহর তরবারী আখ্যা দিয়েছেন'।

"হুরমুজের সামনে ঐ তরবারি ভোঁতা হয়ে যাবে" হুরমুজ খোদাদ্রোহীর ভঙ্গিতে বলে এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে নির্দেশের সুরে বলে "দাও, দেখি তোমাদের আল্লাহর তরবারি 'কি লিখে পাঠিয়েছে?"

দূত তার বাড়িয়ে দেয়া হাতে পত্র উঠিয়ে দিলে হুরমুজ এমনভাবে পড়তে থাকে যেন তামাশা বশত সে হাতে একটি কাগজ নিয়েছে। পত্র পড়ে সে পত্রটি মুঠোর মধ্যে এমনভাবে দলা মোচড় করে, যেন এটা একটি ময়লা আবর্জনা যাকে সে এখনি ছুড়ে ফেলবে।

"পোকা মাকড় কি এই স্বপ্নে বিভোর যে, সে একপাহাড়ী ভূমির সাথে টক্কর লাগাতে পারবে?" হুরমুজ বলে—"মদীনাবাসীদের কেউ জানায়নি যে, হিরাক্লিয়াসের মত মানুষও ঐ পাহাড়ে মাথা ঠুকে কেবল নিজের মাথাই ক্ষত বিক্ষত করেছে? আমাদের সৈন্যদের এক ঝলক তোমাদের দেখিয়ে দিব, যাতে তোমরা সেনাপতি এবং বৃদ্ধ খলীফাকে গিয়ে বলতে পার যে, তারা যেন ইরাকের সীমান্ত এলাকার প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস না করে।"

"সেনাপতি আমাকে শুধু এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি আপনার বরাবর পত্র হস্তান্তর করে তার জবাব নিয়ে আসব" দূত বলে " আমি আপনার কোন কথার জবাব দিতে পারি না। কারণ, আমাকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেয়া হয় নি।" "তোমাদের মত দূতের সাথে আমরা এ আচরণ করি যে, তাকে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করি", হুরমুজ বলে-"আমাদের মনে দয়ার উদ্রেক হলে তাকে কায়েদখানার নির্যাতন থেকে বাঁচাতে জল্লাদের হাতে তুলে দিই।"

"আমার প্রাণ আমার আল্লাহর হাতে " দূত পূর্বের চেয়েও অধিক সাহসিকতার সাথে বলে "আপনি মুসলমান হলে জানতেন একজন অতিথির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু একজন নাস্তিক এবং অগ্নিপূজারির থেকে এর বেশী আশা করা যায় না। আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিন। কিন্তু মনে রাখবেন, মুসলমানরা আমার এবং আমার নিরাপত্তা কর্মীদের রক্তের প্রতিটি ফোটার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।"

হুরমুজ সহসা সোজা হয়ে বসে। রাগে তার চোখ লাল হয়ে যায়। রাগের এই চিহ্ন তার মুখাবয়ব ছেঁপে যায়। মনে হয় এখনই সে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর এই দূতকে কাঁচা চিবিয়ে খাবে।

"আমার দরবার থেকে তাকে বের করে দাও" হুরমুজ গর্জে ওঠে বলে। বর্শা ধারী চার পাঁচ সভাষদ দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়। দূতের দুই মুহাফিজও চোখের পলকে তলোয়ার কোষমুক্ত করে। ইতোপূর্বে তারা দূতের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন তারা দূতের দুই পাশে এমনভাবে পজিশন নিয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের পিঠ দূতের দিকে ছিল। "হুরমুজ!" দূত গম্ভীর কণ্ঠে বলে-"বীর ময়দানে যুদ্ধ করে। শক্তির দাপট নিজ দরবারে দেখাবেন না। আমার সেনাপতির কাঙ্ক্ষিত জবাব আমি পেয়ে গেছি। আমাদের কোন প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করেননি। এটাই কি আপনার জবাব ?"

"বের হয়ে যাও এই দরবার থেকে"-হুরমুজ ক্রোধকম্পিত উচ্চস্বরে বলে " তোমার সেনাপতিকে বলবে, রণাঙ্গনে আমার শক্তির পরীক্ষা নিতে।"

হুরমুজের বর্শাধারী সভাষদরা হুরমুজের ইশারায় থেমে গিয়েছিল। দূতের মুহাফিজরা তলোয়ার কোষে চালান দেয়। দূত পিছন দিকে ঘুরে দাড়ায় এবং দ্রুত কদমে দরবার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। দুই মুহাফিজ তার পিছু পিছু চলতে থাকে।

দূত চলে গেলে হুরমুজ মুষ্টিবদ্ধ হাত খোলে। সেখানে তখনও হযরত খালিদ (রাঃ)-এর দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া পত্র ছিল । পত্রটি একটি পাতলা চামড়ায় লিখিত থাকায় হাতের মুঠো খুলতেই পত্রটি সোজা হয়ে আবার সামনে ভেসে ওঠে। হুরমুজ পত্রটি পারস্য সম্রাট উরদুশাহের বরাবর এই সংবাদ যোগ করে প্রেরণ করে যে, সে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য এ মুহূর্তেই সীমান্ত এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সীমান্তের অদূরেই সে মুসলমানদের খতম করে আসবে।

"হুরমুজের জয় হোক"–তার এক মন্ত্রী বলে, "যে শত্রু আপনি সীমান্তের বাইরে খতম করতে চান তারা পূর্ব হতেই সীমান্তের মধ্যে অবস্থানরত।" হুরমুজ প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তার কথার ব্যাখ্যা জানতে চায়। "তারা হচ্ছে আরব মুসলমান।" মন্ত্রী তার কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে দজলা এবং ফোরাতের মিলন মোহনায় তারা অবস্থান করে। উপকূলীয় এ এলাকাটি উবলা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। তারা অনেক পূর্ব হতেই ইরান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। মদীনাবাসীরা আমাদের উপর আক্রমণ করলে এ অঞ্চলের মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।"

"অভয় দিলে আমি একটি কথা পেশ করতে চাই" প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলে– "কয়েকদিন ধরে লাগাতার খবর আসছে যে, যুদ্ধসক্ষম অর্থাৎ যুবক শ্রেণীর মুসলমানরা নিজ নিজ এলাকা হতে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস তারা মুসান্না বিন হারেছার সাথে গিয়েই মিলিত হচ্ছে। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তারা এখন ফৌজরূপে সুসংগঠিত হচ্ছে।"

"উধাও হয়ে যাওয়ার এই ধারাবাহিকতা বন্ধ করতে আপনি কোন পদক্ষেপ নেননি?" হুরমুজ ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"সেনা বহর নিয়মিত টহল দিচ্ছে এবং কড়া নজরদারী করছে " প্রতিরক্ষামন্ত্রী জবাব দেয়।

"তারপরেও মুসলমানরা উধাও হয়ে যাচ্ছে?" হুরমুজ তাচ্ছিল্য ভরা ক্রোধ কণ্ঠে বলে "সীমান্তবর্তী চৌকিতে এখনই নির্দেশ পাঠাও, যেন তারা মুসলিম বসতিতে গেরিলা হামলা চালাতে থাকে। প্রত্যেকটি বসতির সমস্ত লোককে বাইরে বের করে দেখ, কতজন অনুপস্থিত এবং কতদিন ধরে অনুপস্থিত। যে পরিবার ও ঘরের লোক অনুপস্থিত পাবে তা জ্বালিয়ে দিবে। কোন মুসলমানকে সীমান্তের দিকে যেতে দেখলে তাকে বন্দী কর হত্যা করে ফেলবে । দূর হতে তীর নিক্ষেপ করবে।"

সীমান্তের গা ঘেঁষে একটি মুসলিম বসতি ছিল। কয়েকজন ইরানী সৈন্য সেখানে গিয়ে ঘোষণা করে যে, ছোট্ট শিশু থেকে নিয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই যেন বাইরে বেরিয়ে আসে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে টেনে হিঁছড়ে লোকদের বাইরে বের করতে থাকে। মহিলাদের এক স্থানে আর পুরুষদেরকে আরেক স্থানে দাঁড় করানো হয়। সৈন্যদের মেজাজ ছিল রুক্ষ এবং মূর্তি ছিল উগ্র। তারা কথায় কথায় বিশ্রি ভাষায় গালি দিচ্ছিল এবং ধাক্কা মেরে মেরে মানুষ এদিক ওদিক নিচ্ছিল । তারা বারবার এ কথা বলছিল যে, অত্র এলাকার যারা যারা অনুপস্থিত তাদের নাম বল এবং বাড়ী-ঘর দেখিয়ে দাও। সমস্ত জনতা নিরব নিশ্চুপ। কেউ মুখ খোলে না।

"জবাব দাও। বল কে কে নেই " ইরানী কমান্ডার রাগে গরগর করতে করতে চিল্লাতে থাকে।

কোন জবাব আসেনা। কমান্ডার এগিয়ে গিয়ে এক বৃদ্ধ লোকের ঘাড় ধরে নিজের দিকে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করে যে, বল্ এই জনতার মাঝে কে কে অনুপস্থিত।

"আমার জানা নেই" বৃদ্ধ জবাব দেয়।

কমান্ডার খাপ থেকে তরবারী বের করে বৃদ্ধের পেটে আমূল বসিয়ে দেয় এবং ঝটকা দিয়ে তরবারী বের করে আনে। বৃদ্ধ দুই হাত পিঠে রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কমান্ডার আরেকবার জনতার দিকে চায়। সহসা এক প্রান্ত হতে ৮/১০ টি ঘোড়া ছুটে আসে। প্রত্যেক আরোহীর হাতে বর্শা ছিল। তারা এত দ্রুত এসে উপস্থিত হয় যে, ইরানী বাহিনী ঠিকমত তাদের দেখতেও পায়না। অথচ এরই মধ্যে তাদের অধিকাংশের শরীর বর্শাবিদ্ধ করে অশ্বারোহীরা যে গতিতে আসে সে গতিতে বেরিয়ে যায়। ইরানীদের সংখ্যা ৪০ /৫০ জন ছিল । তাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ৮/১০ জন মাটিতে লুটিয়ে ছট ফট করছিল।

ছুটন্ত অশ্বের খুরধ্বনি শোনা যেতে থাকে, যা ক্রমশ দূরে সরে যেতে যেতে আবার নিকটে আসতে থাকে। এবার ফৌজের লোকেরা বর্শা এবং তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অশ্বারোহীদের পথের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু আচমকা পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। বসতির লোকেরা পশ্চাৎ হতে এক যোগে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। কল্পনাতীত এ অতর্কিত আক্রমণ হতে এক মাত্র তারাই জিন্দা থাকে, যারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণকারী আগন্তুকরা যখন আবার ফিরে জনতার কাছে আসে তখন তাদের বাধ্য হয়ে ঘোড়া থামাতে হয়। কারণ উপস্থিত জনতা ইরানীদের খতম করতে করতে তাদের সামনে এসে পড়ে।

ইতোপূর্বে মুসলমানরা এভাবে সামনাসামনি ইরানীদের মোকাবিলা করার সাহস করেনি। কোন ইরানীকে কিছু বললে তাকে তার গোত্রসহ উচ্ছেদ ও নির্মূল করে দেয়া হত। এবার মুসলমানরা এ কারণে সাহসী হয়ে ওঠে যে, তারা জানতে পেরেছিল যে, মদীনার সৈন্য এসে গেছে, যে অশ্বারোহীরা অতর্কিত এসে আক্রমণ করেছিল তাদের কতক ছিল অত্র অঞ্চলের আর কিছু ছিল অন্য বসতির । এটা দৈবাৎ ঘটনা ছিল যে, তারা মুসান্না বিন হারেছার আস্তানার উদ্দেশে যাবার জন্য এই বসতির কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা দূর থেকে এলাকাবাসীকে ঘর ছেড়ে বাইরে দাঁড়াতে এবং সেখানে ইরানীদের উপস্থিতি দেখতে পায়। তারা চাইলে ইরানীদের চোখ এড়িয়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু ইরানী কমান্ডার কর্তৃক বৃদ্ধের পেটে তরবারী ঢুকিয়ে দেয়ার দৃশ্য দেখে তারা পরস্পর পরামর্শ ছাড়াই ঘোড়ার মুখ ইরানীদের দিকে ফিরায়। ইরানীরা তাদের আগমনের কথা বিন্দুমাত্র টের পায় না। এটা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর সাহায্য, যা তারা ঠিক সময়ে অযাচিতভাবে লাভ করে।

এ এলাকার লোকদের সৌভাগ্যবানই বলতে হয়। কেননা তারা এভাবে গায়েবী সাহায্যের ফলে এবারের মত ইরানীদের নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু অন্যান্য বসতির অবস্থা ছিল কেয়ামত সদৃশ। তাদের উপর নেমে এসেছিল কেয়ামতের বিভিষীকা। প্রতিটি বসতির প্রত্যেকটি ঘর চেক করা হচ্ছিল। কতজন পুরুষ অনুপস্থিত তার তদন্ত নেয়া হতে থাকে । প্রতিটি বস্তিতে তারা এ সময় নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল কোন কোন ঘরে আগুন লাগিয়ে ভস্ম করে দেয়।

তিন-চার দিন ধরে এই অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও অপরাধচর্চা চলে। এর পরে বসতির দিকে খেয়াল দেয়ার সুযোগ ইরানীদের আর হয় না। হুরমুজ স্বসৈন্যে চলে আসে। সীমান্তে অবস্থানরত সৈন্যদেরকেও সে সাথে নিয়ে নেয় এবং সীমান্ত বর্তী এলাকা থেকে সামনে এগিয়ে যায়। তার ইচ্ছা ছিল সীমান্তের বহু দূরেই হযরত খালিদ বাহিনীর গতিরোধ করা। হুরমুজের অগ্রাভিযান দ্রুতগতির ছিল।

ছয়

৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ ১২ হিজরীর মুহাররম মাস। হযরত খালিদ (রাঃ) ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে ইয়ামামা হতে রওয়ানা হন। তারও গতি ছিল দ্রুততর।

হুরমুজ সৈন্য নিয়ে সীমান্ত হতে বহুদূর কাজিমা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে এবং সৈন্যদের সেখানেই তাঁবু স্থাপন করতে বলে। এ স্থানটি ইয়ামামা ও উবলার মাঝখানে ছিল। হুরমুজের জানা ছিল না যে, তার প্রতিটি অবস্থার মনিটরিং করা হচ্ছে। হযরত খালিদ (রাঃ) কাজিমা হতে বহু দূরে থাকতেই ইরাকের দিক হতে দু' উষ্ট্রারোহীকে এগিয়ে আসতে দেখেন। তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে জানান যে, হুরমুজ বাহিনী-কাজিমায় এসে ছাউনী ফেলেছে। হযরত খালিদ (রা.) সেখান থেকে রাস্তা বদল করেন। সংবাদবাহক উষ্ট্রারোহীরা হযরত মুসান্না (রাঃ) কতৃক প্রেরিত ছিল। তারা হযরত খালিদ (রাঃ) কে অনুরোধ করেন, যেন তিনি হুরমুজ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়েই হাফীরে গিয়ে পৌঁছেন। তারা এ সুসংবাদও শুনান যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য আট হাজার সৈন্য অপেক্ষা করছে। মুসান্না বিন হারেছা, মাজউর বিন আদী, হুরমূলা এবং সুলামা প্রত্যেকেই দুই দুই হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করায় এ আট হাজার সৈন্যের ব্যবস্থা হয়। এভাবে হযরত খালিদ (রাঃ) এর সৈন্য সংখ্যা ১৮ হাজার গিয়ে পৌঁছে।

হযরত খালিদ (রাঃ) নিরাপদে হাফীরে পৌঁছতে কাজিমার বহুদূর দিয়ে এগিয়ে চলেন। হুরমুজের চর মরু এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ)-এর সৈন্যদেরকে দূর রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে তারা দেখতে পায়। হুরমুজ ছাউনি উঠিয়ে দ্রুত হাফীরে মার্চ করে যাবার নির্দেশ দেয়। হাফীরের চতুর্দিকে পানির কূপ বিদ্যমান ছিল। হুরমুজ সেখানে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর পূর্বেই পৌঁছে গিয়ে

ছাউনি তৈরি করে ফেলে। এভাবে হাফীরের সকল পানির কূপ ইরানীদের কব্জায় চলে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) হাফীরে পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে আবার ঐ দু' উষ্ট্রা-রোহীর উদয় হয়। তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায় যে, ইতোমধ্যে হাফীরের সকল পানির এলাকা হুরমুজের কব্জায় চলে গেছে। হযরত খালিদ (রা.) সামনে আরো এগিয়ে গিয়ে এমন এক স্থানে ছাউনি ফেলার নির্দেশ দেন যার আশে পাশের কোথাও পানির ছিটা ফোঁটা ছিল না । সৈন্যরা সেখানে ছাউনি ফেললেও হযরত খালিদ (রা.) কে অবহিত কর হয় যে, সৈন্যদের মাঝে মৃদু এ গুঞ্জন উঠছে যে, এমন এক স্থানে ছাউনি ফেলা হয়েছে যার আশে পাশে কোথাও পানির নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

"আমি ভেবে চিন্তে এখানে ছাউনি ফেলেছি"– হযরত খালিদ (রাঃ) বলেন "সৈন্যদের জানিয়ে দাও যে, শত্রুরা পানি কব্জা করে ফেললেও তাতে পেরেশানীর কিছু নেই। আমাদের প্রথম লড়াই পানি উদ্ধারের জন্যই হবে। পানি সেই পাবে, যে জীবন বাজি রেখে লড়াই করবে। তোমরা দুশমনের কবল থেকে পানি ছিনিয়ে নিতে পারলে বুঝবে যুদ্ধ তোমরাই জিতে নিয়েছ।"

সর্বাধিনায়কের এ নির্দেশ মুহূর্তে ছাউনীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পৌছে যায়। প্রতিটি সৈন্য যুদ্ধ প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ও প্রস্তুত হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে মুসান্না ও তার সাথীদের সংগৃহীত ৮ হাজার সৈন্য হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হয়। হযরত খালিদ (রা.)-এর যে দূত হুরমুজের দরবারে গিয়েছিল তিনিও এ সময় এসে পৌছান। হুরমুজ তার সাথে যে অপমানজনক আচরণ করেছে তা তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে খুলে বলেন।

"এক লক্ষ দেরহামের টুপিই তার মাথা খারাপ করে দিয়েছে", সেখানে উপবিষ্ট হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রাঃ) বলেন–'মানুষের মাথায় কি আছে আল্লাহ তা দেখেন না; তিনি দেখেন ঐ মাথার মধ্যে কি আছে। তার উদ্দেশ্য কি। অভিপ্রায় কি। কোন ধ্যান-ধারণা নিয়ে সে চলে। "

"এক লক্ষ্য দেরহামের টুপি?" হযরত খালিদ (রাঃ) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন–"হুরমুজ সত্যই এত দামী টুপি পরে ?"

"পারস্য সাম্রাজ্যের একটি নিয়ম আছে" মুসান্না বিন হারেছা (রা.) জবাবে বলেন–"বংশকৌলিন্য, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং পদমর্যাদা বিবেচনায় তাদেরকে বিভিন্ন টুপি পরিধান করানো হয়। এটা রাষ্ট্রের পক্ষ হতে দেয়া হয়। অধিক মূল্যবান টুপি তারাই পরে যাদের বংশ মর্যাদা উন্নত এবং যারা প্রজাদের নিকট ও শাহী দরবারেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । বর্তমানে হুরমুজের টুপির মূল্যই সবচেয়ে বেশি। এক লক্ষ দেরহামের টুপি বর্তমানে আর কারো পরার অধিকার নেই।" "এই টুপি বহু মূল্যবান হীরা-পান্না খচিত। টুপির শীর্ষ পালকও বেশ

দামী।" ফেরাউনও তার মাথায় খোদায়ী টুপি ধারণ করেছিল " হযরত খালিদ (রাঃ) বলেন "কিন্তু আজ সে কোথায়? কোথায় গেল তার টুপি...কারো দামী টুপি আমাকে প্রভাবিত করবে না এবং কোন টুপি তরবারির আঘাত প্রতিহত করতে পারবে না। এর চেয়ে আমাকে বলো, অগ্নিপূজারীরা লড়াইয়ে কেমন এবং রণাঙ্গনে তারা কত দ্রুততার সাথে স্থান পরিবর্তন করে করে অসি চালাতে পারে?"

"পারস্য সিপাহীদের বর্ম এবং অস্ত্র দেখলে অন্তরে ভয় লাগে" হযরত মুসান্না (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে অবগত করেন, "মস্তকে জিঞ্জির বিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ, বাহুতে বিশেষ ধাতুর খোলস, পায়ের নলার দিক মোটা চামড়া কিংবা অন্য কোন ধাতু দ্বারা সংরক্ষিত। যুদ্ধাস্ত্র অনেক। প্রতিটি সিপাহীর কাছে একটি বর্শা, একটি তরবারী, একটি ভারী লৌহগদা, একটি ধনুক এবং তীর ভর্তি একটি তূনীর থাকে। সাধারণত প্রতিটি তূনীরে ত্রিশটি তীর থাকে।"

"আর লড়াই করতে কেমন পটু?" হযরত খালিদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন। "বীরত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে লড়ে তারা" মুসান্না বিন হারেছা জবাবে বলেন– "তাদের বীরত্বের কথা সর্বজনবিদিত।"

"মুসান্না!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন– "ইরান সিপাহীদের দুর্বলতার পরিমাণ তুমি অনুমান করতে পারনি? তাদের বীরত্বের পরিধি অনুধাবন করনি? ... তাদের বীরত্বের পরিধি শিরস্ত্রাণ, বাযুবন্ধ এবং হাটুর নীচের অংশ রক্ষার্থে ধাতু নির্মিত খোলস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তারা জানেনা যে, জযবা ও প্রেরণা লৌহ কেটে দু'ভাগ করে দিতে পারে। কিন্তু লোহার তরবারী এবং বর্শার ফলা প্রেরণা খণ্ডিত করতে পারেনা। বর্ম এবং ধাতু কিংবা চামড়ার খোল আত্মরক্ষার কৃত্রিম মাধ্যম। একটি খোল কেটে গেলে সিপাহী নিজেকে অরক্ষিত মনে করতে থাকে। এর পরে তার মাঝে কেবল এতটুকু সাহস থাকে যে, সে কোনভাবে আত্মরক্ষা করতে এবং রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আল্লাহর সৈন্যদের বর্ম হলো তার চেতনা এবং ইস্পাতদৃঢ় ঈমান। পারস্যদের আরেক দুর্বলতা তোমাদের দেখাব?" এর পর হযরত খালিদ (রা.) এক দূতকে ডেকে বলেন " সালার এবং কমান্ডারদের এখনি আসতে বল।"

"এখনই কাজিমা লক্ষ্যে সৈন্য মার্চ করাও" হযরত খালিদ (রাঃ) নির্দেশ দিয়ে বলেন–"এবং সৈন্যদের চলার গতি অত্যন্ত দ্রুত হওয়া চাই।"

হুরমুজ হাফীরায় ছাউনী ফেলে অবস্থান করছিল। সে কাজিমা থেকে স্বীয় বাহিনী এখানে এনেছিল। কেননা, হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী হাফীরা এসে গিয়েছিল। এখন সৈন্যরা আবার কাজিমা অভিমুখে রওনা হয়। উভয় ফৌজের কয়েক অশ্বারোহী পরস্পরের তাঁবুর উপর গভীর নজর রেখেছিল। হুরমুজ যখন খবর পায় যে, মুসলিম বাহিনী আবার কাজিমার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে। তখন হুরমুজও তার বাহিনীকে কাজিমার উদ্দেশে মার্চ করার নির্দেশ দেয়।

হুরমুজের চিন্তা ছিল উবলা এলাকা নিয়ে। এটা ইরানী সাম্রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর ছিল। বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল এটা। হিন্দুস্থানের বণিক কাফেলাদের আনাগোনা এ স্থানেই বেশী হত । বিশেষ করে সিন্ধুর পণ্যসামগ্রী এখানেই এসে পৌছত। এখানে ইরানী সেনাবাহিনীর হেড কোয়াটারও অবস্থিত ছিল। অত্র এলাকায় বসবাসরত মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে উবলায় সবসময় রিজার্ভ বাহিনী থাকত। হুরমুজ চাচ্ছিল খালিদ বাহিনী যেন কোন ভাবেই উবলায় পৌছতে না পারে। হুরমুজের কাছে উবলা এখন পূর্বের তুলনায় অধিক বিপদাপন্ন মনে হতে থাকে। কারণ, মুসলামনদের গতি এখন উবলার দক্ষিণে কাজিমার প্রতি ছিল।

মুসলমানদের জন্য পুনরায় কাজিমা যাওয়া এত কঠিন ছিল না, যত কঠিন ছিল হরমুজ বাহিনীর জন্য। মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ উট ঘোড়া ছিল। সৈন্যরাও সকলে হাল্কা-পাতলা অস্ত্রধারী ছিল। তারা অতি সহজে দ্রুত চলতে পারত। পক্ষান্তরে ইরানী সৈন্যরা বর্ম এবং অস্ত্র-শস্ত্রে ঠাসা ছিল। যার ফলে দ্রুত চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা। তারপরও মাত্র একদিন পূর্বে তারা কাজিমা হতে হাফীরা এসেছিল সে সফরের ক্লান্তি কাটিয়ে না উঠতেই তাদের আবার কাজিমার উদ্দেশ্য মার্চ করতে হয়। তাও আবার অতি দ্রুত । কেননা মুসলমানদের সেখানে পৌছার পূর্বেই তারা পৌছতে চায়। ফলে সৈন্যরা পথিমধ্যেই দারুণ হাফিয়ে ওঠে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে যেতে থাকে তাদের শরীর। হুরমুজের বাহিনী কাজিমায় যখন মুসলমানদের মোকাবিলায় পৌছে তখন তাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। মুসলিম সৈন্যরা মরুযুদ্ধ এবং মরুভূমিতে চলাফেরা করায় অভ্যস্ত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় দেন না। শত্রুরা কাজিমায় পৌছতেই হযরত খালিদ (রা.) তার বাহিনীকে পুরোপুরি যুদ্ধ সাজে বিন্যস্ত করে ফেলেন। তিনি পুরো বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করে নিজে মধ্যম বাহিনীতে থাকেন । ডান এবং বাম বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন যথাক্রমে হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)। হযরত কা'কা' বিন আমর (রা.)–এর সহোদর ছিলেন হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)। তিনি গোত্রের সর্দার ছিলেন। তিনি বড় উচু লম্বা এবং বলিষ্ঠ শরীরের বীর বাহাদুর ছিলেন।

হযরত খালিদ (রাঃ)-কে সৈন্য বিন্যস্ত করতে দেখে হুরমুজও তার বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করে। মধ্যম বাহিনীতে সে নিজে থাকে। অপর দু' অংশের নেতৃত্বে থাকে কুববাজ এবং আনুশাযান নামক শাহী খান্দানের দুই ব্যক্তি। হুরমুজ ঠিকই দেখে যে, তার ফৌজ ঘামে নেয়ে যাচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইছে। তাদের রেষ্টের খুব প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমানরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে থাকায় বাধ্য হয়ে তাকেও সৈন্য বিন্যস্ত করতে হয়। হুরমুজ তার বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যে, কাজিমা শহর তার ফৌজের পশ্চাতে এসে যায়। তাদের সামনে

ধু ধু মরুভূমি ছিল। আর আরেক দিকে ঘন ঝোঁপ-ঝাড়পূর্ণ টিলা বিশিষ্ট সারি সারি পাহাড় ছিল।

হযরত খালিদ (রাঃ) স্বীয় বাহিনীকে এমনভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় যে, পাহাড়ের সারিগুলো সব তাঁর বাহিনীর পশ্চাতে চলে যায়।

৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ। এ সময়ে প্রথমবারের মত মুসলমানরা অগ্নিপূজক ইরানীদের মোকাবিলা করে।

"খালিদ বিন ওলীদ মারা গেলে এ যুদ্ধ কোনরূপ সংঘর্ষ ছাড়াই শেষ হতে পারে" হুরমুজের এক সেনাপতি তাকে বলে। "মুসলমানরা অনেক দূর থেকে এসেছে। সেনাপতির মৃত্যুর পর বেশিক্ষণ তারা আমাদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারবে না।"

"সৈন্যদেরকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে বল" হুরমুজ সালারকে বলে 'আমি তাদের সেনাপতির ব্যবস্থা করছি। সর্বাগ্রে সেই নিহত হবে।" এর পর সে সালারকে পাঠিয়ে বডিগার্ড বাহিনীকে ডেকে পাঠায় এবং তাদেরকে কিছু নির্দেশনা দেয়। জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পাঁচ পাঁচজন বা দশ দশজন করে ইরানী সৈন্যরা একটি লম্বা শিকলে নিজেদের আবদ্ধ করত। তবে প্রতি দু'জনের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব থাকত, যাতে সৈন্যটি ইচ্ছামত নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লড়াই করতে পারে। শিকল বাঁধার একটি লাভ এই ছিল যে, কোন সৈন্য রণাঙ্গনে থেকে পালাতে পারত না। আরেকটি ফায়দা ছিল, শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী তাদের উপর চড়াও হলে তারা শিকল জমিন থেকে উচুঁ করে ধরত। যার ফলে ঘোড়া শিকলে বেঁধে পড়ে যেত । কিন্তু শিকল বাঁধার একটি বড় ক্ষতি এই ছিল যে, শৃঙ্খলিত সৈন্যদের কেউ নিহত বা আহত হলে বাকী সবাই বিরাট সমস্যায় পড়ত । তখন মারা যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকত না। সহজে শত্রুপক্ষ তাদের প্রাণ হরণ করতে পারত।

ইরান সৈন্যরা এভাবে ব্যাপকভাবে নিজেদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে নেয়ায় হুরমুজ বাহিনী বনাম হযরত খালিদ বাহিনীর মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধের নাম হয়ে যায় **জঙ্গে সালাসীল** বা 'শিকলযুদ্ধ'।

মুসলিম বাহিনী ইরানীদেরকে এভাবে শৃঙ্খলিত হতে দেখে বিস্মিত হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি জোরে চিৎকার করে বলে "দেখ দেখ, ইরানীরা আমাদের জন্য নিজেদেরকে বাঁধছে।

'বিজয় আমাদেরই হবে ইনশাআল্লাহ' হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন– "আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন।"

হযরত খালিদ (রাঃ) যে উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজিমা থেকে হাফিরা এবং আবার হাফীরা থেকে কাজিমায় আসেন তা পদে পদে বাস্তবায়িত হতে দেখেন। ভারী অস্ত্রে বোঝাই হুরমুজ বাহিনী লড়াই শুরু হওয়ার পূবেই ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাদেরকে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেননা । তদুপরি ইরানীরা নিজেদেরকে শিকলে আবদ্ধ করে নেয়। হযরত খালিদ (রাঃ) ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে কি চাল চালবেন এবং ইরানীদের কিভাবে লড়াবেন।

হুরমুজ অশ্ব ছুটিয়ে দেয় এবং উভয় বাহিনীর মধ্যখানে এমন এক স্থানে এসে ঘোড়া দাঁড় করায় যেখানে জমিন উচুঁ নীচু এবং ইতস্তত টিলা ছড়িয়ে ছিল। তার বডিগার্ড বাহিনী কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায়।

"কোথায় সে খালিদ!" হুরমুজ হুঙ্কার দিয়ে বলে " আয়, প্রথমে তোর আর আমার মাঝে মোকাবিলা হয়ে যাক।"

তৎকালীন যুগের যুদ্ধ রীতি এই ছিল যে, মূল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের সেনাপতি মল্লযুদ্ধের আহ্বান করত। উভয় সৈন্য বাহিনী হতে এক একজন এসে পরস্পরের সাথে তরবারীর লড়াই করত আবার কুস্তিও লড়ত। এটাকে বলা হত মল্লযুদ্ধ। এ যুদ্ধে দু'জনের একজনের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। এই যুদ্ধে হুরমুজ নিজেই এসে হযরত খালিদ (রা.)-কে মল্ল যুদ্ধে লড়তে আহবান করে। হুরমুজ নামকরা বীর বাহাদুর ছিল। তরবারী চালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াও তার দেহে গণ্ডারের মত শক্তি ছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর বয়স ৪৮ ছুঁই ছুঁই । তিনি অদ্বিতীয় সমর কুশলী ছিলেন। তাঁর দেহে তখনও প্রচুর শক্তি ছিল। তবে শক্তির পরিমাপে হুরমুজের পাল্লাই ছিল ভারী। হুরমুজের আহবান শুনে হযরত খালিদ (রা.) অশ্ব ছুটিয়ে দেন এবং সোজা হুরমুজের সামনে এস দাঁড়ান। হুরমুজও অশ্ব থেকে নেমে আসে এবং হযরত খালিদ (রা.)-কেও নামার জন্য ইশারা করে। উভয়ের হাতে **"নাঙ্গা তলোয়ার।"**

শুরু হয় আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ। লড়ে চলে উভয়ের তরবারী এবং ঢাল তরবারী সংঘর্ষের ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ আর মাঝপথে এসে বাধ সাধা ঢালের ঠাস ঠাস শব্দে মুহূর্তে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে মরুভূমি । উভয়ের একে অপরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে। চাল পরিবর্তন করে । ঘুরে ঘুরে একে অপরের উপর চড়াও হয়। কিন্তু সকল আঘাত প্রতিঘাত তরবারীদ্বয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। যে কোন আঘাত একে অপরে ভাগ করে নিতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হযরত খালিদ (রা.)-এর হাত খুলে যায়। এবং চালে চমক আসতে থাকে। সাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে তার মধ্যে। উভয় বাহিনী দূরে দাঁড়িয়ে অনিমেষ লোচনে উপভোগ করছিল দুই মহা সেনাপতির মল্লযুদ্ধ। উভয় বাহিনীতে চাঁপা উত্তেজনা; উদ্বেগে চেয়ে থাকা চোখগুলোতে একটিই প্রশ্ন ঝরে পড়ছিল যে, এই সেয়ানে সেয়ানে লড়াইয়ে কে হারবে, কে পরবে বিজয়ের বরমাল্য? উভয় বাহিনী থেকে থেকে স্লোগান তুলছিল। হুরমুজ অভিজ্ঞ বীর ছিল। সে নিশ্চিত হয়ে যায়

যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর তরবারি তাকে ক্ষমা করবে না। তরবারির গতিই বলে দিচ্ছিল তার প্রাণ সংহার নিশ্চিত। সে নিজেকে বাঁচাতে কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়। দ্রুত পিছনে সরে গিয়ে তলোয়ার দূরে ছুঁড়ে দেয়।

"তলোয়ারের চূড়ান্ত ফায়সালা হবেনা"– হুরমুজ বলে– "আয় খালিদ! তরবারি ফেলে আয় এবং কুস্তি লড়।"

হযরত খালিদ (রা.) তলোয়ার দূরে ছুড়ে দিয়ে কুস্তি লড়তে সামনে অগ্রসর হন এবং উভয়ে একে অপরকে জাপটে ধরে। কুস্তিতে হুরমুজের পাল্লা ভারী হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে, কুস্তি লড়াইয়ের ক্ষেত্রে হুরমুজের মতলব ভিন্ন। হুরমুজ তার বডিগার্ড বাহিনীকে বলে রেখেছিল যে, যখন সে হযরত খালিদ (রা.)-কে এমন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে যে, তার নড়া চড়ার কোন শক্তি থাকবে না তখন তারা চতুর্দিক দিয়ে তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়াবে, যেন তাদের হাভ-ভাবে কারো সন্দেহের সৃষ্টি না করে। অথাৎ তারা আমোদী দর্শকের মতই আঁচার-আচরণ প্রকাশ করবে। কিন্তু তার মধ্যে কৌশলে এক মুহাফিজ (দেহরক্ষী) খঞ্জর বের করে হযরত খালিদ (রাঃ) এর পেটে আমূল বসিয়ে দেবে। প্রকৃত যোদ্ধা কখনো প্রতিপক্ষকে এমন ধোঁকা দেয় না। কিন্তু হুরমুজ এতই জঘন্য প্রকৃতির ছিল যে, সে একজন নামকরা যোদ্ধা হয়েও এমন প্রতারণামূলক ষড়যন্ত্র করে। হযরত খালিদ (রা.)-কে কোন রকমে বাগে পেয়েই দুরাচারী হুরমুজ দেহরক্ষী বাহিনীকে এগিয়ে আসতে ইশারা করে। দেহরক্ষীরা এগিয়ে আসতে থাকে। এবং স্লোগান দিতে দিতে বৃত্তের আকারে রূপ নিতে থাকে। তারা এ সময় ঘোড়ায় সওয়ার ছিল না। তারা ক্রমেই বৃত্ত সংকীর্ণ করে আনতে আনতে কুস্তি লড়াকুদ্বয়ের নিকটে চলে আসে। দেহরক্ষীদের কাছে আসতে দেখে হযরত খালিদ (রা)-এর দৃষ্টি দু'দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। ক্ষণিকের জন্য যে অন্যমনস্কতা তার মাঝে সৃষ্টি হয় হুরমুজ তাকে লুফে নেয় এবং এই সুযোগে হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহুদ্বয় এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরে যে, তার হস্ত দ্বয় হযরত খালিদ (রা.) এর বগলে ছিল। ইতোমধ্যে দেহরক্ষীরা আরো নিকটে চলে আসে।

হুরমুজ দেহরক্ষীদের লক্ষ্য করে মুখে কি যেন বলে। হযরত খালিদ (রা.) তার ভাষা না বুঝলেও ইশারা ঠিকই অনুধাবন করেন। তিনি নিজেকে বিপদের সম্মুখীন দেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেন এবং শরীরের সমস্ত শক্তি এক স্থানে জমা করে এমন জোরে ঘুরতে থাকেন যে, হুরমুজকেও নিজের সাথে নিয়ে ঘুরেন। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.) এক স্থানে দাঁড়িয়ে ঘুরতে থাকেন। প্রচণ্ড ঘূর্ণনের কারণে হুরমুজের পা মাটিশূন্য হয়ে যায়।। হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজের বাহু নিজের বগলে চেপে ধরে তার বগলে নিজের হাত রেখে তাকে শূন্যে ঘুরাতে থাকেন। এভাবে ঘূর্ণনের ফলে দেহরক্ষীদের বৃত্ত প্রসারিত হতে থাকে এবং কেউ আগে

বেড়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর উপর আক্রমণ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘূর্ণন কৌশল বেশীক্ষণ টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ, দীর্ঘ পরিশ্রমে তিনি যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আচমকা এক প্রান্ত হতে একটি অশ্ব ছুটে আসে। আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত দেহরক্ষীরা এ অশ্ব দেখতে পায় না। অশ্ব বিদুৎগতিতে দেহরক্ষীদের বৃত্ত কাটতে কাটতে আগে বেরিয়ে যায়। তিন দেহরক্ষী মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে থাকে। তাদের একজন অশ্বের পদতলে পিষ্ট হয় আর বাকী দু'জন আগন্তুক অশ্বারেহীর তলোয়ারে দ্বিখণ্ডিত হয়। ঘাতক অশ্ব কিছুদূর গিয়ে আবার পিছনে মোড় নেয় এবং পুনরায় হুরমুজের দেহরক্ষীদের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে। দেহরক্ষীরা নিজেদের বাঁচাতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেও আবারও তিন দেহরক্ষী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। চোখের পলকে ৬ সাথীর এভাবে নির্মম নিহত হতে দেখে তারা ভড়কে যায় এবং পালিয়ে মূল বাহিনীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই আগন্তুক অশ্বারোহী ছিলেন হযরত কা'কা' বিন আমর (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে হযরত খালিদ (রা.)-এর সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন " যে পক্ষে কা'কার মত দূরন্ত যোদ্ধা থাকবে তারা হারবে না।"

ক্ষণিকের জন্য দর্শকের দৃষ্টি হযরত কা'কা' (রা.)-এর চোখ ধাঁধাঁনো দৃশ্যের দিকে নিবদ্ধ হলেও আবার সবার দৃষ্টি হুরমুজ ও হযরত খালিদ (রা.)–এর দিকে ফিরে যায়। সকলের চোখে মুখে রাজ্যের বিস্ময় নেমে আসে। যে হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রাণ যায় যায় করছিল তিনিই এখন চেঁপে বসা পাপীষ্ঠ হুরমুজের বুকে, আর হুরমুজ নিথর নিস্তব্ধ দেহে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়েছিল। হযরত খালিদ (রাঃ)-এর খঞ্জর এক সময় হুরমুজের বুক থেকে বেরিয়ে আসে। খঞ্জর থেকে রক্ত টপ টপ করে পড়ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজের আহবানে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হতে গেলে হযরত কা'কা বিন আমর (রাঃ) ঘটনা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। হুরমুজের দেহরক্ষীদের বৃত্তাকারে এগিয়ে আসতে দেখে হযরত খালিদ (রা.)-এর জীবনের ব্যাপারে তাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তিনি এগিয়ে যান এবং বাস্তবে যখন হযরত খালিদ (রা.)-এর জীবন সংকটাপন্ন এবং তিনি নিজেকে বাঁচাতে প্রানান্ত প্রয়াসরত, তখন তিনি কারো নির্দেশ কিংবা অনুমান ছাড়াই ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং দেহরক্ষীদের উপর আক্রমণ করে হযরত খালিদ (রা.)–এর জীবনরক্ষা করেন।

হযরত খালিদ (রা.) হুরমুজের লাশের উপর থেকে উঠে দাঁড়ান। এখন এক লক্ষ দেরহাম মূল্যের টুপি হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে। এবং তার রক্তে রঞ্জিত খঞ্জর উঁচু করে তুলে ধরে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে মূল যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তাঁর পূর্বের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীর দুই অংশ দুই দিক থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডান ও বাম দিক থেকে

তারা ইরানী বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। ইরানীরা হুরমুজের মত সেনাপতির মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লেও স্বীয় ঐতিহ্যজাত বীরত্বের কারণে তারা অস্ত্র ত্যাগ করেনা। তাদের সংখ্যাও মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। যুদ্ধ সামগ্রী অস্ত্র, অশ্বের কোন কমতি তাদের ছিল না। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা দারুণ রুখে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে, ইরানীদের পরাজিত করা সম্ভব নয়; আর হলেও তা হবে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। ইরানী সৈন্যরা পাঁচজন, সাতজন দশজন করে এক এক শিকলে বাঁধা ছিল। তারা চতুর্মুখী আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাদের ক্লান্ত করে তোলার জন্য অশ্বারোহীদের ব্যবহার করেন। অশ্বারোহীরা তাদের পদাতিক তীব্রগতির আক্রমণ শুরু করে যে, তাদের প্রাণ বাঁচাতে ডানে বামে ছুটোছুটি করতে হয়। পদাতিক বাহিনীকেও হযরত খালিদ (রাঃ) এমনিভাবে লড়িয়ে যান। ইরানী পদাতিকরা দিশেহারা হয়ে পলায়নের সহজ পথ খুঁজতে থাকে। এর বিপরীতে মুসলমানরা হাল্কা অস্ত্র সজ্জিত হওয়ায় দ্রুততার সাথে স্থান পরিবর্তন করে যেভাবে ইচ্ছা লড়াই করছিল।

কিছুক্ষণ পর ইরানীদের মাঝে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাঁপ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হতে থাকে। ঐতিহ্যগত ধারা হিসেবে তারা নিজেদেরকে যে শিকলে আবদ্ধ করেছিল পরে তা তাদের পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়। ভারী অস্ত্রের বোঝাই তাদের জীবনের জন্য অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। ইরানীদের শৃঙ্খলা ও সুসংঘবদ্ধতায় ফাটল সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের মধ্যম বাহিনীর কমাণ্ড হুরমুজের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পার্শ্ব বাহিনীদ্বয়ের কমান্ডার কুববায এবং অনুশযান পরাজয় নিশ্চিত অনুধাবন করে সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দেয়। পিছু হটা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল যারা শিকলে বাঁধা ছিল না। এদের অধিকাংশই ছিল অশ্বারোহী। কুববায এবং অনুশাযান নিজ নিজ পার্শ্ব বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য নিরাপদে পিছে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলেও মধ্যম বাহিনী শৃঙ্খলিত থাকায় তাদের হাজার হাজার সৈন্য মুসলমানদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। শৃঙ্খলিত সৈন্যদের উপর এটা ছিল এক ধরনের পাইকারী হত্যা, যা সূর্য অস্ত মিত হওয়ার পরেও চলতে থাকে। রাত বেশ গাঢ় হলে হত্যাযজ্ঞের ধারা বন্ধ হয়।

॥ সাত ॥

এক বিরাট শক্তিশালী শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দুনিয়ার সামনে মুসলমানরা এই নজির স্থাপন করে যে, সংখ্যাধিক্য এবং উন্নত হাতিয়ার হলেই যুদ্ধজয় করা যায় না। জযবা এবং প্রেরণাসিক্ত লড়াই করেই যুদ্ধ জিতে নিতে হয়। পরের দিন গনীমতের মাল জমা করা হয়। হযরত খালিদ (রা.) পুরো মাল পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন আর একভাগ বাইতুল মালে জমা দেয়ার জন্য মদীনায় খলীফা আবু বকর (রা.) এর

বরাবর পাঠিয়ে দেন। হুরমুজের এক লক্ষ্য দেরহাম মূল্যের টুপিও হযরত খালিদ (রা.) খলিফার নিকট পাঠিয়ে দেন। খলীফা এই টুপি হযরত খালিদ (রা.)–কে ফেরৎ পাঠান। কারণ, মল্লযুদ্ধে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত মাল- সম্পদের প্রাপক হয়ে থাকে। ফলে মল্লযুদ্ধে হুরমুজকে হত্যা করায় তার এ টুপির মালিক হয়ে যান হযরত খালিদ (রা.) ।

"দেখ দেখ বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ এটা আবার কি!"

মদিনার অলি গলিতে এমনি ধরনের আওয়াজ ক্রমশই উচ্চারিত হতে থাকে। মানুষ পাল্লা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে কে কার আগে যাবে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

" এটা কোন প্রাণী হবে" জনতার বুক চিরে এক আওয়াজ।

"না... খোদার কসম, এমন প্রাণী কখনো আমরা দেখিনি" প্রথম আওয়াজ প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয় আওয়াজ ।

"এটা কোন প্রাণী নয়.... আল্লাহর বিস্ময়কর এক সৃষ্টি" কিছুটা বিজ্ঞতা ভাব মিশ্রিত তৃতীয় আওয়াজ আসে।

ঘরের মহিলা ও শিশুরাও ছুটে আসে। সবার চোখে প্রশ্ন, চেহরায় বিস্ময়ের ছাঁপ। ছোটরা এক নজরে দেখেই ভয়ে মায়ের আঁচল কিংবা পিতার পিছনে গিয়ে লুকায়। যারা আল্লাহর এই আজব প্রাণী ধরে রেখেছিলেন তারা জনতার উৎসুক হাবভাব দেখে মুচকি হাসছিলেন। আজব প্রাণীর পিঠে যারা বসা ছিল তাদের মুখেও হাসি শোভা পাচ্ছিল।

"এটা কি ?" জনতা জানতে চায় "এটাকে কি বলে?"

"একে হাতি বলে" হাতির সাথে সাথে গমনকারী এক ব্যক্তি উচ্চ আওয়াজে বলে–"এটা একটা যুদ্ধ প্রাণী। ইরানীদের থেকে এটা আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি।"

শিকলযুদ্ধে ইরানী বাহিনী পশ্চাদপসারণ করলে এ হাতিটি মুসলমানদের হস্ত গত হয়। প্রায় সকল ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) গনীমতের মালের যে এক পঞ্চমাংশ খলীফা বরাবর পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হাতিও ছিল। মদীনাবাসী ইতোপূর্বে হাতি দেখেনি। হাতিটি মদীনার শহর নগরসহ প্রতিটি অলি-গলিতে প্রদর্শনী করে ফিরান হয় । সবাইকে প্রাণীটি বিস্মিত করে। অনেকে ভীতও হয়ে পড়ে। তারা একে প্রাণী নয়; আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি বলত। হাতির সাথে তার ইরানী মাহুতও ছিল।

হাতিটি মদীনায় কয়েকদিন রাখা হয়। বসে বসে খাওয়া ছাড়া তার অন্য কোন কাজ ছিল না। হাতি থেকে কাজ নেয়ার পদ্ধতিও মদীনাবাসীদের জানা ছিল না। আর জানলেও মাত্র একটি হাতি দিয়ে আর কিইবা করা যায়। আমীরুল মু'মিনীন মাহুত সহ হাতিটি আযাদ করে দেন। কোন ইতিহাসে এ তথ্য উল্লিখিত হয়নি যে, হাতিটি মদীনা হতে কোথায় চলে যায়।

দজলা এবং ফোরাত আজও প্রবহমান । এক হাজার তিনশ বায়ান্ন বছর পূর্বেও প্রবাহমান ছিল। তবে সেদিনের প্রবাহ আর আজকের প্রবাহের মাঝে ব্যবধান আকাশপাতাল। সাড়ে তেরশ বছর পূর্বে দজলা এবং ফোরাতের লহরে ইসলামের বীর মুজাহিদদের প্রেরণা এবং জয়বার কলতান উঠত। এ সকল দরিয়ার পানিতে শহীদদের তাজা খুন মিশ্রিত ছিল। রেসালাত চেরাগের প্রেমিকগণ দজলা এবং ফোরাতের উপকূল বেয়ে ইসলামকে শুধু সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। এদিকে যরথুস্ত্রের আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে মুসলমানদের গতিরোধ করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা দুর্বার গতিতে সকল বাধা পেরিয়ে শুধু এগিয়েই চলতে থাকে।

মুসলমানদের জন্য সামনে এগিয়ে চলা সহজ ছিল না। তারা ইরান সাম্রাজ্যের লেজে পাড়া দিয়েছিল । মুসলমানদের সংখ্যা কম এবং তোজোদ্যম হ্রাস পেতে থাকে। অপরদিকে শত্রুদের সমর শক্তি ছিল রীতিমত উদ্বেগজনক পরিমাণ। পরিস্থিতি কখনো এমন দাঁড়াত যে, মনে হত ইরানীদের বিশাল সমরশক্তি মুসলমানদের মুষ্টিমেয় সৈন্যদেরকে তাদের বিশাল পেটে টেনে নিচ্ছে।

পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মাদায়েন। সম্রাট উরদূশের সিংহাসনে উপবিষ্ট। গর্বে মাথা স্বাভাবিকতার চেয়েও কয়েক ইঞ্চি উঁচু ছিল তার। সিংহাসনের ডানে-বামে ভবন মোহিনী শাহী পাখা আলতো দোলাচ্ছিল। সম্রাট সিংহাসন থেকে উঠছিল ইতোমধ্যে তাকে জানানো হয় যে, উবলা রণাঙ্গন থেকে দূত এসেছে।

"এখনি নিয়ে এস" উরদূশের বাদশাহী ভঙ্গিতে বলে- "সে এ ছাড়া আর কিইবা খবর নিয়ে আসবে যে, হুরমুজ মুসলমানদের কচুকাটা কেটেছে।... আরবের ঐ বর্বর ও বদ্দুরা আর কতটুকুই বা শক্তি রাখে যারা খেজুর এবং যব ছাড়া আর কোন খাদ্য বস্তু চোখেই দেখেনি।" দূত দরবারে প্রবেশ করলে তার চেহারা এবং ভঙ্গিই বলে দেয় যে, সে কোন শুভ সংবাদ আনেনি। দূত ভেতরে ঢুকেই এক বাহু সোজা উপরে তুলে ধরে এবং নতশির হয়ে ঝুকে পড়ে।

"সোজা হয়ে দাঁড়াও" উরদূশের বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে " শুভ সংবাদ শুনতে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি না। ...মুসলমানদের নারীদেরও কি বন্দী করা হয়েছে?...জবাব দাও... তুমি এভাবে নীরব কেন?" " ইরানের সিংহাসন অমর হোক", দূত রাজদরবারের শিষ্টাচার হিসেবে বলে-"সম্রাট উরদূশেরের সাম্রাজ্য... ।"

"কি খবর এনেছ, তাই বল" উরদূশের গর্জে ওঠে বলে। রাজাধিরাজ! হুরমুজ সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে" দূত বলে।

"হুরমুজ?" উরদূশের চমকে উঠে সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং একরাশ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করে "সাহায্য চেয়েছে?... সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ছে না?

সে কি যুদ্ধে টিকে উঠতে পারছে না? ... আমি তো শুনেছি, মুসলমানরা লুটেরাদের একটি গ্রুপের মত বৈ নয়। তাহলে হুরমুজের হলটা কি? যুদ্ধের পূর্বে সে সৈন্যদের শিকলাবদ্ধ করেনি?... বল, জবাব দাও ।" সারা দরবারে নীরবতা নেমে আসে ! যেন সেখানে কোন মানব-জন নেই;চারপাশের দেয়ালগুলো নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে।

"ইরান সাম্রাজ্য দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপৃত হোক", দূত বলে– "শিকল বাঁধা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু মুসলমানরা এমন চাল চালে যে, পরবর্তীতে ঐ শিকল তাদের পায়ের বেড়িতে পরিণত হয়।"

" মদীনাবাসীদের সংখ্যা কত ?" সম্রাট জানতে চায়।

"মহারাজ! খুবই কম" দূত জবাবে বলে "আমাদের সংখ্যার কাছে তাদের সংখ্যা গণনার বাইরে ছিল কিন্তু ... ।"

"দূর হ সামনে থেকে" সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরে একটু শান্ত হয়ে বলে " কারেনকে ডাক।"

ইরান ফৌজের আরেক নামকরা বীর সালার কারেন বিন করয়ানুসা। শাহী দরবারে তার যথেষ্ট কদর ছিল। হুরমুজের মত তার মস্তকেও এক লক্ষ দেরহাম মূল্যের রাজকীয় টুপি শোভা পেত। সম্রাটের আজ্ঞা পেয়েই সে ছুটে আসে।

"কারেন!" উরদূশের বলে "এ কথা তোমার বিশ্বাস হয় যে, হুরমুজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে?" এরপর উরদূশের দরবারের আমত্যবর্গের প্রতি দৃষ্টি প্রদক্ষিণ করালে তারা উঠে দাঁড়ায় এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে মাথা ঝুঁকিয়ে এক এক করে বাইরে বেরিয়ে যায়। উরদূশের একান্তে কারেনের সাথে কথা বলতে চায় "দূত মুসলমান পক্ষের হয়ে আমাদের ধোঁকা দিতে আসেনি তো?"

"মুসলমানরা এতদূর স্পর্ধা দেখাতে পারে না"– কারেন বলে– "রণাঙ্গনে সামান্য ভুলেই চিত্র পাল্টে যায়। হুরমুজ সাহায্য চেয়ে পাঠালে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার বাস্তবেই সাহায্যের প্রয়োজন এবং তার থেকে কোন ভুল হয়ে গেছে।"

"মুসলমানদের মধ্যে এই হিম্মত আছে যে তারা আমাদের ফৌজ পিছপা করে দেবে?" উরদূশের জিজ্ঞাসা করে।

তাদের মধ্যে শুধু হিম্মতই নয়, প্রচুর সাহসও রয়েছে"–কারেন বলে–"তারা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুধ হয়ে লড়ে। উবলা এলাকায় আমরা মুসলমানদের এমন নীচু অবস্থায় রেখেছিলাম যে, তারা পোকা-মাকড়ের মত জীবনযাপন করত। কিন্তু তারা মারাত্মক আক্রমণ করে এবং একের পর এক গুপ্ত হামলা চালিয়ে অত্র এলাকার চৌকিগুলো লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে... আজ পর্যন্ত তারা যত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার একটিতেও পরাজিত হয়নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রতিটি যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তুলনায় তাদের সৈন্যসংখ্যা কম ছিল। আর তাদের কাছে ঘোড়াও বেশি একটা ছিল না। "

"তাদের যোদ্ধারাও এমনি সাধারণ পর্যায়ের হবে"– সম্রাট উরদূশের বলে– "তাদের পক্ষে আমাদের সৈন্যের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু তারা তো ইতোমধ্যেই মোকাবিলা করে ফেলেছে"– কারেন বলে "এবং আমাদের এত বড় অভিজ্ঞ সেনাপতি হুরমুজ সাহায্য চেয়ে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছে।... মহামান্য সম্রাট! শত্রুকে এত ছোট ও তুচ্ছ করে দেখা ঠিক নয়। আমাদের অযথা দাম্ভিকতা দেখানো ঠিক হবে না। বাস্তব অবস্থা সামনে রেখে কথা বলতে হবে। বাস্তবতা তলিয়ে দেখতে হবে। পারস্যের দাপট রয়েছে ঠিকই কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রোমকরা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। এবং এখনো আমরা রোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বিব্রতবোধ করি। তাই সৃষ্ট এ নয়া পরিস্থিতি ও আমাদের বাস্তবতা দিয়ে বিচার করতে হবে। হুরমুজ আসলেই সাহায্য চেয়ে পাঠালে তার অর্থ হলো, মুসলমানরা তাকে কাবু করে ফেলেছে।"

"আমি তোমাকে এজন্যই ডেকে পাঠিয়েছি যে, তুমিই হুরমুজের সাহায্য এগিয়ে যাবে"–উরদূশের বলে–"হুরমুজ ঘাবড়ে গিয়ে থাকলে তার সাহায্যার্থে তার চেয়ে ভাল না হোক অন্তত তার মতই এক সেনাপতি যাওয়া দরকার। তুমি এমন বাহিনী তৈরি কর, যাদের দেখলেই মুসলমানরা 'মদিনায় ভেগে যাবে না কি যুদ্ধ করবে" পুনঃ বিবেচনা করতে বাধ্য হয়।... জলদি কারেন ! দ্রুত রওয়ানা হয়ে যাও।"

কারেন সামনে কোন কথা বাড়ায় না। বিদায়ী কুর্নিস করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে দরবার থেকে প্রস্থান করে।

ইরানী সেনাপতি কারেন বিশাল বাহিনী নিয়ে উবলার উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। সে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই চলে যে, মুসলমানদের নাম নিশানা মিটিয়েই তবে ফিরবেন। দজলার বাম কিনারা দিয়ে সে তার বহিনীকে নিয়ে যায়। সৈন্যদের চলার গতি ছিল দ্রুত। সে মাজার নামক স্থানে গিয়ে সৈন্যদের দজলা পার করায় এবং দক্ষিণে মা'কাল দরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দরিয়া মা'কাল পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছলে হুরমুজের পরাজিত বাহিনীকে দলে দলে ফিরে আসতে দেখতে পায়। সৈন্যদের অবস্থা ছিল বড় করুণ।

"যরথুস্ত্রের গজব পড়ুক তোমাদের উপর।" কারেন প্রথম ফিরতি দলটি থামিয়ে এবং তাদের দুর্দশা দেখে বলে– "মুসলমানদের ভয়ে তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ ?"

"সেনাপতি হুরমুজ নিহত" ফিরতিদের মধ্য হতে এক সৈন্য বলে–"দু'পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডার কুববায এবং আনশযানও রণাঙ্গন ছেড়ে এসেছে । তারা হয়তবা পিছনেই আসছে।"

কারেন হুরমুজের মৃত্যুর সংবাদ শুনে থ মেরে যায়। এটুকু জিজ্ঞাসা করার হিম্মতও তার হয় না যে, সে কিভাবে মারা গেল? কারেনের মাথা হেট হয়ে

গিয়েছিল। একটু পর যখন সে মাথা উঠায় তখন জনস্রোতের মত ইরানীদের ফিরে আসতে দেখে। নতুন বাহিনী দেখে পলায়নপর সৈন্যরা সেখানে জমা হতে থাকে। এ সময়ে হুরমুজের দু' কমান্ডার কুববায এবং আনুশযানও এসে পৌঁছে। তাদেরকে দূর হতে আসতে দেখেই কারেন অশ্বের বাগে ঝাঁকি দেয়। ঘোড়া চলতে শুরু করে। পরাজিত দু' কমান্ডারের কাছে গিয়ে সে ঘোড়া থামায়।

"হুরমুজের নিহত হওয়ার সংবাদ আমি ইতোমধ্যেই পেয়েছি"– কারেন বলে–

"কিন্তু তাই বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, তোমরা দু'জন রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। বর্বর এবং বদ্দু ঐ আরবদের কাছে তোমরা পরাজিত হয়েছ? আমি এর বেশি বলতে চাইনে যে, তোমরা কাপুরুষ এবং ফৌজে যে পদে তোমরা আছ সে পদের যোগ্য তোমরা নও ।... তোমরা মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে চাও না?"

"কেন চাইব না?" কুববায বলে– "কৌশল হিসেবে আমরা পিছু হটে আসিনি, হুরমুজের আস্ফালনই আমাদের এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। আমরা স্বীকার করি যে, ইসলামী সৈন্যদের মাঝে বহুত নামী দামী ও বীর বাহাদুর সেনাপতি আছে। কিন্তু তাই বলে তারা আমাদের এভাবে পশ্চাদপসারণের যোগ্য ছিল না।"

"কারেন!" আনুশযান বলে–"আমাদের ফৌজি নেতৃত্বে এটাই বড় দুর্বলতা, যা আপনার থেকেও প্রকাশ পেয়েছে। আপনি আরবের মুসলমানদেরকে গোয়ার এবং মূর্খ বলেছেন। হুরমুজও এমন বলত। কিন্তু আমরা রণাঙ্গনে তাদেরকে এর বিপরীত পেয়েছি।"

"তোমরা তাদের মাঝে এমন কোন গুণ দেখেছ, যা আমাদের মাঝে নেই"– কারেন জিজ্ঞাসা করে।

"তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের মাঝে কোন্ ত্রুটি রয়েছে, যা তাদের মধ্যে নেই"–আনুশযান বলে–"আমরা দশজন, বারজন সৈন্যকে এক শিকলে বাঁধি যেন তারা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে। ভাগতে না পারে ! এভাবে শিকলবদ্ধ হওয়ায় সামনাসামনি যুদ্ধ করতে হয়। মুসলমানরা আমাদেরকে শিকল বদ্ধ হতে দেখে ডানে-বামে আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে। আমাদের সৈন্যরা এদিক ওদিক ঘুরে লড়াই করতে অপারগ ছিল। বস্তুত, এ কারণেই সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যরা পরাজয় বরণ করে।"

"আমাদের কথা বলার সময় নেই"–কুববায বলে–"মুসলমানরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে আসছে।"

সত্যই তাদের পশ্চাদ্ধাবনে হযরত মুসান্না (রা.) দুই হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছিলেন। হযরত মুসান্না বিন হারেছা ইসলামের ঐ প্রেমিকের নাম, যিনি ইরানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা হামলা চালিয়ে ইরানীদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন

এবং পরবর্তীতে তাঁরই অনুরোধক্রমে আমীরুল মু'মিনীর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে ডেকে ইরানীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে প্রেরণা দিয়েছিলেন। ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে যাওয়া অসাধারণ বীরত্বমূলক পদক্ষেপ ছিল। কারণ এখানে পশ্চাদ্ধাবনের অর্থ ছিল, নিজেদের স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে শত্রুর পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। কেননা মুসলমানরা যতই এগিয়ে যাবে চতুর্দিক হতে ঘেরার মধ্যে পড়ার ততই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এটা ছিল সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.)- এর নির্দেশ এবং ইরানীদের বিরুদ্ধে হযরত মুসান্না (রা.)- এর একরাশ ঘৃণার ফসল, যা ইরানীদের প্রতি তাঁর অন্তরে ভরপুর ছিল।

জঙ্গে সালাসিল সমাপ্ত হলে এবং ইরানীরা পিছু হটে গেলে হযরত খালিদ (রাঃ) দেখেন যে, তার সাথে আগত সৈন্যরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি হযরত মুসান্না (রা)-কে ডেকে পাঠান।

"ইবনে হারেছা।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন–"এভাবে পালিয়ে ইরানীরা যদি জীবিত ফিরে যায় তবে কি তুমি এটাকে পূর্ণ বিজয় জ্ঞান করবে?"

"খোদার কসম, জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না (রাঃ) আবেগভরা কণ্ঠে বলেন– " আমার শুধু নির্দেশের প্রয়োজন। এরা আমার শিকার।"

"বেরিয়ে পড়"–হযরত খালিদ (রা.) বলেন"–"দুই হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে যাও। অধিকহারে ইরানীদের বন্দী করতে চেষ্টা করবে। যারা মোকাবিলায় অস্ত্র ধরবে তাদের হত্যা করে ফেলবে।... আমি জানি, আমার জানবায সাথীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু ইরান সম্রাটকে জানিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্বাবন করব।"

হযরত মুসান্না (রা.) ২ হাজার সৈন্য নিয়ে যান এবং পলায়নপর ইরানীদের পিছু নেন। ইরানীরা যখন দূর থেকে লক্ষ্য করে যে, তাদের পিছু নেয়া হচ্ছে তখন তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা বোঝা হাল্কা করতে লৌহগদা এবং অস্ত্র ফেলে দেয়। পশ্চাদ্ধাবন করে ইরানীদের পাকড়াও করা হযরত মুসান্না (রাঃ)-এর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ইরানীরা দলে দলে বিক্ষিপ্ত হলেও পরবর্তীতে তারা এক একজন করে ভাগতে থাকে। তাদের পশ্চাতে পশ্চাতে মুসান্নার সাথীরাও সঙ্গীহীন হয়ে যায়।

॥ আট ॥

কিছুদূর যাওয়ার পর একটি কেল্লা সামনে এসে পড়ায় হযরত মুসান্নাকে তাঁর বাহিনী একত্রিত করতে হয়। 'নারীদূর্গ' নামে কেল্লাটি প্রসিদ্ধ ছিল। কেল্লাটি জনৈক মহিলার হওয়ায় তার নাম হয়ে যায় নারীদূর্গ। ইরানীরা এই কেল্লায় আশ্রয় নিতে পারে। এই ধারণাকে সামনে রেখে হযরত মুসান্না (রা.) কেল্লাটি অবরোধ করেন। কেল্লা হতে প্রতিরোধের হাবভাব দেখা যায়। দু'দনি অবরোধের পর

হযরত মুসান্না (রা.)-এর মনে পড়ে যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন তা চাপা পড়ে গেছে। হযরত মুসান্না (রা.)এর ভাই মুআন্না তার সাথেই ছিল।

"মুআন্না!"–মুসান্না বিন হারেছা তাকে বলে " তুমি কি বিষয়টি উপলব্ধি করেছ যে, আমি ইরানীদের পশ্চাদ্ধাবনে এসেছিলাম কিন্তু এই কেল্লাটি আমার পথ আগলে ধরেছে?"

"ভাই মুসান্না !" মুআন্না বলে–"আমি সবকিছুই দেখছি। আর আমি এটাও অনুভব করছি যে, আমার উপর আপনি আস্থা রাখতে পারছেন না। যদি আস্থা রাখতেন তাহলে বলতেন, কেল্লাটি তুমি অবরোধ করে রাখ, আমি ইরানীদের পিছু ধাওয়া করছি।"

"হ্যাঁ মুআন্না!" হযরত মুসান্না বলেন–"তোমার উপর সত্যই আমার আস্থা নেই। এই কেল্লাটি এক যুবতি নারীর। আর তুমিও একজন যুবক পুরুষ। খোদার কসম ! আমি এক কেল্লা দখলদারীদেরকে এক নারীর মায়াবী দৃষ্টিতে পরাভূত হতে দেখেছি"

"প্রিয় ভাই!" মুআন্না বলে–"আমার উপর আস্থা রাখুন এবং সামনে অগ্রসর হোন। আমাকে সামান্য কিছু সৈন্য দিয়ে যান এরপর দেখবেন, কে কার কাছে পরাভূত হয়।... কেল্লা না আমি... আপনি এখানে আটকে থাকলে ইরানীরা অনেক দূর এগিয়ে যাবে।"

"আমার মাথা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার উপযোগী থাকলে আমি বলব, আমি ভিন্ন কিছু চিন্তায় এদিকে এসেছি"– মুসান্না বিন হারেছা বলে–"আমি আল্লাহর অফুরন্ত শুকরিয়া আদায় করছি; তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ বড় দয়া করে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর মত সেনাপতি আমাদের দান করেছেন। মদীনার খেলাফত হতে তাঁর প্রতি যে নির্দেশ ছিল তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি এতেই আশ্বস্ত নন, তৃপ্ত নন। তিনি পারস্য হতে সম্রাটগিরি সমূলে উৎখাত করতে চান। তিনি মাদায়েনের এক একটি ইট খুলে নিতে বদ্ধপরিকর।"

"ইচ্ছা ভিন্ন জিনিস প্রিয় ভাই!" মুআন্না বলে–"ইচ্ছা করা সহজ কিন্তু তা পূরণ করা বড়ই কঠিন। আপনি দেখেছেন নিশ্চিয় যে, হযরত খলিদ (রা.) তীরগতিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু তীর অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়। ... প্রিয় ভাই ! সামান্য বাধা ঐ তীরকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও, হযরত খালিদ (রা.)–এর জন্য ঐ স্থানেই থেকে যাওয়া উচিত যেখানে তিনি ইরানীদের পরাজিত করেছেন?" মুসান্না বলে–"খোদার কসম! তুমি একটি কথা ভুলে গেছ। আর তা হল, ইরান সম্রাটের স্বীয় রাজত্বের চিন্তা আছে। আর আমাদের আছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়। উরদূশের নিজ সিংহাসন রক্ষা করতে চায় কিন্তু আমরা দোজাহানে সর্দার হযরত

রাসূলে আকরাম (সা.)–এর মান-মর্যাদা রক্ষার খাতিরে লড়ছি... বোঝার চেষ্টা কর স্নেহের ভাই।

আমাদের লড়াই সাধারণ রাজা বাদশাহদের লড়াই নয়; এটা আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা রক্ষার লড়াই। আমাদের প্রতি আল্লাহপাকের এ নির্দেশ রয়েছে যে, যেন আমরা রাসূল (সা.)-এর আহ্বান দুনিয়ার কোণায় কোণায় পৌঁছে দিই। আমাদের শয্যা হবে এই বালু এবং বালিশ হবে পাথর। আমরা সিংহাসন চাইনা।"

"ধন্যবাদ, প্রিয় ভাই!" মুআন্না বলে–"আমি বুঝে গেছি।" 'না', মুসান্না বলেন– "তুমি পুরো ব্যাপারটা এখনো বোঝনি। তুমি ভুলে গেছ, আমাদেরকে ঐ সকল মুসলমানদের রক্তের প্রতিটি ফোটার প্রতিশোধ নিতে হবে, যারা ইরানীদের তোপের মুখে ছিল এবং ইরানীরা যাদের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) পারস্যের এই নির্মম আচরণ কখনো ক্ষমা করবেন না।... আমি তোমাকে বলছিলাম, আমি মূলত পলায়নপর ইরানীদের পিছু নিতে আসিনি। আমি ইরানীদের ঐ ফৌজের অন্বেষণে এসেছি, যারা হুরমুজ বাহিনীর পরাজিত সৈন্যদের সাহায্যার্থে এসেছে। আমি তাদেরকে পথিমধ্যেই প্রতিরোধ করব।"

"তাহলে আর কথা বাড়াবেন না"–মুআন্না বলে "আমার অধীনে কিছু সৈন্য রেখে বাকী সৈন্য নিয়ে আপনি চলে যান।... তবে মনে রাখবেন, সাহায্যকারী দল যদি সত্যই আসে, তবে তাদের সংখ্যা ও শক্তি পূর্বের তুলনায় অধিক হবে। সামনা-সামনি সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন না। প্রাণ প্রিয় ভাই! আল্লাহ আপনার সহায় হোন!" কোন ঐতিহাসিকের কলম ঐ সঠিক সংখ্যা লেখে নাই যা হযরত মুসান্না তাঁর ভাই মুআন্নাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তবে তাদের বক্তব্য হতে এতটুকু অনুমান করা যায়, ঐ সৈন্যসংখ্যা ৩০০-এর কম এবং ৪০০-এর বেশী ছিল না। মুআন্না এই সৈন্য দ্বারাই কেল্লা অবরোধ করে রাখেন এবং কেল্লার ফটকের এত কাছে চলে যান, যেখান থেকে অতি সহজে তিনি তীরের শিকার হতে পারতেন। ফটকের উপরে পাহারা কক্ষ ছিল। সেখান থেকে এক অনিন্দ্য সুন্দর রমনীর অভ্যুদয় হয়।

"তোমরা কারা এবং এখানে কোন্ উদ্দেশ্যেই বা এসেছ?" যুবতী বড় জোর গলায় মুআন্নার কাছে জানতে চায়"

"আমরা মুসলমান!" মুআন্না তার চেয়ে উচ্চ আওয়াজে জবাব দেন "রণাঙ্গন থেকে পলায়নপর ইরানী সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনে আমরা এসেছি।

তুমি এ কেল্লায় তাদের আশ্রয় দিয়ে থাকলে তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। আমরা নিয়েই চলে যাব।"

"এটা আমার কেল্লা"– যুবতী বলে– "পলায়নপর সৈন্যদের আশ্রয় স্থল নয়। এখানে কোন ইরান সৈন্য নেই।"

"ভদ্র মহিলা" মুআন্না বলে–"আপনার সম্মান রক্ষা করা আমাদে কর্তব্য। আমরা মুসলমান। কোন মহিলার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা আমাদের নিকটে হারাম। চাই তিনি কেল্লার মালিকও হন না কেন। যদি আপনি ইরানের সমর শক্তির ভয়ে সৈন্যদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে ইতস্তত করেন তাহলে মনে রাখবেন, আমরা ইরান বাহিনীর শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে শোচনীয়ভাবে তাদের পরাস্ত করেছি। আপনাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে চাই না। আমরা ঐ ফৌজের অগ্রবর্তী বাহিনী, যারা পিছে আসছে।"

"আমি মুসলমানদের কি ক্ষতি করেছি?" যুবতী বলে–"আমার কেল্লা আপনাদের যাওয়ার পথে অন্তরায় হতে পারে না।।"

"আপনার কেল্লা নিরাপদ থাকবে"–মুআন্না বলে– "কিন্তু শর্ত হল, কেল্লার দ্বার খুলে দিন। আমরা ভেতরে ঢুকে তল্লাশি চালাব মাত্র। আপনাদের কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তুতে আমার সৈন্যরা হাত লাগাবে না, আমারা নিশ্চিত হয়েই চলে যাব। এই শর্ত পূরণ না করলে আপনাদের লাশ এই কেল্লার আশে পাশে পঁচে গলে পড়ে থাকবে।"

"কেল্লার দরজা খুলে দাও"– যুবতীর শাসকসুলভ নির্দেশ শোনা গেল। এই আওয়াজের সাথে সাথে কেল্লার ফটক খুলে যায়। মুআন্না তার সৈন্যদের ইশারা দিলে তিনশ থেকে চারশ সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

মুআন্না তাদেরকে শুধু এতটুকু বলে যে, কেবল তল্লাশি হবে। কোন ব্যক্তি কিংবা বস্তু স্পর্শ করা যাবে না। মুআন্নার ঘোড়া কেল্লার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। অধীনস্থ সকল অশ্বারোহীও তার পিছুপিছু আসতে থাকে। মুআন্না এক স্থানে থেমে কেল্লার চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরায়। সর্বত্র তীরন্দাজ বাহিনী পজিশন নিয়ে ছিল। নীচে কোথাও কোন সৈন্য তার চোখে পড়েনা। মুআন্নার সৈন্যরা কেল্লার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

"আপনি সত্যই বলেছিলেন"–যুবতী মুআন্নাকে বলে–"আমি ইরানীদের ভয় করি। এ কেল্লায় যে শক্তিশালী সৈন্যই আসবে আমি তাদের দয়ার ভিখারী হব।... মুসলমানদের এই প্রথমবারের মত আমি দেখছি।"

"আপনি তাদের কথা জীবনভর মনে রাখবেন"–মুআন্না বলে– "খোদার কসম! আপনি সারা জীবন তাদের অপেক্ষায় পার করবেন।... মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ আছে, নিস্প্রাণ কেল্লা নয়, কেল্লাবাসীদের অন্তর জয় কর। কিন্তু কেল্লাবাসীদের অন্তর যদি কেল্লার প্রাচীরের মত কঠিন হয় তখন আবার আমাদের প্রতি ভিন্ন আদেশ আছে। আমরা যখন এই নির্দেশ পালনে লিপ্ত হই তখন পারস্য শক্তিও আমাদের সামনে টিকতে পারে না। আপনি তাদের পালিয়ে যেতে দেখেন নি? তারা এখান দিয়ে যায় নি?"

"অবশ্যই গেছে"–কেল্লাদার যুবতী বলে–"ক্ষণিকের জন্য এখানে যাত্রাবিরতিও করেছিল। তারাই বলেছিল যে, আমরা মুসলমানদের তাড়া খেয়ে

পালিয়ে এসেছি। আমি তখন এই ভেবে অবাক হয়ে ছিলাম যে, সে আবার কোন শক্তি, যা পারস্য বাহিনীকে পর্যন্ত পর্যুদস্ত করে ছাড়ে। আপনি যখন জানালেন যে, আপনারাই তারা, যারা ইরানীদের পরাজিত করেছে। তখন আমার হিম্মত শেষ হয়ে যায়। আমি ভীত হয়ে কেল্লার দরজা খুলে দিতে বলি। আমি আপনার সৈন্যদের থেকে ভাল আচরণের প্রত্যাশা রাখতে পারছি না। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আপনারা যা যা বলছেন তা সত্য বলছেন কিনা।!"

কেল্লাদার মহিলা কথা বলতে বলতে মুআন্না কে নিজের মহলে নিয়ে যায়। সেটা ছিল রীতিমত আলীশান শিশমহল। তার ইঙ্গিতে দুই ভৃত্য শরাব এবং ভুনা গোশত মুআন্নার সামনে পরিবেশন করে । মুআন্না এই খাদ্য পানীয় ঠেলে দূরে সরিয়ে দেন।

"আমরা শরাব পান করিনা"–মুআন্না বলে–"আর এ খাদ্য আমি এজন্য খাব না যে, আপনি আমাকে এক শক্তিশালী বাহিনীর লোক মনে করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তা পেশ করছেন। ফলে এটাকেও আমি অনুচিত মনে করছি।"

"তবে কি আমাকেও হারাম মনে করছেন?" এই অনিন্দ্য সুন্দরী এবং যুবতী নারী এমন আকর্ষণীয় মুচকি হাসি দেয়, যা থেকে তাকে ব্যবহারের আহ্বান ঝরে পড়ছিল।

"হা", মুআন্না বলে–"নারীকে আমরা মদের মতই হারাম মনে করি। যতক্ষণ তারা স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে হারামই মনে করি।"

ইতোমধ্যে মুআন্নাকে জানানো হয় যে, তার সৈন্যরা পুরো কেল্লা তল্লাশি চালিয়ে ফিরে এসেছে। মুআন্না তাদের ফিরে আসার সংবাদ পেয়েই দ্রুত উঠে পড়েন এবং দ্রুতগতিতেই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান।

সৈন্যদের কমান্ডার মুআন্নাকে তল্লাশি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করান। কিভাবে তল্লাশি করে, কোথাও সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা সব তাকে জানায়। সে মুআন্নাকে জানায় যে, কোথাও কোন ইরানী সৈন্যর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কেল্লাদার নারীর গোত্র তীর বর্শায় সজ্জিত ছিল। কিন্তু মুআন্নার সৈন্যদের সাথে তাদের লড়াই করার হিম্মত ছিল না। কেল্লার মালিক তাদের যুদ্ধ করার অনুমতিও দিয়েছিল না। এ কেল্লাটি কব্জা করা কিংবা নিজেদের আনুগত্যে নিয়ে নেয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কেননা, ইরানীদের যে কোন সময় এই কেল্লাটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সম্ভাবনা ছিল। মুআন্না এদিক ওদিক-তাকায়। কেল্লাদার নারী তার নজরে পড়ে না। মুআন্না অন্দরে প্রবেশ করে।

"আমার কেল্লা থেকে কিছু পেলেন কি?" যুবতী জিজ্ঞাসা করে। "না", মুআন্না জবাবে বলে–"সন্দেহ নিরসন করা আমার জন্য জরুরী ছিল। আর এখন একথা জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করছি যে, আমার কোন সৈন্য এখানকার কোন পুরুষ কিংবা নারী অথবা আমি আপনার কোন কষ্ট দেইনি তো ?"

"না", যুবতী নেতিবাচক জবাব দেয়। অতঃপর একটু চিন্তা করে বলে "কিন্তু আপনি চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে।"

"আপনি ইরানীদের পক্ষ হতে ভয়ের আশংকা করছেন?" মুআন্না জানতে চায় "নাকি আপনার অন্তর মুসলমানদের ভয়ে ভীত?"

"এ দুটোর কোনটিই নয়" যুবতী জবাবে বলে "একাকীত্বের ভয় আমার! আপনি চলে গেলে আমি বড় একা হয়ে যাব। অথচ এ ব্যাধিটা আপনার আসার পূর্বে ছিল না।"

মুআন্না যুবতীর প্রতি প্রশ্নঝরা দৃষ্টিতে তাকায়। তার চোখ তাকে অনেক কিছু বলে দেয়। তিনি চোখ ফিরিয়ে নেন।

"আপনি দায়িত্ব পালনে এতই বিভোর যে, আপনার এ খেয়াল পর্যন্ত নেই যে, আপনি একজন যুবকও বটে"-যুবতী বলে-"বিজয়ী সর্বপ্রথম আমার মত নারীকে খেলনা বানায়। আমি আপনার মত পুরুষ জীবনে দেখিনি। এখন দেখে মন চাচ্ছে যে, সারা জীবন ধরে শুধু দেখতেই থাকি... আমাকে আপনার পছন্দ হয় না?"

মুআন্না গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার, পুনরায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত। এ সময় তার ভেতর থেকে একটি আওয়াজ আসে খোদার কসম! আমি কেল্লা বিজয়ীদেরকে এক নারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং চাহনীতে পরাভূত হতে দেখেছি!"

"আপনি হুশে আছেন তো?"-যুবতী বলে-"নাকি বেহুশ হয়ে গেলেন। কোন কথা বলছেন না।"

"সম্ভবত প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হুশে আছি' মুআন্না বলেন "তোমাকে আমার ভাল লাগে কি লাগে না সেটা পরের কথা। এখন তোমার কেল্লা আমার খুব প্রিয়।"

"আমার এই উপহার কবুল করবেন না?" যুবতী জিজ্ঞাসা করে- "শক্তি খরচ করে কেল্লা দখল করে নেয়ার চেয়ে ভালবাসার বিনিময়ে এই কেল্লা আমার থেকে নিলে ভাল হয় না?" "ভালবাসা!" মুআন্না অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, মুহূর্তে গা ঝাড়া দেয়ার মত মাথা উচু করে বলেন "ভালবাসার সময় নেই। আমি তোমাকে বিবাহ করে নিতে পারি। তুমি রাজি হলে প্রথমে কেল্লার সকল বাসিন্দাসহ ইসলাম গ্রহণ কর।"

"আমি কবুল করলাম"-যুবতি বলে-"আমি সে ধর্মের জন্য জীবন দিতেও রাজি, আপনি যে ধর্মের অনুসারী।"

আল্লামা তবারী এবং ইবনে রুসতা দুই ঐতিহাসিক কিছুটা বিস্তারিতভাবে এই ভদ্র মহিলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেউ তার নাম উল্লেখ করেননি।

॥ নয় ॥

পারস্য সম্রাট উরদূশের রাগে ফেটে পড়ছিল। হুরমুজের প্রতি ছিল তার যত সব রাগ । হুরমুজ সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সাহায্য প্রেরণের পর অনেকদিন গত হলেও রণাঙ্গনের অবস্থা সম্বন্ধে তাকে কিছুই জানানো হয় না। সে দরবারে বসলে মনে হত মানুষ নয়; বরং রাগ কুণ্ড পাকিয়ে বসে আছে। মহলের কোথাও থাকলে তার অবস্থা এই দাঁড়াত যে, বসতে বসতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াত এবং দ্রুত সারা মহল পায়চারি করে ফিরত। পথে কেউ সামনে পড়লে বিনা কারণে তার উপর রাগ ঝাড়ত। একদিন সে উদাস মনে শাহী বাগিচায় পায়চারি করছিল। হঠাৎ তাকে জানানো হয় যে, কারেনের দূত এসেছে। সে দ্রুত এসেছে। সে দূতকে ডেকে পাঠাবার পরিবর্তে নিজেই এক প্রকার তার দিকে ছুটে যায়।

"কারেন ঐ মরুশিয়ালদের পিষে ফেলেছে?" উরদূশের জানতে চায়।

"মহামান্য সম্রাট!"– দূত বলে–"জীবন ভিক্ষা চাই; জনাবের এই গোলাম কোন শুভ সংবাদ বয়ে আনেনি।"

"তবে কি কারেনও সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে?" উরদূশের কণ্ঠে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

"না, মহামান্য সম্রাট" দূত বলে–"সেনাপতি হুরমুজ মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে।"

"নিহত হয়েছে?" উরদূশের রাজ্যের বিস্ময় চোখে–মুখে টেনে জিজ্ঞাসা করে "কি হুরমুজও মারা যেতে পারে?... না, না, এটা ভুল সংবাদ এটা নির্জ্জলা মিথ্যা"। এরপর সে গর্জে উঠে দূতকে জিজ্ঞাসা করে "তোমাকে এ সংবাদ কে দিয়েছে?"

"সেনাপতি কারেন" দূত বলে–"আমাদের দুই কমান্ডার কুববায এবং আনুশযান পিছপা হয়ে ফিরে আসছিল। প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরাও একজন, দুইজন করে তাদের পিছু পিছু আসছিল। মা'কাল দরিয়ার কূলে তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তারাই জানায় যে, হুরমুজ মুসলমানদেরকে মল্লযুদ্ধ লড়ার আহবান জানালে তাদের সেনাপতি খালিদ বিন ওলীদ আমাদের সেনাপতির মোকাবিলায় আসে। সেনাপতি হুরমুজ তার দেহরক্ষীদের আশে পাশেই লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাদের দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের সেনাপতিকে ঘেরাও করে হত্যা করা। তারা তাকে কৌশলে বৃত্তাকারে ঘিরেও নিয়েছিল। কিন্তু আচমকা এক অশ্বারোহীর উদয় হয়। তার একহাতে বর্শা আর অপর হাতে তরবারী ছিল। চোখের পলকে ঐ অশ্বারোহী হুরমুজের দেহরক্ষীদের ৬/৭ জনকে খতম করে দেয়। ঠিক এ সময় মুসলমানদের সেনাপতি হুরমুজকে কাবু করে জমিনে আছড়ে ফেলে এবং খঞ্জর দ্বারা তাকে হত্যা করে।"

উরদূশেরের মাথা নীচু হয়ে যায়। সে ধীর পদক্ষেপে মহল লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। সে মহলে পৌঁছে এমনভাবে দেয়াল আকড়ে ধরে, যেন কোন কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে পড়া থেকে বাঁচতে দেয়ালের আশ্রয় নিয়েছে। সে নিজ কক্ষে দেয়ালে ভর দিয়ে দিয়ে পৌঁছে একটু পর মহলে রীতিমত হুলস্থুল পড়ে যায়। শাহী ডাক্তার দৌড়ে আসে। অজ্ঞাত রোগে উরদূশের হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এটা ছিল আঘাতের ফল। পারস্য সম্রাট পরাজয়ের সাথে পরিচিত ছিল না। প্রথমবারের মত তারা মার খায় রোমকদের হাতে এবং রাজ্যের কিছু অংশ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এবার তারা মার খায় এমন লোকদের হাতে উরদূশের যাদেরকে মানুষ বলেই মনে করতনা। উরদূশের জন্য এই আঘাত সাধারণ ছিল না।

কারেন বিন করয়ানুস তখনও মা'কাল দরিয়ার কিনারে ছাউনী ফেলে ছিল। সে এতদিন পর্যন্ত এখানে এ জন্য অবস্থান করতে থাকে যে, হুরমুজের বাহিনীর পলায়নপর কমান্ডার এবং সিপাহীরা তখনও আসতেছিল। কারেন তাদেরকে নিজ বাহিনীতে শামিল করছিল। হুরমুজের দুই সেনাপতি কুববায এবং আনুশযান কারেনের সাথেই ছিল। সে পরাজয়ের কঠিন প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের মন্তব্যে কারেন সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল।

অবস্থানের দিনগুলোতে কারেনের গোয়েন্দারা তাকে মুসলমানদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রীতিমত অবগত করতে থাকে। গোয়েন্দা তথ্য মোতাবেক সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মুসলমানরা যুদ্ধজয় করেই ফিরে যাবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

হযরত খালিদ (রা.) জঙ্গে সালাসিল জয়ের পর কাজিমা, উবলা সহ ছোট ছোট এলাকাগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি নিজ হাতে নিয়ে নেন। যখন তিনি সর্বপ্রথম ঐ এলাকায় পৌঁছান তখন অত্র এলাকার মুসলমানরা আনন্দে চিৎকার করে করে "হযরত খালিদ জিন্দাবাদ... ইসলাম জিন্দাবাদ ... খেলাফত জিন্দাবাদ... এর শ্লোগান দিতে থাকে। এলাকাটি সবুজ শ্যামল এবং বড়ই আকর্ষণীয় ছিল। মহিলারা হযরত খালিদ (রাঃ) এবং তাঁর দেহরক্ষীদের পথে ফুল বিছিয়ে দিতে থাকে।

এই এলাকার মুসলমানরা এক লম্বা সময়ের পর ইরানীদের অত্যাচার এবং গোলামী থেকে মুক্তি পায়।

"জনাব খালিদ! আপনি আমাদের ইজ্জতের প্রতিশোধ নিবেন?" হযরত খালিদ (রাঃ)-এর লক্ষ্যে কয়েক নারীর কণ্ঠ ছুটে আসে।

"আমাদের যুবতী কন্যাদের রক্তের প্রতিশোধ... প্রতিশোধ ... প্রতিশোধ... চাই"–এটা এক আওয়াজ এবং আবেদন ছিল। আর হযরত খালিদ (রা.) এই আওয়াজে মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে থাকেন।

"আমরা ফিরে যেতে আসেনি"–হযরত খালিদ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন "আমরা প্রতিশোধ নিতেই এসেছি।"

মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত খালিদ (রা.)-কে আগাম সতর্ক করে দেয় যে, তিনি যেন এ এলাকার অমুসলিমদের উপর ভরসা না রাখেন।

"এরা সবাই ইরানীদের সাহায্যকারী"- প্রতিনিধি দল হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায়-"অগ্নিপূজকরা সর্বদা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করেছে। আমাদের ছেলেরা ইরানীদের কোন চৌকিতে গেরিলা হামলা চালালে অগ্নিপূজকরা গোয়েন্দাগিরি করে তাদের ধরিয়ে দিত।"

"সকল ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের গ্রেপ্তার কর"- হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন "আর মুসলমানদের মধ্য হতে যারা ইসলামী বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক তারা চলে আসতে পারে।"

"তারা ইতিপূর্বেই মুসান্না বিন হারেছার সাথে চলে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) জবাব পান।

তৎক্ষণাৎ অগ্নিপূজারীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর পাকড় শুরু হয়ে যায়। তাদের মধ্য হতে কেবল তাদেরকেই যুদ্ধবন্দী করা হয় যাদের ব্যাপারে এই সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছিল অথবা গুপ্তচরবৃত্তি করেছিল।

শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় কিছু লোক কাজিমায় রেখে হযরত খালিদ (রা.) সামনে এগিয়ে যান। এবার তার চলায় তেমন গতি ছিল না। কারণ, যে কোন স্থানে ইরানীদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অত্র এলাকার কিছু লোককে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে সম্মুখে এবং ডানে বামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত মুসান্না দূর্বার গতিতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন । তিনি মা'কাল দরিয়া পার হতে চান কিন্তু দূর হতে ইরানীদের ছাউনী তার চোখে পড়ে। ছাউনীই বলে দেয়, তারা সংখ্যায় অনেক ছিল। হযরত মুসান্নার কাছে দেড় হাজার থেকে কিছু বেশী সৈন্য ছিল। মুষ্টিমেয় এ সৈন্য নিয়ে এক বিশাল বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

"আমাদের এখান থেকেই পিছু হটা উচিত"-মুসান্নার এক সাথী বলে "ইরানী এ বাহিনী আমাদেরকে সহজেই তাদের ঘেরাওয়ে নিয়ে হত্যা করতে পারে।"

"একটু বুঝার চেষ্টা কর"- হযরত মুসান্না বলেন-"আমরা পিছু হটে গেলে ইরানীদের সাহস বেড়ে যাবে। আমাদের সেনাধ্যক্ষ বলেছিলেন, ইরানীদের

অন্তর থেকে আমাদের ভীতি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা তাদের উপর আক্রমণ করে যাব। যে ভীতি তাদের মাঝে ছড়িয়ে গেছে তা বিদ্যমান রাখতে হবে আমাদের। আমরা অগ্নিপূজক ফৌজকে এটা বুঝাতে চেষ্টা করব যে, এটা আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনী মাত্র। অবশ্য আমরা লড়ার জন্য প্রস্তুত থাকব। যদি

তাদের সাথে যুদ্ধ বেঁধেই যায় তবে ঐ প্রক্রিয়ায় লড়ব, যা এক যুগ ধরে লড়ে আসছিলাম। আর তা হলো, সামনাসামনি আক্রমন না করে হঠাৎ আক্রমন করে আবার উধাও হয়ে যাওয়া ... তোমরা এভাবে লড়াই করতে পারবেতো?" এর পর মুসান্না এক অশ্বারোহীকে ডাক দেন এবং বলেন " ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। সেনাপতি হযরত খালিদ (রাঃ) কাজিমা বা উবলার কোন একস্থানে আছেন। তাঁকে বলবে, মা'কালের কূলে এক ইরানী বাহিনী ছাউনী ফেলে আছে। তাকে জানাবে যে, আমি ঐ বাহিনীকে আগে যেতে দিব না। সেখানে আপনার পৌছানো একান্ত জরুরী।"

হযরত খালিদ (রা.) ইতোমধ্যেই কাজিমা ছেড়ে গিয়েছিলেন। ঘোড়া, উট এবং সৈন্যদের আহারাদির কোন কমতি ছিল না। অত্র এলাকার মুসলমানরা সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর পথ কিছুটা ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল। তিনি উবলার কিছুদূরে এক ভগ্নপ্রাসাদের পার্শ্ব অতিক্রম করছিলেন। সামনের দিক হতে এক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ছুটে আসছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর দুদেহরক্ষীকে বলেন, সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখ, এ অশ্বারোহী কে?

দেহরক্ষী ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং আগত অশ্বারোহীকে পথেই পেয়ে যায়। আগন্তুক ঘোড়া থামায় না। দেহরক্ষীদ্বয় নিজ নিজ ঘোড়া তার ঘোড়ার দু' পাশে আনে এবং তার সাথে চলতে থাকে।

"মুসান্না বিন হারেছার পয়গাম নিয়ে এসেছে"–দূর থেকে এক মুহাফিজ বলে।

"পারস্যের এক তেজোদ্যম বাহিনী মা'কালের কিনারে ছাউনী ফেলে আছে মুসান্নার দূত হযরত খালিদ (রা.)-এর নিকটে এসে থামতে থামতে বলে–

সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। তবে আপনার এবং মুসান্নার সম্মিলিত বাহিনীর থেকে ৭/৮ গুণ বেশী হবে। ইরানীদের পলায়ন পর সৈন্যরাও তাদের সাথে আছে।

"মুসান্না এখন কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"ইরানীদের সামনে"–দূত বলে–"মুসান্না নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোন সৈন্য পিছু না হটে এবং আমরা ইরানীদের এটা বুঝাতে চেষ্টা করব যে, আমরা সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল মাত্র।...মুসান্না আপনাকে জলদি পৌছতে অনুরোধ করেছেন।"

হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের চলার গতি দ্রুততর করেন এবং ঐ দিকে চলতে থাকেন যে দিকে মুসান্না বিন হারেছা অবস্থান করছেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যরা মুসান্নার সৈন্যদের সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত খালিদ (রা.) সর্বাগ্রে শত্রুর গতিবিধি ও তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। তিনি মুসান্নার সাথে এক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শত্রুদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সমাপ্তি পর্যায়ে ছিল।

"ইরানীরা আমাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াতে চায়"–হযরত খালিদ (রা.) মুসান্নাকে বলেনঃ "দেখছ ইবনে হারেছা?...তারা দরিয়া নিজেদের পশ্চাতে রেখেছে।"

"ইরানীরা কেবল সম্মুখ যুদ্ধই করতে পারে"–মুসান্না বলেন–"আমরা তাদের এক বন্দী থেকে জানতে পেরেছি যে, তাদের দুই সেনাপতি, যাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি জীবিত পিছু হটে আসে। একজনের নাম কুববায আর অপরজনের নাম আনুশাযান। তারা এ নয়া সালারকে বলে দেবে নিশ্চয় যে, আমাদের যুদ্ধের কৌশল ও ভেঙ্গ কেমন। এ জন্য তারা পশ্চাৎভাগকে আমাদের থেকে হেফাজত করতে পিছনে দরিয়া রেখেছে।... বেশী চিন্তা করবেননা জনাব খালিদ। আমি তাদের বিরুদ্ধে জমিন ফুঁড়েও লড়েছি।"

"আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুক ইবনে হারেছা।" হযরত খালিদ (রাঃ) বলেন–"আল্লাহ নিশ্চয় তোমার সাথে আছেন।... আমি এটাও ভেবে দেখলাম যে, দরিয়া পাড়ি দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"আল্লাহকে স্মরণ করুন জনাব খালিদ !" মুসান্না বলেন " আমি আশাবাদী যে, আমরা তাদের সৈন্য সারি এভাবে বিধ্বস্ত করে দিতে সক্ষম হব যে, তাদের পাশ কেটে সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং পশ্চাৎ হতে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ার সুযোগ আমাদের ঘটবে। আমার সৈন্যরা ঠাঁই দাঁড়িয়ে লড়ে না; ঘুরে ফিরে লড়াই করে। তাদেরকে আগে ঠেলে পাঠানোর প্রয়োজন হবে না। তাদেরকে পিছে ফিরিয়ে আনাই মূল সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। কারণ, তারা ইরানীদের দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। ইরানীদের হাতে তারা অনেক জর্জরিত হয়েছে। আপনি জানেন না, তারা কেমন দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল। ইরানীরা তাদেরকে মানুষ হিসেবে ন্যূনতম অধিকারটুকুও প্রদান করত না। মানবাধিকার থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত।"

"যরথুস্ত্র যে আগুনের পূজা করে আমরা সে আগুন নিভিয়ে দিব ইবনে হারেছা?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন–"একসময় তারা নিজেরাই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ্‌পাক। ... এস। আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে চাই না। তারা যেভাবে চুপচাপ আছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা যথেষ্ট সতর্ক এবং তাদের উপর আমাদের গভীর প্রভাব পড়েছে।... তুমি নিজ সৈন্যদের সাথে মধ্যম বাহিনীতে থাকবে।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন যে, হযরত খালিদ (রাঃ) সম্ভাব্য কৌশল সম্পর্কে অনেক ভাবেন। কিন্তু ইরানীদের বর্তমান সেনাপতি কারেন বড়ই সেয়ান ছিল। সে হযরত খালিদ (রাঃ) এর লড়াইয়ের কৌশল সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। কারেন পরাজিত দু' সালার কুববায এবং আনুশাযানকে দুই পার্শ্ব বাহিনীর দায়িত্বে রেখে নিজের বাহিনীকে সামনে নিয়ে যায়। তার বাহিনীর ভাবই ছিল আলাদা। দেখলেই বুঝা যেত শাহী ফৌজ। তাদের পায়ের নীচের মাটি প্রকম্পিত হত।

এদিকে ইয়াসরিবের সাদা-মাটা বাহিনী ছিল। বাহ্যিকভাবে তাদের মাঝে কোন ভাব ছিলনা। ইরানীদের বিপরীতে মুসলমানদের হাতিয়ারও কম ছিল। পোশাকও সাদামাটা। ইরানীদের মোকাবিলায় তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। হযরত খালিদ (রাঃ) স্বীয় বাহিনীকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলে হাজারো পায়ের উত্থান পতন এবং ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে কালেমায়ে তৈয়্যেবার গুরুগম্ভীর আওয়াজ এক ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করছিল। মুসলমানরা ক্লান্ত অবসন্ন, পক্ষান্তরে ইরানীরা ছিল সম্পূর্ণ তেজোদ্যম।

উভয় বাহিনীর মাঝে সামান্য দূরত্ব থাকতে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে থামতে বলেন। মুসান্না বিন হারেছা তাঁর বাহিনীসহ হযরত খালিদ (রা.) এর পিছনে ছিলেন। ডান এবং বাম বাহিনীতে হযরত খালিদ (রা.)-এর নিয়োগ করা দুই সালার হযরত আছেম ইবনে আমর এবং হযরত আদী ইবনে হাতেম ছিলেন। তৎকালীন সময়ের যুদ্ধরীতি অনুযায়ী ইরান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কারেন সামনে এগিয়ে আসে এবং মল্লযুদ্ধ লড়তে মুসলমানদের আহ্বান করে।

"মদীনার কোন উষ্ট্রারোহী আমার মোকাবিলা করার হিম্মত রাখে?" সে উভয় বাহিনীর মধ্যখানে এসে হুঙ্কার ছেড়ে বলে–"আমার সামনে আসার আগে একটু চিন্তা করে নিও যে, আমি ইরান সম্রাটের সেনাপতি ।"

"তোর মোকাবিলায় আমি আসছি"–হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া সামনে এনে হুঙ্কার দিয়ে বলেন–"কারেন... আয় এবং তোদের সেনাপতি হুরমুজের কতলের প্রতিশোধ নে। আমিই তার হত্যাকারী।"

হযরত খালিদ (রা.) তখনও কারেন থেকে কিছুটা দূরে ছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত খালিদ (রা.)-এর পশ্চাৎ হতে একটি ঘোড়া তীব্র গতিতে বেরিয়ে আসে এবং তার পাশ দিয়ে চলে যায়।

"পিছনে থাকুন জনাব খালিদ!" বাতাসে ভেসে আসে অশ্বারোহীর আওয়াজ "অগ্নিপূজক এই সালার আমার শিকার।"

হযরত খালিদ (রা.) উড়ন্ত ঘোড়ার দিকে চেয়ে থাকেন। অশ্বারোহী ছিল মা'কাল বিন আয়শা নামক এক মুসলমান। বীরত্বে এবং তরবারি চালনায় তার বড়ই দক্ষতা এবং নাম-ডাক ছিল। এটা নিয়ম বহির্ভূত ছিল যে, কোন সিপাহী বা অশ্বারোহী নিজের সেনাপতির উপর মর্যাদা লাভ করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু এ সময়টা এমনই নাজুক ছিল যে, ভৃত্য-মনিব এবং ধনী-গরীব সবাই এক হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি সিপাহী এবং অশ্বারোহী জিহাদের লক্ষ্য বুঝত। যে প্রেরণা সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে ছিল তা একজন সালারের মাঝেও ছিল। মা'কাল ইবনে আয়শা এটা সহ্য করতে পারেনা যে, তার সালার এক অগ্নিপূজকের হাতে আহত কিংবা নিহত হবেন।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর প্রতিটি সৈন্যের জযবা অনুধাবন করতেন। তিনি থেমে যান। তিনি ঐ সৈন্যের জযবা আহত করতে চাননা।

মা'কালের ঘোড়ায় বিদ্যুৎগতি ছিল । ঘোড়া ইরান দলপতি কারেনকে ছেড়ে যায়। মা'কাল আগে গিয়ে ঘোড়া পিছন দিকে ফিরান এবং কারেনকে আহ্বান জানান। কারেন প্রথম থেকেই হাতে তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত ছিল। তার মাথায় জিঞ্জির বিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ এবং শরীরের উপরাংশ বর্মাচ্ছাদিত ছিল । তার পায়ে মোটা চামড়ার আবরণ জড়ানো ছিল। তার চেহারায় প্রতিশোধের নিদর্শনের পরিবর্তে অহংকার ঠিকরে পড়ছিল। যেন তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, শরীরস্থ লোহা এবং চামড়ার এই পোশাক তাকে মুসলমানদের তলোয়ার থেকে অবশ্যই রক্ষা করবে।

কারেন ঘোড়ার বাগে হাল্কা ঝাকি দেয়। উভয়ের ঘোড়া পরস্পরকে ঘিরে এক দু' বার চক্কর দিয়ে মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়।

"আয় আগুন পূজারী!" মা'কাল অতি উচ্চ আওয়াজে বলে "আমি এক সাধারণ সিপাহী মাত্র, সালার নই।"

কারেনের চেহারায় অহমিকার চিহ্ন আরো গভীরভাবে ফুটে ওঠে। এক ঘোড়া আরেক ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যায়। দু'জনেরই তলোয়ার উঁচু হয়। প্রথম আঘাত উভয়েরই তলোয়ারে তলোয়ারে হয় এবং দু'জনই পিছনে সরে যায়। দ্বিতীয়বারের মত তারা আবার মুখোমুখী হয়। বাতাসে তলোয়ারের আরেকবার সংঘর্ষ হয়। এরপরে ঘোড়া থেকে থেকে পিছনে এবং ঘুরে ঘুরে একে অপরের দিকে আসে। উভয় উভয়ের প্রতি আক্রমণ করতে থাকে। শেষবার কারেন তলোয়ার উচুঁ করলে মা'কাল তার আক্রমণ ঠেকানোর পরিবর্তে তার বগল বর্ম থেকে খালি দেখে তলোয়ার বর্শার মত করে তার বগলে এত জোরে মারে যে, তলোয়ার কারেনের শরীরের অনেক ভেতরে চলে যায়। কারেনের এই হাতেই তলোয়ার থাকায় তলোয়ার তার হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। কারেন ঘোড়ার এক দিকে কাত হয়ে যায়। ঝুঁকে যাওয়ার দরুণ কারেনের গর্দান মা'কাল দেখে ফেলে। শিরস্ত্রাণের ঝুলন্ত জিঞ্জির তখন গলা থেকে সরে গিয়েছিল। মা'কাল মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করে না। দেহের সমস্ত শক্তি হাতে জমা করে তার গর্দান লক্ষ্যে এমন ভীম আঘাত করে যে, গর্ব আর অহমিকাপূর্ণ গর্দান কেটে আলাদা হয়ে যায়। মুসলিম শিবির থেকে ধন্যবাদ, প্রশংসা এবং আল্লাহু আকবার নারার গগন বিদারী বজ্রধ্বনি উঠতে থাকে।

কারেনের ধড়শূন্য কর্তিত মস্তক জমিনে পড়ে ছিল। তার জিঞ্জিরবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণের নীচে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাসূচক এক লক্ষ্য দেরহাম মূল্যের টুপি ছিল। এমন দামী টুপি হুরমুজের মাথায়ও ছিল। কারেনের মুণ্ডুশূন্য দেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে হেলে পড়ে। কিন্তু তার এক পা ঘোড়ার পাদানিতে আটকে যায়। মাকাল কারেনের ঘোড়ায় মৃদু আঘাত করে। ঘোড়া আঘাত খেয়ে দৌড়াতে শুরু করে এবং কারেনের লাশ জমিনে টেনে হিঁচড়ে ফিরতে থাকে। ঘোড়া ছিল

নিয়ন্ত্রণহীন। ইরান সিপাহসালারের এমন নির্মম মৃত্যু ও পরিণতি দেখে ইরান শিবিরে মৃত্যুর নীরবতা ছেয়ে যায়।

অগ্নিপুজারীদের কাতার ডিঙ্গিয়ে দু'টি ঘোড়া সামনে আসে। একটিতে চেপে ছিল ইরান সালার কুববায আর অপর ঘোড়ায় বসা ছিল সেনাপতি আনুশযান।

'কার বুকের পাটা আছে আমাদের মোকাবিলা করার!" দু অশ্বারোহীর একজনের হুঙ্কার ভেসে আসে–"আমরা সেনাপতি হত্যার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

"আমি একাই তোদের দু'জনার জন্য যথেষ্ট"– হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দেন।

আচমকা হযরত খালিদ (রা.)–এর পশ্চাৎ হতে দুটি ঘোড়া এসে তাঁর ডান-বাম দিক দিয়ে দ্রুত সামনে বেরিয়ে যায়। এক অশ্বারোহীর এই আহ্বান হযরত খালিদ (রা.)–এর কানে এসে পৌঁছে "পিছে থাকুন জনাব খালিদ! এ দু' সালার আমাদের বাহু বল একবার প্রদর্শন করেছে।"

"এবার আমরা তাদের পালাবার সুযোগ দিব না" অপর অশ্বারোহীর উক্তি বাতাস বয়ে এনে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর কানে পৌঁছে দেয়।

হযরত খালিদ (রা.) ছুটন্ত দু' অশ্বারোহীকে চিনতে চেষ্টা করেন। তারা ছিল তাঁরই ডান এবং বাম বাহিনীর কমান্ডার হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) তাদের পরনে সাধারণ পোশাক ছিল কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষের সারা দেহ লৌহাবরণে আচ্ছাদিত ছিল। মুসলমানদের ভরসা ছিল আল্লাহর উপর। আর ইরানীদের আস্থা ছিল লৌহাবরণের উপর। তাদের জানা ছিল না যে, তরবারির আঘাত লৌহ ইস্পাাত নয়; একমাত্র আকীদা বিশ্বাস এবং চেতনা প্রতিহত করতে পারে।

উভয় পক্ষের অভিজ্ঞ সেনাপতিরা এখন মল্লযুদ্ধের ময়দানে। সবাই তরবারি চালনায় সমান দক্ষ এবং প্রসিদ্ধ। তলোয়ারে তলোয়ারে তীব্র সংঘর্ষ চলে। প্রতিটি সংঘর্ষের পরেই তীব্র আলোর ঝলকানি ও স্ফূলিঙ্গ ওঠে । মুসলমানদের তলোয়ার ইরানীদের লোহার প্রাচীর ভেদ করতে অপারগ ছিল। ফলে তারা সতর্ক হয়ে আক্রমণ করত যেন তরবারি তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে। হযরত আছেম এবং হযরত আদী (রা.) এই আশায় থাকেন যে, শত্রুর কোন দুর্বল এবং অরক্ষিত স্থান প্রকাশ পেলে হযরত মাকালের মত তাঁরা সেখানে আক্রমণ করবেন। পরিশেষে তারা পালাক্রমে শত্রুর নিকটে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে উপর দিক হতে আক্রমণের সুযোগ করে দেন। অগ্নিপূজক উভয় সালার ঐ ভুলই করে যা ইতোপূর্বে কারেন করেছিল। তারা আক্রমণ করতে তরবারি উঁচু করলে মুসলিম সালারদের তরবারি সোজা তাদের বগলে ঢুকে যায় এবং তাদের উঁচু করা তরবারি উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে। প্রতিপক্ষের উপর তা পতিত হয় না।

হযরত খালিদ (রা.) যখন দেখেন যে, ইরানীদের সর্বাধিনায়ক নিহত এবং দুই পার্শ্ব বাহিনীর ঐ সালারদ্বয়ও নিহত যাদের দায়িত্ব ছিল পুরো ফৌজকে সুশৃঙ্খলভাবে লড়ানো তখন তিনি তাঁর বাহিনীকে একযোগে ইরানীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন।

পূর্ব পরাজয়ের গভীর ক্ষত এবং তার মারাত্মক প্রভাব তখনো ইরানীদের অন্তরে গেঁথে ছিল। সেই সাথে এবার চোখের সামনে তাদের সর্বোচ্চ তিন নেতাকে এভাবে চরম ও নির্মমভাবে নিহত হতে দেখে তাদের পূর্বভীতি কয়েকগুণে বৃদ্ধি পায়। দেখতে দেখতে সমস্ত সৈন্যদের মাঝে উদ্বেগ ও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ভাঙ্গা হৃদয় হলেও মুসলমানদের এগিয়ে আসতে দেখে তারাও দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক বাড়তি শক্তি এই ছিল যে, পশ্চাতে দরিয়া থাকায় তারা পিছন দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আরেকটি লাভ এই ছিল যে, দরিয়ায় অসংখ্য নৌযান নোঙ্গর করা ছিল। এগুলো চড়েই তারা এপার এসেছিল। বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দিলে এই নৌযানে চড়ে তারা নিরাপদ এলাকায় চলে যেতে পারবে বলে ভেবে রাখে। তাদের বিন্দুমাত্র এই ধারণাও ছিল না যে, মুসলমানরা পিছন দিকে থেকেও আসতে পারে।

হযরত খালিদ (রা.)–এর আক্রমণের ভঙ্গি এক যোগে চড়াও হওয়া কিংবা এলোপাতাড়ি ঝাপিয়ে পড়া ছিল না। তিনি পুরো বাহিনীকে প্রথম চোটেই ব্যবহার করেন না। তিনি মধ্যম বাহিনীকে পালাক্রমে সামনে পাঠান এবং তাদেরকে এই কৌশল শিখিয়ে দেন যে, শত্রুদের বেশী ভেতরে যাবে না; বরং তাদেরকে টোপ দিয়ে সাথে আনার চেষ্টা করবে।

এর সাথে সাথে তিনি দু'পার্শ্ব বাহিনীকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেন যেন তারা গিয়ে শত্রুপক্ষের পার্শ্ব বাহিনীতে আঘাত হানতে পারে। আক্রমণের ভীড়ে শত্রুবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং দুই জাদরেল সালারের লাশ ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হতে থাকে । এটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের অহমিকা-গর্ব, যা মুসলমানদের ঘোড়ার পায়ের নীচে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে শত্রুদের উদ্যমে ভাটা পড়তে পারে, উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে না। মুসলমানদের নারাধ্বনি এবং হুঙ্কার তাদের রীতিমত দিশেহারা করে তুলছিল।

"যরথুস্ত্রের অনুসারীরা ! আল্লাহকে মেনে নাও।"

আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আশেকান ভক্তকুল।"

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" নারাধ্বনিতে রণাঙ্গন কাঁপছিল। মুসান্না বিন হারেছার সৈন্যদের প্রেরণা ও আবেগ ছিল আরো তুঙ্গে তাদের হুঙ্কার ছিল কিছুটা ভিন্ন কণ্ঠের।

"তোমাদের এককালের গোলামদের বাহুবল দেখ।"

"আজ কড়ায় গণ্ডায় এতদিনে ঝরানো রক্তের প্রতিশোধ নিব।"

"ডেকে আন উরদূশেরকে।"

"যরথুস্ত্রকে ডাক, কোথায় সে?"

মুসলমানদের একদিকে তীব্র আক্রমণ অপরদিকে হৃদয় কাঁপানো এমনি গর্জন তর্জনে তাদের অবশিষ্ট শক্তিও নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে। হাতিয়ারের বোঝাও তাদের ক্লান্ত করে ফেলেছিল। তারা হাড়ে-হাড়ে ক্লান্তি অনুভব করে। হযরত খালিদ (রাঃ) লড়াই করতে করতেই অনুধাবন করতে থাকেন যে, ইরানীরা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। তারা যে ধারায় আক্রমণ প্রথম থেকে প্রতিহত করছিল, এখন তাদের মাঝে সেই গতি আর নেই। হযরত খালিদ (রা.) তাদের এই দুর্বলতা লুফে নেন। দ্রুত এক দূত ডেকে পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডার হযরত আছেম ও হযরত আদী বরাবর এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে নিজ নিজ বাহিনীকে আরো বাইরে এনে তারপর একযোগে শত্রুর পার্শ্ব বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়।

এর সাথে সাথে হযরত খালিদ (রা.) মধ্যম বাহিনীর সংরক্ষিত দলকে শত্রুর মধ্যম বাহিনীর উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। যারা ইতোপূর্বে উর্মিমালার মত ছন্দময় ভঙ্গিতে আক্রমণ করছিল। তাদেরকে পিছনে সরিয়ে আনেন। যেন তারা আবেগ উদ্বেলিত হয়ে দুর্বলতার এমন পর্যায়ে পৌছে না যায়, যা সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

ইরানীরা মুসলিম বাহিনীর নয়া তুফান সহ্য করতে পারে না। এরই মধ্যে তাদের প্রচুর প্রাণহানি হয়েছিল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে থাকে। পিছনে থাকা ইরানীদেরকে মুসলমানরা দরিয়ার দিকে দৌড়ে যেতে দেখে। তারা এর কারণ উদঘাটনে মনোযোগ দিলে দরিয়ার তীরে অসংখ্য নৌযান ভিড়ানো দেখতে পায়।

"নৌযান গুড়িয়ে দাও"–এক মুসলমানের কণ্ঠ শোনা যায়।

"শত্রুরা পালাতে নৌযান সাথে নিয়ে এসেছে"–আরেকটি কণ্ঠস্বর ওঠে। হযরত খালিদ (রা.) এই আওয়াজ শুনে ডান ও বাম দিকের বাহিনীর প্রতি এই নির্দেশ দিয়ে দূত পাঠান যে, দ্রুত তাদেরকে শত্রুর পিছনে যেতে চেষ্টা কর এবং তাদের নৌযান ভেঙ্গে দাও। সেগুলো কব্জা কর। কব্জা করতে পারলে তা মুসলিম বাহিনীর পার হওয়ার কাজে আসবে।

এই নির্দেশ সালার এবং সালারের মুখ ঘুরে সমস্ত সৈন্যের কানে গিয়ে পৌছে তখন চতুর্দিকে একই আওয়াজ উঠতে থাকে যে, "নৌকার কাছে যাও।... নৌকা অকেজো করে দাও... নৌযান কব্জা কর।"

এই চতুর্মুখী আওয়াজ ইরানীদের বাহু ভেঙ্গে দেয়। প্রাণ বাঁচানোর এই একটি পন্থাই ছিল, যা মুসলমানদের চোখে পড়ে যায়। ইরানীরা এবার যুদ্ধ বন্ধ করে নদীমুখী হয়। কে কার আগে নৌযানে উঠবে এই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। তাদের অবস্থা ভয়ার্ত ভেড়ার পালের মত ছিল, যারা ভয় পেয়ে একে অন্যের আড়ালে লুকাতে চেষ্টা করে। ইরানী সৈন্যরা নৌযানে উঠতে ঘোড়া ছেড়ে যায়। অথচ নৌযান এত বড় ছিল যে ঘোড়াসহ তারা তাতে উঠতে পারত।

এ সময় মুসলমানদের হাতে অগ্নিপূজকদের গণহত্যা হতে থাকে। তারা নৌযানে উঠতে ভীড় করায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। যারা নৌযানে উঠতে এবং নৌযান কূল থেকে দূর পানিতে নিয়ে যেতে পেরেছিল তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের তীরের শিকার হয়। তারপরেও কিছুলোক ভাগ্যক্রমে বেঁচে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত, এই যুদ্ধে ৩০ হাজার ইরানী সৈন্য মারা যায়। আহতদের সংখ্যা কেউ উল্লেখ করেন নি। তবে অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা এত পরিমাণ সেখানে আহতের সংখ্যা এর থেকে বেশী না হলেও অন্তত কম হবে না। যার অর্থ এই ছিল যে, পারস্য সম্রাট যে সমর শক্তি নিয়ে গর্ব করত তার সে গর্বের চূড়া সহসা ধ্বসে পড়েছিল। মুসলমানদের হাতে দাফন হয়ে গিয়েছিল তার দম্ভ। নিজেদেরকে অজেয় মনে করার ফানুস গিয়েছিল ফুটো হয়ে। বিশাল সৈন্য আর প্রচুর হাতিয়ার রসদ সবই মুসলমানদের জিহাদী প্রেরণার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। যে মুসলমানদের তারা বর্বর বলে উড়িয়ে দিত আজ তাদের হাতেই ইরান সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে ওঠে। মাকাল নদীর তীর বহুদূর পর্যন্ত রক্তরাঙ্গা ছিল। রণাঙ্গনের দৃশ্য ছিল বড়ই ভয়ংকর। দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর শুধু লাশ আর লাশ ছিল। ইতস্তত আহতদের ছটফটও করতে দেখা যায়। আহত ঘোড়া এদিক ওদিক ছুটতে থাকে আর আহতদের পিষে মারতে থাকে। মুজাহিদরা আহত সাথী এবং শহীদ ভাইদের লাশ উদ্ধার করছিল। রণাঙ্গন ঢাকা পড়েছিল তাজা রক্তের চাদরে।

হযরত খালিদ (রা.) পার্শ্ববর্তী একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের দৃশ্য দেখছিলেন। এক দিক হতে এক অশ্বারোহী অশ্ব ছুটিয়ে আসেন। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে এসে ঘোড়া থামান। তিনি ছিলেন মুসান্না বিন হারেছা (রা.)। ঘোড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়ার পাশে নিয়ে হযরত মুসান্না ঘোড়ার উপর থেকেই হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন।

"জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না আবেগঝরা কণ্ঠে বলেন "আজ আমি মজলুম মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছি।"

"প্রতিশোধের এখানেই শেষ নয় ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) স্বাভাবিকতার চেয়ে একটু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন "কেবল তো শুরু; আমাদের আসল বিপদ এরপরে আসবে। তুমি তাদের নৌকার সংখ্যা দেখনি ? দেখনি তাদের নৌকা কত বিরাট এবং কত মজবুত? তাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং রসদেরও কোন কমতি নেই। অথচ আমরা স্বদেশ ছেড়ে কত দূরে। এখন আমাকে তাদের থেকেই হাতিয়ার এবং রসদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের প্রয়োজন মিটাতে হবে। এটা এত সহজ কাজ নয় ইবনে হারেছা? আর আমার পক্ষে এটাও সম্ভব নয় যে, তাদের এতসব প্রাচুর্য এবং আমাদের অপ্রতুলতা দেখে ঘাবড়ে ফিরে যাব"

"আমরা কখনো ফিরে যাব না ইবনে ওলীদ!" হযরত মুসান্না অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেন–"কিসরার শিশমহলে এক একটি ইট আমরা খুলে নিব। আমরা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিব যে, তাদের মিথ্যা খোদার রাজত্ব বেশিদিন চলতে পারে না। সত্যের নির্মম কশাঘাতে মিথ্যার পতন অনিবার্য"

হযরত খালিদ (রা.) সেনাপতিদের ডেকে পাঠান। তিনি এর পূর্বে গনীমতের মাল জমা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। "আমাদের কঠিন সময় শুরু হয়েছে"– হযরত খালিদ (রা.) উপস্থিত সেনাপতিদের উদ্দেশে বলেন–"আমরা বর্তমান শত্রুর ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে। এখানকার প্রতিটি বৃক্ষ, প্রতিটি পাথর এবং মাটির প্রতিটি অংশ পর্যন্ত আমাদের শত্রু। এখানকার লোকেরা আমাদের জন্য অপরিচিত। তাদের অন্তরে পারস্য সাম্রাজ্যের নীতি প্রবল। তারা উরদূশেরকে ফেরআউন মনে করে । তাদের এ কথা বিশ্বাস করাতে বড়ই বেগ পেতে হবে যে, এমন শক্তিও আছে যা পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত ভেঙ্গে দিয়েছে।...

প্রিয় বন্ধুরা এখানকার লোকদের সাথে না নিয়ে আমরা এখানে এক কদমও সামনে বাড়তে পারি না। আমরা কারো কাছে ভিক্ষার হাত পাতব না। আমরা তাদেরকে ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিতে চেষ্টা করব। আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে এ ব্যপারে কারো উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে আমরা তাকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করব। আমরা কাউকে গোলাম বানাতে আসিনি এবং তাদেরকে অন্যের গোলামী এবং ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস হতে উদ্ধার করতে এসেছি। যে সকল এলাকা আমাদের অধিকারে এসেছে তার নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এখনই আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিজিত এলাকায় মুসলিম বসতিও আছে। নিশ্চিত তারা আমাদের সহায়তা করবে। কিন্তু বন্ধুগণ কারো উপর শুধু এ কারণে আস্থা রাখা যাবে না যে, সে মুসলমান। কারণ, গোলামী এমন খারাপ জিনিস যা মানুষের প্রবৃত্তিকেই পাল্টে দেয়। হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস করে। এখানকার লোকদের মাঝে আস্থা সৃষ্টি করে তাদের থেকে জেনে নিতে হবে যে, তাদের মধ্যে বা এই এলাকায় ইরানীদের সমর্থক কে কে আছে। তাদের যাচাই করে স্তর নির্ধারণ করতে হবে। যার উপর সামান্য সন্দেহ হবে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। যে সকল অমুসলিম আন্তরিকভাবে আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক তাদরেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।... আমি কয়েকটি শ্রেণীতে জনতাকে ভাগ করতে চাই।"

হযরত খালিদ (রা.) বিজিত এলাকার লোকদের প্রতি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, যে সকল অমুসলিম মুসলমানদের অনুগত হয়ে থাকবে তাদের থেকে ট্যাক্স উসুল করা হবে। বিনিময়ে মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তা দিবে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হবে।

এই ঘোষণার পরপরই অনেক অমুসলিম মুসলমানদের আশ্রয়ে চলে আসে হযরত খালিদ (রা.) এই এলাকা হতে কর, ট্যাক্স উঠাতে একটি দল গঠন করেন। এ দলের নেতৃত্বে থাকে সাবীদ বিন মুকরিন। আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় টিম গঠিত হয় গোয়েন্দা টিম নামে। কারণ, এখন থেকে নিয়মিত এবং প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা দলের প্রয়োজন আছে। হযরত খালিদ (রা.) গোয়েন্দা দল গঠন করেই তাদেরকে ফোরাত নদীর ওপারে পাঠিয়ে দেন। তাদের কাজ ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়।

গনীমতের যে মাল সংগ্রহ করা হয় তা জঙ্গে সালাসিলের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সম্পূর্ণ গনীমত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন আর এক ভাগ মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, এরপর থেকে হযরত খালিদ (রা.) এত চিন্তিত ও গম্ভীর হয়ে যান, যা ইতোপূর্বে তার জীবনে দেখা যায় নি।

॥ দশ ॥

৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। ১২ হিজরীর সফর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। যরথুস্ত্রের অনুসারীদের জন্য ফোরাতের সবুজ শ্যামল এলাকাটি এদিন জাহান্নামে পরিণত হয়।

সমর শক্তি, রসদ সামগ্রী উট ঘোড়া এবং হাতিয়ার নিয়ে ইরানীদের গর্বের শেষ ছিল না। তারা নিজেরদেরকে ফেরআউনের সমকক্ষ বলেও দাবী করত। আর কিসরা তো ত্রাসের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। দজলা এবং ফোরাতের মিলন মোহনায় আল্লাহর তরবারি বলে খ্যাত হযরত খালিদ (রাঃ) ইরানীদের এক শোচনীয় পরাজয়ের স্বাদ জোর করে আস্বাদন করান। হুরমুজ, কারেন, আনুশাযান এবং কুববাযের মত নামকরা সালারদের মৃত্যুর দুয়ারে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও কিসরা উরদূশের পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তার অধীনে এখনও প্রচুর সৈন্য ছিল এবং মদীনার মুজাহিদদেরকে সে এখনো বুদ্দু এবং মরুডাকাত বলে মনে করত।

পরাজয় স্বীকার না করলেও পরাজয় এবং জাদরেল সালারদের নিহত হওয়ায় সে অন্তরে যে বিরাট আঘাত পায় তা লুকাতে পারে না। হুরমুজের মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হলে সে বুকে হাত রেখে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলে নেয়ার বহু চেষ্টা সে করেছিল কিন্তু এক অজ্ঞাত রোগে সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, তাকে সিংহাসন হতে দূরশয্যায় আছড়ে ফেলে। ঐতিহাকিগণ এই রোগের কারণ পরাজয়ের আঘাত লিখেছেন।

"পরাজয় এবং পশ্চাদপসারণ ছাড়া আমার জন্য আর কোন সংবাদ নেই কি?" সে শয্যা থেকে বসে গর্জে উঠে বলে "মদীনার মুসলমানরা কি তাহলে জিন? কারো চোখে পড়ে না, ফাঁকে আক্রমণ করে চলে যায়?"

শাহী ডাক্তার, উরদূশেরের চোখের পুত্তলীসম দুই যুবতী স্ত্রী এবং এক উজীর বিস্মিত এবং নির্বাকভাবে ঐ দূতের দিকে চেয়েছিল, যে ইরানীদের আরেকটি পরাজয় এবং পিছু হটার সংবাদ নিয়ে এসেছিল। দূত আসার সংবাদ দেয়া হলে প্রথমে ডাক্তার বাইরে এসে দূতকে জিজ্ঞাসা করে যে, সে কি সংবাদ নিয়ে এসেছে। দূত সংবাদ জানালে ডাক্তার তাকে বলেছিল, সে যেন কিসরাকে এখনই এই খারাপ সংবাদ না জানায়। কারণ, সে এ মর্মান্তিক খবর সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু এই দূত কোন সাধারণ সিপাহী ছিল না যে, ডাক্তার যা বলবে, তাই শুনবে। সে ছিল সাবেক কমান্ডার। তার পদমর্যাদা সালার থেকে দুই স্তর কম ছিল। তাকে কোন সালার প্রেরণ করে নাই। আর তাকে প্রেরণের জন্য কোনই সালার জীবিতও ছিল না।

চিকিৎসকের বলায় দূত থামে না; সে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, তার কাছে কিসরার সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ নয়; পারস্য সাম্রাজ্য এবং যরথুস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করাই বড় কথা। সম্রাট উরদূশেরকে দজলা এবং ফোরাতের যুদ্ধের বর্ণনা পূর্ণরূপে অবগত না করালে ক'দিন বাদেই মুসলমানরা মাদায়েনের ফটকে এসে নক করবে। দূত চিকিৎসকের আর কোন কথা শোনে না। সোজা ভেতরে চলে যায় এবং উরদূশেরকে জানায় যে, মুসলমানরা ইরানীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। উরদূশের শায়িত ছিল; সংবাদ শুনে উঠে বসে। রাগে তার ঠোঁট এবং হাত কাঁপছিল।

"মহামান্য সম্রাট!" কমান্ডার বলে–"মদীনাবাসী জিন নয়; সকলে তাদের দেখতে পায়। কিন্তু...!"

"তা কারেন কি মরে গিয়েছিল?" উরদূশের তার কথা শেষ করতে না দিয়েই ক্রোধে ফেটে পড়ে জিজ্ঞাসা করে।

"জ্বি হা!" কমান্ডার জবাব দেয়–"তিনি মল্লযুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন তার পক্ষে উভয় বাহিনীর সংঘর্ষ দেখা সম্ভব হয় নি।"

"আমাকে জানানো হয়েছিল যে, কুববায এবং আনুশযানও তাদের সাথে ছিল" উরদূশের এ কথা বলে তাদের সম্পর্কে জানতে চায়।

"তারাও কারেনের ভাগ্য বরণ করে"– কমান্ডার বলে–"তারা কারেন হত্যার প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। উভয়ই একসাথে গিয়ে মদীনার সালারদেরকে আহ্বান করে এবং তুমুল সংঘর্ষে উভয় মারা যায়।... মহামান্য সম্রাট। মহান পারস্য সাম্রাজ্যের এই অবস্থা কি চলতে পারে? না... না...যদি মহামান্য সম্রাট বেদনায় এভাবে নিজেকে রোগাক্রান্ত করে ফেলে তবে কি আমরা যরথুস্ত্রের মান-মর্যাদা মদীনার বুদ্দুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব?"

"তোমার পরিচয় কি?" উরদূশের জানতে চায়।

"আমি কমান্ডার মাত্র"–কমান্ডার জবাব দেয়–"আমি কারো প্রেরিত দূত নই। আমি যরথুস্ত্রের আত্ম নিবেদিত গোলাম।"

"প্রহরীকে ডাক"–উরদূশের নির্দেশ দেয়–"তুমি আমাকে নয়া প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছ।... আমাকে বল, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কোথায় বেশী? তাদের কাছে ঘোড়া বেশী? আর কি কি আছে তাদের কাছে?

প্রহরী ভেতরে আসে এবং নির্দেশের অপেক্ষায় নতশিরে ঝুঁকে থাকে। "সেনাপতি আন্দারযগারকে ডাক" উরদূশের প্রহরীকে বলে এবং কমান্ডারের কাছে জানতে চায় "তাদের কাছে কি কি আছে?...ড়াস এবং সব খুলে আমাকে বল।"

"আমাদের অনুপাতে তাদের কাছে কিছুই নেই" কমান্ডার জবাবে বলে, "তাদের মাঝে লড়ার প্রেরণা আছে। আমি তাদের নারা ধ্বনি শুনেছি। তারা নারার মাঝে নিজেদের প্রভু এবং রাসূলকে স্মরণ করে। আমি তাদের মাঝে অবর্ণনীয় ধর্মীয় টান দেখেছি। তারা নিজ বিশ্বাস ও চেতনায় অত্যন্ত পক্ক। আর এটাই তাদের মূলশক্তি। প্রতিটি রণাঙ্গনে তাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই কম থাকে।"

"থাম!" উরদূশের বলে, "আন্দারযগার আসছে। এ সেনাপতির উপর আমার আস্থা আছে। তাকে জানাবে, আমাদের বাহিনীতে কোন্ কোন্ দুর্বলতা আছে যার কাছে সংখ্যায় বেশী হয়েও তাদের পালাতে হচ্ছে?"

* * *

"আন্দারযগার!" উরদূশের শয্যায় অর্ধমৃত অবস্থায় পড়েছিল। সে শুয়ে থেকেই তার এক নামকরা সালারকে বলছিল "তুমি এ সংবাদ শুনেছ যে, কারেনও মারা গেছে? অপর দুই সালার কুববায এবং আনুশাযনও নিহত?"

আন্দারযগারের চোখ স্থির হয়ে যায়। রাজ্যের বিস্ময় তাকে ক্ষণিকের জন্য নির্বাক করে দেয়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু।

"তাকে সব খুলে বল কমান্ডার!" উরদূশের কমান্ডার বলে "এভাবে একের পর এক পরাজয়ের সংবাদ আসতে থাকলে কতক্ষণ আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে?"

মুসলমানরা মা'কাল দরিয়ার কূলে তাদেরকে কিভাবে পরাজিত করে তা

বিস্তারিতভাবে কমান্ডার সালার আন্দাযরগারকে জানায়। সে তাকে ইরানীদের পশ্চাদাপসারণের দৃশ্যও খুলে খুলে বলে।

"আন্দারযগার!" উরদূশের বলে "আমি আর কোন পরাজয়ের ঝুঁকি নিতে চাই না। মুসলমানদের থেকে পরাজয়ের শুধু প্রতিশোধই নিবে না; তাদের হত্যা করে করে ফোরাতের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যদি তুমি বেশীর থেকে বেশী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে পার। অত্র এলাকা তোমার চেনা আছে। তুমিই ভাল বুঝবে, মুসলমানদের ফাঁদে ফেলে কোথায় লড়ানো দরকার।

"তারা মরুভূমির অধিবাসী" আন্দাযগার বলে "এবং তারা মরুভূমিতেই লড়াই করতে অভ্যস্ত। আমি তাদেরকে উর্বর এবং সবুজ-শ্যামলিমা স্থানে আসার

সুযোগ দিব অতঃপর তাদের উপর হামলা করব। আমার দৃষ্টিতে ওলযা উপযুক্ত স্থান।" এরপর সে কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করে " তাদের অশ্বারোহীরা কেমন?"

"অশ্বারোহীরাই তাদের মূল শক্তি" কমান্ডার বলে "তাদের অশ্বারোহীরা বড়ই দ্রুতগতির এবং সতর্ক । ছুটন্ত ঘোড়া হতে নিক্ষিপ্ত বর্শা টার্গেট মিস করে না। চোখের পলকে তারা এই হামলা করে। তারা স্থির হয়ে লড়ে না। আক্রমণের সূচনা ঘটিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে।"

"এটাই সূক্ষ্ম বিজয়, যা আমাদের সালার বুঝে উঠতে পারেন নি।" আন্দাযগার নিজের উরুতে হাত মেরে বলে "মুসলমানরা মুখোমুখী লড়তেই পারে না। আমরা তাদের থেকে কয়েকগুণ বেশী সৈন্য নিয়ে যাব। আমি তাদেরকে আমার সৈন্যদের আওতার মধ্যে নিয়ে সামনা-সামনি লড়তে তাদেরকে বাধ্য করব। জীবন বাঁচাতে তখন তাদের এমনটি করতেই হবে। তারা এবার বুঝবে যুদ্ধ কারে কয়।"

"আন্দারযগার!" উরদূশের বলে "এখানে বসে পরিকল্পনা তৈরি করা সহজ কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করা বড়ই কঠিন। এই কমান্ডার একটি তথ্য দিয়েছে; এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখ। সে বলেছে মুসলমানরা নিজ নিজ ধর্ম ও বিশ্বাসে অত্যন্ত বলীয়ান। তারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের নাম নিয়ে লড়াই করে। আমাদের সৈন্যদের মাঝে কি এই ধর্মীয় চেতনাবোধ আছে?... ঐ পরিমাণ নেই, যা মুসলমানদের মধ্যে আছে।... এবং এ দিকটাও খেয়াল কর আন্দাযগার! মুসলমানরা স্বদেশ ছেড়ে বহু দূরে এখন। এটা তাদের আরেক দুর্বলতা। এখানকার লোকেরা তাদের বিরোধী হবে।"

"না রাজাধিরাজ!" কমান্ডার বলে " পারস্যের যে এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে, সেখানকার লোকেরা তাদের মেনে নিয়েছে। তাদের আচার-ব্যবহার এত অমায়িক যে, তাদেরকে তারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তারা তাদের উপরই কেবল হাত উঠায়, যাদের আচরণ সন্দেহপূর্ণ হয়।"

"এখানকার আরব ইহুদীরা তাদের সমর্থন করতে পারে না। আন্দারযগার বলে "আমার অন্তরে তাদের প্রতি যে মহব্বত রয়েছে সে সম্পর্কে তারা ভালভাবে অবগত। আমি তাদেরকে আমার ফৌজে শামিল করে নেব। এখানকার মুসলমানদের উপর আমার আস্থা নেই। তারা চিরদিন অবাধ্য এবং বিদ্রোহী। তাদের উপর আমাদের কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। মদীনাবাসীদের সাথে তাদের যাবতীয় সেতুবন্ধন।"

"এ সকল মুসলমানের সাথে পূর্বের তুলনায় অধিক খারাপ আচরণ করে" উরদূশের বলে "তাদেরকে মাথা উচুঁ করার সুযোগ দিবে না।"

"আমরা তাদেরকে পশুর পর্যায়ে রেখেছি" আন্দারযগার বলে "তাদের ক্ষুধার্ত রেখেছি, তাদের ক্ষেতের ফসল আমরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। জীবন

ধারনের জন্য সামান্য কিছু দিয়ে আসি মাত্র। তারপরেও তারা ইসলাম থেকে হাত গুটিয়ে নেয় না। ক্ষুধায় তিলে তিলে মরতে রাজি তবে ইসলাম ছাড়তে প্রস্তুত নয়।"

"এটাই তাদের আত্মিক শক্তি" কমান্ডার বলে– "নতুবা এক ব্যক্তি কখনো দশজনের মোকাবিলা করতে পারে না। কাপড়ের বস্ত্র পরিহিত বর্মাচ্ছাদিতকে হত্যা করতে পারে না। মুসলমানরা এটা বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছে।"

"আমি এই শক্তি মাটির সাথে পিষে ফেলব " উরদূশের উচ্চ আওয়াজে বলে আন্দারযগার! এক্ষুণি ঐ মুসলমানদের কিছু বলো না, যারা আমাদের প্রজা হয়ে সেখানে আছে। তাদের এই প্রতারণার জালে আটকে রাখ যে, আমরা তোমাদের গুরুত্ব দিই; তোমাদের সাহায্য চাই। যারা আমাদের রাজত্বে পা রাখার সাহস দেখিয়েছে আগে তাদের শায়েস্তা কর। পরে ঐ নরপশুদের কচুকাটা কাটব যারা আমাদের আশ্রয়ে থেকে সাপের মত প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের বিষদাঁত আমরা এক একটা করে তুলে ফেলব। বড় নির্মমভাবে তাদের হত্যা করব।"

কিছু সময়ের ব্যবধানে ঐ দিনই উরদূশের মন্ত্রী, আন্দারযগার এবং তার অধীনস্থ সালারদের ডেকে পাঠায়। তারা উপস্থিত হলে সে বলে "যেখানে হামলা আমাদের করার ছিল অর্থাৎ মদীনা আক্রমণ করে সেখানেই ইসলাম ধুলিস্যাৎ করা উচিত ছিল, সেখানে হামলার সূচনা তারাই করে এবং আমাদের সৈন্যরা তাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"মাত্র দু' রণাঙ্গনেই আমাদের চার জাদরেল সালার মারা গেছে" উরদূশের বলে "এই চার সালারকে আমার সমরশক্তির স্তম্ভ মনে করতাম। কিন্তু তাদের মারা যাওয়ার দরুণ কিসরার শক্তি মরে যায় নি। সবাই কান খুলে শোন, যে সেনাপতি বা সহসেনাপতি পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে তাকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দিব। এর চেয়ে এটাই ভাল যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করবে। কিংবা অন্য কোথাও চলে যাবে। ইরানের সীমায় যেন না থাকে।....

"আন্দারযগার! মাদায়েন এবং তার আশ-পাশ থেকে যত সৈন্য চাও নিয়ে যাও। সেনাপতি বাহমানকে আমি খবর পাঠিয়েছি যে, সে যেন সমস্ত ফৌজ নিয়ে ফোরাতের উপকূলবর্তী ওলযা নামক স্থানে এসে পৌছে। তুমি তার থেকেও দ্রুত ওলযায় যাও। সেখানে ছাউনী ফেলে বাহমানের অপেক্ষা করবে। সে এলেই উভয় বাহিনী মুসলমানদের ঘিরে নিতে চেষ্টা করবে। তাদের একজন সৈন্য এবং কোন পশু যেন জীবিত না থাকে। তাদের সংখ্যা তোমাদের তুলনায় কিছুই নয়। আমি কোন বন্দী মুসলমান দেখতে চাইনা। তাদের লাশ দেখতে চাই। আমাকে তাদের লাশ উপহার দিবে। আমি তাদের ঐ লাশ দেখতে আসব, যা মৃত উট ও ঘোড়ার মাঝে একাকার হয়ে থাকবে। হয় জয় নয়ত মৃত্যু এই দুয়ের উপর যরথুস্ত্রের নামে তোমাদের শপথ করতে হবে। ...

"আন্দারযগার উভয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবে। ... আন্দারযগার! তোমার মাথায় কোন সংশয় এবং ধোঁকার অস্তিত্ব না থাকা চাই। মনে রেখ মুসলমানরা যদি আরো এগিয়ে আসার সুযোগ পায় এবং আমাদের আরো একবার পরাজিত করতে পারে তবে রোমকরাও আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এগিয়ে আসবে।"

"মহামান্য সম্রাট! পরাজয় শব্দ আর আপনার কান স্পর্শ করবে না" সর্বাধিনায়ক আন্দারযগার বলে "ইহুদী শক্তিকেও দলে ভিড়িয়ে নেয়ার অনুমতি আমায় দিন। তাদের যোগদানে ফৌজ বেশ স্ফীত হবে বলে আশা করি।"

"তুমি যা ভাল বোঝ কর" উরদূশের বলে "কিন্তু আমি সময় নষ্ট করার অনুমতি দিব না। ইহুদীদের প্রতি তোমার আস্থা থাকলে তাদেরও সঙ্গে নিতে পার।"

ইরাকের একটি অঞ্চলে ইহুদীদের একটি বড় গোত্র বকর বিন ওয়ায়েল বসবাসরত। এরা মূলত আরবের অধিবাসী। ইসলামের সম্প্রাসারণ কালে যে সকল ইহুদী ইসলাম কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায় তারা এক এক করে এসে এখানে আবাস গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা কোন সময় ইরানীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসে যুদ্ধবন্ধী হয়েছিল। ইরানীরা তাদেরকে আযাদ করে এই এলাকায় বাস করতে দেয়। এখানকার কিছু লোক মুসলমানও ছিল। মুসান্না বিন হারেছার মত তুখোড় নেতা তারা লাভ করেছিল। ফলে তার মাধ্যমে তারা পাক্কা মুসলমান হতে পেরেছিল। মুসলমানদের উপর ইরানীরা সীমাহীন জুলুম করলেও ইহুদীদের সাথে আচরণ কিছুটা ভিন্নতর ছিল। ঐতিহাসিকদের অভিমত, সেনাপতি আন্দারযগার হুরমুজের মত জালিম ছিল না। মুসলমানদের উপর সে জুলুম না করলেও তাদের ভাল চোখে দেখত না। ইহুদীদের সাথে তার ছিল দহরম-মহরম। এ পর্যায়ে সে ইহুদীদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সে বকর বিন ওয়ায়েলের সর্বোচ্চ নেতাদের ডেকে পাঠায়। তারা খবর পেয়েই ছুটে আসে।

"আমার বিরুদ্ধে তোমাদের কারো কোন অভিযোগ থাকলে নির্দ্ধিধায় বলতে পার" আন্দারযগার বলে "আমি সে অভিযোগ দূর করব।"

"কোন ভূমিকা না টেনে আমাদের ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য সরাসরি বললে ভাল হয়না?" এক বৃদ্ধ বলে "আমরা আপনাদের প্রজা। আমাদের অভিযোগ থাকলেও তা মুখে আনব না।"

"আমাদের কোন অভিযোগ নেই" আরেকজন বলে "আপনার যা বলার বলতে পারেন।"

"মুসলমানরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে" আন্দারযগার বলে "পারস্য বাহিনী তাদেরকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে মারবে। কিন্তু আমরা তোমাদের প্রয়োজন অনুভব করছি। তোমাদের নওজোয়ানদের আমাদের খুব প্রয়োজন।

"পারস্য বাহিনীই যখন মুসলমানদেরকে ফোরাতে ডুবাতে সক্ষম তখন আমাদের নওজোয়ানদের আবার প্রয়োজন পড়ল কেন? প্রতিনিধি দলের এক বয়োবৃদ্ধ নেতা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে "আমরা শুনতে পেরেছি, ইরান সৈন্যদের চার সালার ইতোমধ্যে মারা গেছে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন? আমরা আপনাদের প্রজা। নির্দেশ দিন। আমরা অবাধ্যতা প্রদর্শনের সাহস রাখি না।"

"আমি কাউকে নির্দেশ বলে ময়দানে নিতে চাইনা" আন্দারযগার বলে "আমি তোমাদেরকে তোমাদের মাজহাবী নামেই শামিল করতে চাই। পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডের জন্য নয় নিজের ধর্ম এবং চেতনা রক্ষার জন্য আমি লড়াই করব। মুসলমানরা একের পর এক যুদ্ধ জয়ের কারণ হলো তারা নিজ ধর্ম ও বিশ্বাসের চেতনা নিয়ে লড়ে। তারা যে এলাকা জয় করে সেখানকার লোকদের ইসলাম কবুল করতে বলে। ইসলাম কবুল না করলে তাদের থেকে ট্যাক্স উসুল করে।...

এটা কি সত্য নয় যে, তোমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা ইসলাম কবুল করবে না বলেই স্বীয় ঘর-বাড়ী ছেড়ে এসেছিল? তোমরা কি চাও যে, মুসলমানরা আসুক এবং তোমাদের উপসনালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাক? মুসলমানরা তোমাদের কন্যাদের বাঁদী বানিয়ে সাথে নিয়ে গেলে তোমরা সহ্য করতে পারবে?... একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, তোমাদেরকে আমাদের নয়, বরং আমাদেরকেই তোমাদের বেশী প্রয়োজন। আমি তোমাদেরকে একটি ফৌজ দিচ্ছি। তাদেরকে আরো শক্তিশালী কর এবং স্বীয় মাজহাবকে এক ভিত্তিহীন ধর্ম থেকে বাঁচাও।"

আন্দারযগার ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমনভাবে উত্তেজিত করে তোলে যে, তারা তৎক্ষণাৎ এলাকায় ফিরে যায় এবং ইহুদী গোত্রের প্রতিটি বসতিতে গিয়ে এই ঘোষণা করে যে, মুসলমানদের বিরাট বাহিনী হত্যা-লুটতরাজ চালাতে চালাতে আসছে। তাদের হাত থেকে তারাই কেবল রেহাই পায় যারা তাদের ধর্ম গ্রহণ করে। তারা ফিরে যাবার সময় যুবতী ও তরুণী নারীদের সাথে নিয়ে যাবে।

"নিজ নিজ কন্যা লুকিয়ে ফেল।"

"ধন-সম্পদ মাটিবক্ষে চাপা দাও।"

"স্ত্রী-পরিজনদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও।"

"যুবকরা হাতিয়ার, ঘোড়া এবং উট নিয়ে আমাদের সাথে এস।"

"সম্রাটের সৈন্যরা আমাদের সাথে আছে।"

"ঈসা-মসীহের শপথ! আমরা ইজ্জত রক্ষায় জীবন বাজি রাখব।"

"তবুও ধর্ম বিশ্বাস ছাড়ব না।"

দিকে দিকে একটি আওয়াজ ওঠে, আহ্বান ভেসে আসে, যা ঘুর্ণিঝড়ের মত পাহাড়-পর্বত আর জ্বিন ইনসানকে ব্যাপৃত করে ছুটে আসে। কেউ কাউকে

জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় না যে, এসব কি হচ্ছে? মুসলমানরা সত্যই আসছে কি? কোন্ দিক থেকে আসছে? উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। ইহুদী মায়েরা যুবক পুত্রকে বিদায় জানাতে থাকে। স্ত্রী স্বামীকে বোন ভাইকে আল বিদা জানায়। কিছু সময়ের মধ্যে একটি ফৌজ তৈরি হয়ে যায়। ফৌজের সংখ্যা সময়ের তালে তালে বাড়তে থাকে। কিসরার ফৌজের কমান্ডার প্রমুখ এসে গিয়েছিল। তারা স্বেচ্ছাসেবকদের এক স্থানে সমবেত করছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে ইরানী বাহিনীর সাথে যোগ দিতে তাদের সংগ্রহ করা হয়।

॥ এগার ॥

এক বসতিতে এই সৈন্য সমাবেশ চলে। সূর্য অনেকপূর্বেই ছুটি নিয়ে বিশ্রামে গিয়েছিল। বসতিতে অসংখ্য মশালধারী হৈ চৈ সৃষ্টি করে পায়চারি করছিল। বসতিটি দিনের মত জাগ্রত এবং তৎপর ছিল। এরই মধ্যে দুই অপরিচিত লোক এসে বসতিতে ঢুকে পড়ে এবং মানুষের ভীড়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

"একটি আহ্বান শুনে আমরা এসেছি" আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলে "আমরা আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে অনেক দূর থেকে এসেছি। এভাবে যেতে যেতে হয়ত এক সময় মাদায়েন গিয়ে পৌঁছব। তা এসব কি হচ্ছে?"

"তোমরা কারা?" কেউ জানতে চায়– "কান ধর্মের অনুসারী?"উপরে নিজ নিজ শাহাদাত আঙ্গুল পর পর উভয় কাঁধে রাখে অতঃপর নিজ নিজ বুকে আঙ্গুল উপর নীচ করে ক্রুশ চিহ্ন বানায় এবং উভয়ে একসাথে বলে ওঠে যে, তারা ইহুদী।

"তবে তোমরা ময়দানে গিয়ে কি করবে?" এক বৃদ্ধ তাদের বলে "তোমরা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। শরীরে বেশ শক্তি আছে। তোমরা নিজেদেরকে কুমারী মারইয়ামের ইজ্জত রক্ষার্থে উৎসর্গ হওয়ার যোগ্য মনে কর না? তোমাদের কাছে পেটের মায়াই কি বড় হয়ে গেল?"

"না, কখনো নয়!" তাদের একজন বলে "আমাদেরকে সব ভেঙ্গে বল এবং তোমাদের মাঝে যিনি সবচেয়ে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দাও। আমরা তাকে কিছু বলতে চাই।

সেখানে ইরানী ফৌজের সাবেক এক কমান্ডার ছিল। আগন্তুকদ্বয়কে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

"শুনলাম তোমরা নাকি কিছু বলতে চাও" কমান্ডার বলে। "জী, হ্যা!" একজন বলে "আমরা গন্তব্যের রাস্তা ছেড়ে এদিকে এসেছি। "শুনলাম, মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ফৌজ তৈরি হচ্ছে।"

"হ্যা, হচ্ছে" কমান্ডার বলে "তোমরা সে ফৌজে শামিল হতে এসেছ?"

"ইহুদী হয়ে এটা কিভাবে বলা যায় যে, আমরা ঐ ফৌজে শামিল হব না?" একজন বলে "কাজিমা থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত এক বসতির আরব আমরা। মুসলমানদের ভয়ে আমরা এদিকে পালিয়ে এসেছি। আর সামনে যাব না।

আপনাদের সাথে থাকব।... আমরা যে কথা বলতে এসেছি তা এই যে, মুসলমানদের সংখ্যা মূলত অনেক বেশী। কিন্তু তারা সামনে খুব সামান্যই আনে। মূলত এ কারণেই আপনাদের ফৌজ তাদের হাতে পরাজিত হয়।

"মাটিতে ছক একে তাকে বুঝাও" দিতীয় ব্যক্তি তার সাথীকে বলে। এরপর কমান্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানায় "সাধারণ ব্রেনের মানুষ আমাদের মনে করবেন না। আমরা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি যে মুসলমানদের যুদ্ধের কৌশল কি? তারা বর্তমানে কোথায়? কোথায় নিয়ে যুদ্ধ করলে আপনারা তাদের পরাজিত করতে পারবেন। আমরা যা যা বলব, আপনাদের সেনাপতিকে গিয়ে তা জানাবেন।"

একটা মশাল এনে মাটিতে গেঁড়ে দেয়া হয়। আগন্তুকদ্বয় মাটিতে বসে ছক আঁকতে শুরু করে। তারা সমর পরিভাষায় এমন নক্সা পেশ করে যে, কমান্ডার খুবই প্রভাবিত হয়।

"মাদায়েনের সৈন্য কোন্ রুট হয়ে আসছে জানালে আমাদের পক্ষে ভাল ও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ দেয়া সম্ভব হত" তাদের একজন বলে "সাথে সাথে কিছু বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করতে পারতাম।"

"দুই ফৌজ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে আসছে" কমান্ডার বলে "মুসলমানরা তাদের সামনে টিকতে পারবে না।"

'তবে শর্ত হলো, উভয় বাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন পথে আসতে হবে" এক অপরিচিত ইহুদী বলে।

"হ্যাঁ, তারা ভিন্ন পথেই আসছে" কমান্ডার বলে " আমাদের নামকরা এবং অসাধারণ বীর আন্দারযগারের নেতৃত্বে একটি ফৌজ মাদায়েন থেকে আসছে। এমনি আরেক শ্রেষ্ঠ বাহাদুর বাহমানের নেতৃতে ইরানীদের আরেকটি ফৌজ আসছে। উভয় বাহিনী ওলযা নামক স্থানে এসে মিলিত হবে। তাদের সাথে যোগ দিবে বকর বিন ওয়ায়েলের পুরো গোত্র । ছোট ছোট কিছু গোত্রও তাদের জনশক্তি দিতে চেয়েছে।"

'তবে আপনাদের সালারের জন্য নতুন কোন যুদ্ধ চাল চালার প্রয়োজন নেই" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে "আপনাদের সৈন্য তো প্লাবনের মত। যার স্রোতে মুসলমানরা তৃণের ন্যায় ভেসে যাবে।... আপনি কি আমাদের দু'জনকেই আপনার সাথে রাখবেন? আমরা আপনার মাঝে অসাধারণ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করছি। সেনাপতি না হলেও সহসেনাপতি হওয়ার যোগ্য অবশ্যই আপনি।"

"তোমরা আমার সাথে থাকতে পার" কমান্ডার বলে।

"তাহলে আমরা ঘোড়া নিয়ে আসি" দু'জনের একজন বলে "কাল প্রত্যুষে আমরা ঠিক এখানে আপনার সাথে এসে যোগ দিব।"

"ভোরে আমরা রওনা দেব" কমান্ডার বলে "লড়ার উপযোগী লোকদেরকে একস্থানে সমবেত করা হচ্ছে। তোমরা তাদের সাথে এস। আমাকে পেয়ে যাবে।"

আগন্তুকদ্বয় বসতি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তারা বসতির অদূরে এক বৃক্ষের সাথে ঘোড়া বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে বসতিতে গিয়েছিল। বসতি হতে বেরিয়েই তারা ছুট দেয় এবং দৌড়ে ঘোড়ায় চেপে বসে।

"সকাল নাগাদ আমরা পৌঁছতে পারব বিন আছেফ?" একজন অপরজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে।

"খোদার কসম! আমাদের পৌঁছতেই হবে। চাই উড়ে গিয়ে হোক না কেন" বিন আছেফ বলে "এই সংবাদ সময়মত হযরত খালিদ (রা.) জানতে না পারলে আমাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ঘোড়া ক্লান্ত নয়। আল্লাহর নাম স্মরণ কর এবং ঘোড়া ছুটিয়ে দাও।"

উভয় ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। ঘোড়া উড়ে উড়ে চলতে থাকে হযরত খালিদ (রাঃ)-এর ছাউনী অভিমুখে। উড়ন্ত ঘোড়ায় বসে দু'অশ্বারোহী সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে আলোচনা করতে থাকে।

"আশ'আর!" বিন আছেফ উচ্চ আওয়াজে তার সাথীকে বলে "এটা তো রীতিমত তুফান। অগ্নিপূজকদের এবার পরাজিত করা সহজ হবে না। শুধু বকর বিন ওয়ায়েলের সংখ্যা দেখছ? কয়েক হাজার হবে।"

"আমি সালার হযরত খালিদ (রা.)-কে বড় পেরেশান দেখেছিলাম" আশ'আর বলে।

"তুমি তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ বোঝনি আশ'আর?" বিন আছেফ বলে "আমরা শক্তিশালী দুশমনের উদরে ঢুকে গেছি।"

"আল্লাহ আমাদের সহায়" আশ'আর বলে "অগ্নিপূজকরা ঐ ভূখণ্ড রক্ষায় লড়ছে, যাতে তারা তাদের সাম্রাজ্য বলে মনে করে। আর আমরা ঐ আল্লাহর রাহে লড়ছি, সমগ্র ভূপৃষ্ঠ যার মালিকানাধীন।"

হযরত খালিদ (রা.) পারস্যভুক্ত এলাকা অধিকার করার পর স্থানীয় শত্রু ও ইরানীদের সম্পর্কে সতর্ক হতে যে গোয়েন্দা দল গঠন করেছিলেন এই দু'ব্যক্তি সেই দলের বিচক্ষণ ও দক্ষ সদস্য ছিল। শত্রু পরিবেষ্টিত অচেনা অজানা দেশে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে গোয়েন্দা বাহিনীর বিকল্প ছিলনা। গোয়েন্দারা যেমনি দুর্ধর্ষ তেমনি সাহসী হত। শত্রুর পেটের মধ্যে ঢুকে তার নাড়ীর খবর বের করে আনতে তাদের জুড়ি ছিল না। শত্রুর তৎপরতা মনিটরিং করতে হযরত খালিদ (রা.) শক্তিশালী গোয়েন্দা বাহিনী গড়ে তোলে চতুর্দিকে গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। গোয়েন্দারা ছিল তাঁর চোখ, কান। নিজের ছাউনীতে বসেই তিনি এ চোখ, কানের মাধ্যমে শত্রুর অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে যথা সময়ে অবহিত হতেন। হযরত খালিদ (রা.) ফযরের নামায সবেমাত্র শেষ করেছেন। নামায থেকে অবসর হতেই দু'টি ঘোড়া তাঁর তাঁবুর কাছে এসে থামে। ঘোড়ার আরোহীদ্বয় এক প্রকার লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করে। অশ্বারোহীদের দেখে হযরত খালিদ (রা.) নিজেই তাদের দিকে এগিয়ে যান।

ঘোড়ার শরীর ফুঁড়ে ঘাম এমনভাবে ঝরছিল যেন কোন নদী হতে সদ্য উঠে এল। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বড় আওয়াজে ধুক ধুক করে উঠানামা করছিল। আরোহীদের অবস্থা ঘোড়ার থেকেও খারাপ ছিল।

"আশ'আর!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "বিন আছেফ! ... কি খবর এনেছ? ভেতরে চল। একটু বিশ্রাম নাও।"

"বিশ্রাম গ্রহণের সময় নেই সেনাপতি আমার!" বিন আছেফ হযরত খালিদ (রা.)-এর পিছু পিছু তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করতে করতে বলে "অগ্নিপূজকদের প্লাবন আসছে। আমরা এ তথ্য ইহুদীদের এক বসতি হতে সংগ্রহ করেছি। বকর বিন ওয়ায়েলের স্বতন্ত্র বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে। তারা আন্দারযগার নামক এক বীর সেনাপতির নেতৃত্বে মাদায়েনের সৈন্যের সাথে আসছে। আরেকটি ফৌজ বাহমানের নেতৃত্বে অপর দিক থেকে আসছে।"

"সৈন্যরা কি আমাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন দিক হতে আক্রমণ করবে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"না" আশ'আর জবাবে বলে "উভয় বাহিনী ওলযায় এসে একত্রিত হবে।"

"এরপর তারা প্লাবনের মত আমাদের দিকে ধেয়ে আসবে এই বলছ?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"ইরানীদের কমান্ডার এমনই বলেছে" বিন আছেফ বলে। তাদের রিপোর্ট শেষ হতে না হতেই তাঁবুর বাইরে এক উট এসে থামে। উষ্ট্রারোহী উট থেকে নেমেই পূর্বাব গতি ছাড়াই তাঁবুতে ঢুকে যায়। সে হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায় যে, অমুক দিক হতে বাহমানের নেতৃত্বে ইরানীদের একটি ফৌজ আসছে। এ উষ্ট্রারোহীও এক গোয়েন্দা ছিল। সে কোন এক বেশে ঐ পথে গিয়েছিল, যে পথে বাহমানের ফৌজ আসছিল।

ঐতিহাসিকদের অভিমত, আন্দারযগার এবং বাহমানের এমন সময় মার্চ করা উচিত ছিল যাতে উভয় ফৌজ একই সময়ে কিংবা সামান্য আগে পিছে ওলজা নামক স্থানে এসে পৌছতে পারে। কিন্তু আন্দারযগার একটু পূবেই রওনা করে। এর কারণ এটা হতে পারে যে, সে কিসরা উরদূশেরের কাছে অবস্থান করছিল। উরদূশের তার মাথার উপর চেপে বসেছিল। তার পীড়াপীড়িতে সে আগে মার্চ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাহমান দূরে ছিল দূত মারফত সে ফৌজসহ আসার নির্দেশ পেয়েছিল। দু'দিন পরে সে রওনা হয়।

আন্দারযগারের সাথে আসা সৈন্যের সংখ্যা কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায় না। বাহমানের নেতৃত্বাধীন ফৌজের সংখ্যাও ইতিহাস সংরক্ষণ করেনি। তবে তাদের বর্ণনা হবে সন্দেহাতীতভাবে বুঝা যায় যে, উভয় বাহিনীর সম্মিলিত সৈন্য বাস্তবিকই প্লাবনের মত ছিল। এত বিশাল সৈন্য সমাবেশের কারণ এই ছিল যে, সম্রাট উরদূশের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল যে, সে আর কোন পরাজয়ের ঝুঁকি নিবে না। ফলে যত সৈন্য জমা করা সম্ভব তা করা হয়েছিল।

আন্দারযগারের নিজেরই সৈন্য ছিল বে-হিসাব। তারপরেও সে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের হাজার হাজার ইহুদীকে নিজের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে পদাতিকও ছিল, অশ্বারোহীও ছিল। আন্দারযগারের সৈন্যসংখ্যা পথিমধ্যে এসে এভাবেও বৃদ্ধি পায় যে, মা'কাল দরিয়ার কূলে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে সকল ইরানী সৈন্য নৌকা করে ভাগ্যক্রমে পালিয়ে বেঁচে যেতে পেরেছিল, তারা নদীতে এদিক ওদিক ভেসে অনেক দিন পর এখন মাদায়েন যেতে থাকে। আন্দারযগার পথিমধ্যে এদের পেয়ে ছাড়ে না। সৈন্য বৃদ্ধির প্রবণতায় তাদেরও ফৌজের সাথে যুক্ত করে নেয়।

এ সমস্ত সৈন্যরা আন্দারযগারের ফৌজের সাথে যেতে চায় না। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, পরাজিত এ সৈন্যরা বিধ্বস্ত অবস্থায় দুই দুইজন, চার-চারজন বা তার থেকেও বেশী এক সাথে আসছিল। ইরানীদের এ নয়া বাহিনী দেখে অনেকে পালাতে উদ্যত হয়। মানসিক বিধ্বস্ত এবং বিকারগ্রস্ত হওয়ায় তারা দ্রুত দৌড়াতেও পারে না। তাদের ধরে ধরে আনা হয় এবং ফৌজে শামিল করে নেয়া হয়। তাদের কতক এমনও ছিল যাদের মধ্যে ভারসাম্যও ছিল না। কতক কথা বলতে পারত না। তাদের সাথে কথা বললে তারা ফ্যাল ফ্যাল নজরে শুধু চেয়ে থাকত এবং প্রতিক্রিয়াশূন্য চেহারা নিয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কেউ কেউ কথা বলার পরিবর্তে চিৎকার করে উঠত এবং ছুটে দৌড় দিত। হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যদের হাতে চরম মার খাওয়ায় তাদের মাঝে এমন প্রভাব পড়েছিল যে, তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল এবং ব্রেনে চাপ পড়ায় অনেকের মতিভ্রমও ঘটে।

"সমস্ত ফৌজে ভীতি এবং উদ্বেগ সৃষ্টির পূর্বেই তাদের দূরে কোথাও নিয়ে শেষ করে দাও" অচল শ্রেণীর সৈন্যদের ব্যাপারে আন্দারযগার এই কঠিন সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়।

তার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়। যে প্রাণে বাঁচার জন্য তারা শতবিধ বিপদ এড়িয়ে আসে। আন্দারযগারের এক নিষ্ঠুর নির্দেশে সে প্রাণ চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে যায়।

মাদায়েনের সৈন্যরা তেজোদ্যম ছিল। মুসলমানদের বাহুর বিজলি তখনো তারা দেখে নাই। কিন্তু মা'কাল দরিয়ার কূলে পরাজিত সৈন্যদের ধরে যখন ফৌজে আনা হয় তখন তাদের অবস্থা দেখে ভীতির একটি হাল্কা শিহরণ ও মৃদু বার্তা পুরো ফৌজের শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। পরাজিত সৈন্যরা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এবং নিজেদেরকে ভর্ৎসনার উর্ধ্বে প্রমাণ করতে মুসলমানদের সমরশক্তি ও আক্রমণের তীব্রতার এমন এমন কথা উল্লেখ করে, যা সৈন্যদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়, ভীতি সৃষ্টি করে। মুসলমানদেরকে তারা সৈন্যদের কাছে অদৃশ্য শক্তির আধার এবং জ্বিন দানব বলে প্রকাশ করে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সমর সফলতার একটি দিক এই ছিল যে, তিনি শত্রুপক্ষকে শারীরিকভাবে এমন শাস্তি দিতেন যে, তার প্রতিক্রিয়া অন্তরেও গভীর রেখাপাত করত। আর এ প্রভাব এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকত। এ শ্রেণীর সৈন্যদের দ্বারা আরেকটি যুদ্ধ করানো হলে পূর্বভীতির প্রভাব হযরত খালিদ (রা.)-কে অনেক উপকার দিত। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব হতেই তারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত থাকত। একটু চাপ সৃষ্টি হলেই তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেত। নতুন সৈন্যরাও তাদের দেখাদেখি রণাঙ্গন ছেড়ে যেত। সৈন্যদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদেরকে পিছু হটিয়ে দেয়ার উপর ক্ষান্ত করতেনা না; বরং দূর দূরান্ত পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ভেড়া বকরীর মত তাড়িয়ে নিয়ে যেতেন এবং পাইকারী হারে প্রাণহানী ঘটাতেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তাঁকে এ তথ্যও সরবরাহ করে যে, বিগত রণাঙ্গনের পরাজিত সৈন্যরাও মাদায়েন থেকে আগত ফৌজে শামিল হচ্ছে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সেনাপতিদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন।

"আমার প্রিয় বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) তাদের উদ্দেশে বলেন "আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এখানে লড়তে এসেছি। কেবল সমরদৃষ্টিতে বিবেচনা করলে নিশ্চিত আমরা ইরানী ফৌজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত নই। স্বদেশ থেকে আমরা বহুদূরে। সেনাসাহায্যের কোন পথ আমাদের নেই। আমরা ফিরেও যেতে পারি না। আমরা ইরানী এবং কিসরাকে নয়; আগুনের উপাস্য বলে যাদের মনে করা হয় তাদের পরাস্ত করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।..."আপনাদের সবার চেহারায় আমি ক্লান্তির ছাঁপ দেখছি। চোখ থেকেও ক্লান্তি ঝরে পড়ছে। কথাবার্তাতেও কেমন ক্লান্তির জড়তা ভাব । কিন্তু কা'বার প্রভুর কসম। আমাদের আত্মা ক্লান্ত নয়। এখন আমাদের এই আত্মশক্তি নিয়ে লড়তে হবে।"

"এমনটি উচ্চারণ করবেন না জনাব খালিদ!" সালার আছেম বিন আমর বলেন "অবশ্যই আমাদের চেহারা থেকে ক্লান্তি ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু তাই বলে এটা নৈরাশ্যের নিদর্শন নয়।"

"আমাদের দৃঢ়তায় ক্লান্তি অনুপ্রবেশ করতে পারেনি ইবনে ওলীদ!" আরেক সালার হযরত আদী বিন হাতেম (রা.) বলেন "আমরা পরিমিত বিশ্রাম নিয়েছি। সৈন্যরাও ক্লান্তি ঝেড়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।"

"আল্লাহর সৈনিকরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারে তার জন্যই আমি এখানে ছাউনী ফেলেছি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তোমাদের প্রত্যয়ে ভাটা না পড়লে আমার কোন কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি এখন ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাই, যা বর্তমান সময়ে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।... তোমরা হয়ত লক্ষ্য করেছ যে, আমরা প্রথমবার ইরানীদের পরাজিত করলে তারা দ্বিতীয়বার আবার

আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসে। তাদের সাথে ঐ সমস্ত সৈন্যও ছিল যারা প্রথম যুদ্ধে পালিয়ে গিয়েছিল। এবারও আমাকে জানানো হয়েছে যে, দ্বিতীয় যুদ্ধে যারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল মাদায়েন থেকে আগত সৈন্যদের সাথে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় তারাও আবার এসেছে। এখন তোমাদের বেশীর থেকে বেশী এই চেষ্টা করতে হবে, যেন অগ্নিপূজকদের একটি সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে না পারে। খতম করে ফেলবে নতুবা বন্দী করবে। কিসরার সৈন্যের নাম নিশানা মিটিয়ে ফেলতে আমি বদ্ধপরিকর।"

"তাদের প্রভু এমনটাই করবেন" তিন-চার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"সবই আল্লাহর কুদরতের আওতাধীন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমরা তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে এতদূর এসেছি।... বর্তমানে আমাদের সামনে যে পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে সে ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা কর। আবেগের বশবর্তী হয়ে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। এই বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, ইরানীদের যে সৈন্য স্রোত আসছে তার মোকাবিলায় দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমাদের নেই। কিন্তু পশ্চাদপসারণের ধারণাও মাথা থেকে মুছে ফেল। সদ্য প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মাদায়েনের সৈন্যরা দজলা পার হয়ে এসেছে। আজ রাতে ফোরাত অতিক্রম করে ফেলবে। এরপর তারা ওলযায় পৌছবে। তাদের অপর বাহিনীও আসছে। আমাদের গোয়েন্দারা তাদের নিরীক্ষণ করছে এবং আমাকে প্রতিনিয়ত সংবাদ সরবরাহ করছে। ...

মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করছেন । এটা ঐ সত্তারই অপার অনুগ্রহ ও করুণা যে, বাহমান সেনাপতির নেতৃত্বে অপর যে বাহিনী আসছে তাদের গতি দ্রুত নয়। তারা অধিক বিশ্রাম নিতে নিতে আসছে। আমরা নিজেদের মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে উভয় বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারি না। আমার বিবেক সচল থাকলে আমি এটা ভাল মনে করছি যে, আন্দারযগারের নেতৃত্বে মাদায়েন থেকে যে বাহিনী আসছে তারা দ্রুত ওলযায় পৌছে যাবে। বাহমান তার সাথে এসে মিলিত হওয়ার পূর্বেই আমি আন্দারযগারের সৈন্যদের উপর ঝাপিয়ে পড়তে চাই। এটা কি ভাল হয় না?

"এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না" সালার হযরত আছেম (রাঃ) বলেন- "মাদায়েন বাহিনীর এক দুর্বলতা আমি দেখতে পাচ্ছি। আর তা হলো, ঐ বাহিনীতে ইহুদী লোকেরাও আছে। তারা যুদ্ধ করতে সার্মথ্য হলেও নিয়মিত যুদ্ধে তারা অভ্যস্ত নয়। সুশৃঙ্খল যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। আমি তাদেরকে সৈন্য নয়; সুসজ্জিত জনতার ভীড় বলে মনে করি। আরেকটি দুর্বলতাও আছে। সাবেক যুদ্ধের পরাজিত সৈনিকরা মাদায়েনদের সাথে যোগ দিয়েছে। আমার বিশ্বাস তারা এখনো ভীত। তারা চোখের সামনে তাদের হাজার হাজার সাথীকে তলোয়ার, তীর এবং বর্শার শিকার হতে দেখেছে। পশ্চাদপসারণে তারা থাকবে সবার আগে।"

"খোদার কসম, ইবনে আমর!" হযরত খালিদ (রা.) আনন্দবিমোহিত কণ্ঠে বলেন "তোমার মেধা শক্রর দুর্বলতা চিহ্নিত করতে দারুণ সক্ষম।" এরপর হযরত খালিদ (রা.) উপস্থিত সকলের চেহারায় দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন "আমি মনে করি এখানে এমন একজনও নেই যে এ কথাটি বুঝেনি। তরপরেও শক্রর এই দিকটি এড়িয়ে যাবার নয় যে, তাদের কাছে অস্ত্র, হাতিয়ার, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, রসদ ও সৈন্যের কমতি নেই। কেবল আন্দারযগারের ফৌজই আমাদের সংখ্যার ছয়গুণ বেশী। আমি যে কৌশল এটেঁছি তা যথাযথ এবং অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। তবে সহজ হবে না। যুদ্ধই সৈন্যর পেশা। তারা বুঝে এখানে আসার মতলব কি? তারপরেও তাদের বুঝাও যে, আমরা এখান থেকে ফিরে যেতে আসিনি থাকলে মাদায়েনে থাকব নতুবা আল্লাহর কাছে চলে যাব।"

আল্লামা তবারী এবং ইয়াকুত দুই ঐতিহাসিক লেখেন যে, এটা বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার লড়াই ছিল। সংখ্যা, সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য অবস্থার দিকে তাকালে উভয় বাহিনীর মাঝে তুলনার কোন দিকই ছিল না। হয়ত খালিদ (রা.)-এর চেহারা ছিল বিবর্ণ । গভীর চিন্তার মাঝে তাঁর রাত অতিবাহিত হত। সেনা ছাউনীতে পায়চারি করতে করতে তিনি থেমে যেতেন এবং গভীর চিন্তায় ডুব দিতেন। মাটিতে বসে আঙ্গুলির সাহায্যে বালুর উপর নক্সা করতেও তাঁকে দেখা যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ এই ছিল যে, ইরানীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই না করে ফিরে যাবেন না বলে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সৈন্যদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্বের মত এবারও ডান এবং বাম বাহিনীর নেতৃত্বে থাকেন হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)। নিজের সাথে মাত্র দেড় হাজার সৈন্য রাখেন, যাদের মধ্যে পদাতিকও ছিল আবার অশ্বারোহীও ছিল। সৈন্য বিন্যস্ত শেষ হলে তিনি মার্চ করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ তিনি ঠিক ঐ সময় দেন, যখন গোয়েন্দা সূত্র তাকে জানায় যে, আন্দারযগারের বাহিনী ফোরাত অতিক্রম করেছে। তিনি চলার গতি এমন রাখেন, যাতে ইরান ফৌজ ওলযায় পৌছেই তাদের সামনে দেখতে পায়। এটা যুদ্ধ বিচক্ষণতার বিস্ময়কর এবং অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

॥ বার ॥

হযরত খালিদ (রা.)-এর পরিকল্পনাই পদে পদে বাস্তবায়িত হয়। আন্দারযগারের সৈন্যরা ওলযায় পৌছলে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ আসে চীপ কমান্ডার থেকে। কারণ, এখানেই বাহমানের বাহিনী এসে মিলিত হওয়ার কথা। সৈন্যরা দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি নিয়ে তাঁবু স্থাপন করতে থাকে। ইত্যবসরে শোরগোল ওঠে বাহমানের বাহিনী আসছে। সমস্ত সৈন্য তাদের অভ্যর্থনা জানাতে আনন্দে উচ্ছসিত হতে থাকে কিন্তু আচমকা উল্লাস থেমে যায়।

"এটা মদীনার ফৌজ" কেউ উচ্চকণ্ঠে বলে এবং এর সাথে সাথে একাধিক আওয়াজ ভেসে আসে "শত্রুরা এসে গেছে।... প্রস্তুত হও।... সাবধান!"

আন্দারযগার ঘোড়ায় চেপে সামনে এগিয়ে যায়। ভাল করে আগত বাহিনী নিরীক্ষণ করে। বাস্তবেই এটা হযরত খালিদ (রা.)- এর বাহিনী ছিল। তারা যুদ্ধের বিন্যাসে থেকে অবস্থান করছিল। তাঁবু স্থাপন কিংবা ছাউনী ফেলছিল না। যার অর্থ ছিল, মুসলমানরা লড়ার জন্য প্রস্তুত।

"চীফ কমান্ডার?" এক সালার আন্দারযগারকে উদ্দেশ করে বলে "আমাদের অপর বাহিনী এখনো পৌঁছেনি। মনে হচ্ছে তারা এখনো অনেক দূরে। নতুবা এই মুসলমানদেরকে এখনই পিষ্ট করে ফেলতাম। এরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অথচ আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত।"

"তাদের সৈন্য সংখ্যা কত কম দেখছ না?" আন্দারযগার বলে "অতি কষ্টে দশ হাজারই হবে। আমি তাদেরকে পিঁপড়ার থেকে বেশী মনে করিনা। ... তাদের অশ্বারোহীরা কোথায়? কোথায় আবার হবে!" এক সালার মন্তব্য করে "ময়দান সম্পূর্ণ ফাঁকা যা কিছু আছে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

"মনে হয় আমাদের সালার এবং কমান্ডাররা এক একজনকে ছয় ছয় জন দেখত" আন্দারযগার বলে "পরাজিত হয়ে পলায়নপর সৈন্যরা মাদায়েনে গিয়ে বলেছিল যে, মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী বিরাট শক্তিধর তাদের অশ্বারোহীরা যুদ্ধে এতই দক্ষ যে, তাদেরকে কেউ ছুঁতে পর্যন্ত পারে না। অশ্বারোহী ইউনিট তো আমার চোখেই পড়ছে না।"

"আমাদেরকে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে" সালার বলে "আমরা বাহমান আসার অপেক্ষায় বসে থাকব না। তাদের আসতে আসতেই আমরা মুসলমানদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিব।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুসলমানদের অশ্বারোহী দল বাস্তবিকই সেখানে ছিল না। পদাতিক বাহিনীর সাথে সামান্য সংখ্যক অশ্বারোহী ছিল কিংবা হয়ত তারা হযরত খালিদ (রা.)-এর দেহরক্ষী ছিল। ঘোড় সওয়ার ইউনিট নেই দেখে অগ্নিপূজকদের সাহস বেড়ে যায়। আন্দারযগারের রঙিন কল্পনায় এ যুদ্ধ জয় ছিল হাতের মোয়া সম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এ ফলাফলই বের হয় যে, মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশাল ইরানী বাহিনীর মোকাবিলায় এসে হযরত খালিদ (রাঃ) ভুলই করেছিলেন।

উভয় বাহিনী এক সমতল ভূমিতে মুখোমুখী। ডানে এবং বামে দু'টি সুউচ্চ টিলা ছিল। একটি টিলা একটু সামনে বেড়ে মোড় পরিবর্তন করেছিল। তার পশ্চাতে আরেকটি টিলা ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনী যুদ্ধ বিন্যস্ততায় রেখেছিলেন। ওদিকে ইরান বাহিনীও যুদ্ধের সারিতে এসে যায়। উভয় বাহিনীর সেনাপতি পরস্পরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) দেখতে পান যে, ইরানীদের পশ্চাতে দরিয়া আছে। কিন্তু আন্দারযগার তার সৈন্যদেরকে দরিয়া হতে কমপক্ষে এক মাইল দূরে এনে রেখেছে। ইরানীদের পূর্ববর্তী সেনাপতিরা পশ্চাতে দরিয়া খুব নিকটে রেখেছিল, যাতে পশ্চাৎ দিক সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু আন্দারযগার এত সতর্কতা অবলম্বন করেনি। তার বিশ্বাস ছিল, মুষ্টিমেয় মুসলমানরা তাদের পশ্চাদভাগে আসার দুঃসাহস করবে না।

"যরথুস্ত্রের ভক্তবৃন্দ!" আন্দারযগার তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলে "আমাদের সাথীরা যাদের হাতে পরাজিত হয়েছে সে সকল মুসলমান এই। তাদেরকে চোখ খুলে দেখ। তাদের হাতে পরাজিত হওয়ার চেয়ে পানিতে ডুবে মরে যাওয়াই কি ভাল নয়? এদেরকে কি সৈন্য বলা যায়? আমার দৃষ্টিতে তারা ডাকাত এবং লুটেরা গ্রুপ বৈ নয়। তাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না।"

এ দিন এভাবেই গত হয়ে যায়। সেনাপতিরা পরস্পরের ফৌজ দেখতে এবং নিজের বাহিনী বিন্যস্ত করার মাঝেই ব্যস্ত থাকে। পরের দিন হযরত খালিদ (রাঃ) স্বীয় বাহিনীকে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। ইরানী সৈন্যরা প্রাচীরবৎ দাঁড়িয়ে ছিল। মুসলমানদের হামলা যথেষ্ট তীব্র এবং উপর্যুপরি ছিল কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুসলমানদের পিছে সরে আসতে হয়। এ সময় শত্রুপক্ষ আক্রমণের শিকার প্রথম সারির সৈন্যদের পিছে সরিয়ে আনে এবং তেজোদ্যম সৈন্য দ্বারা ঐ খালি স্থান পূরণ করে।

হযরত খালিদ (রা.) আরেকটি আক্রমণের জন্য কয়েক প্লাটুন সৈন্যকে সামনে পাঠান । রক্তক্ষয়ী তুমুল সংঘর্ষ হয়। তারপরেও মুসলমানদের পিছু সরে আসতে হয়। অগ্নিপূজকরা একে তো সংখ্যায় বেশী ছিল, তারপরে আবার তারা বর্শাচ্ছাদিতও ছিল। আক্রমণকারী মুসলমানদের মনে হতে থাকে, তারা কোন প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খেয়ে পিছনে সরে এসেছে।

হযরত খালিদ (রা.) কিছু সময় ধরে এ হামলা অব্যাহত রাখেন । কিন্তু মুজাহিদরা ক্লান্তি অনুভব করতে থাকে। অসংখ্য মুজাহিদ আহত হয়ে যুদ্ধের অযোগ্য হয়ে যায়। মুজাহিদরা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে তার জন্য নিজেই সিপাহীদের সাথে সাথে আক্রমণে যেতে থাকেন। এতে সৈন্য প্রেরণ চাঙ্গা থাকলেও দৈহিক দিক দিয়ে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে। ইরানীরা তাদের এ নাজুকতা দেখে হেঁসে ফেটে পড়তে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন এটাই ছিল সর্বপ্রথম যুদ্ধ, যাতে মুসলমানরা তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলে । প্রতিবাদ হাল্কা পর্যায়ের হলেও সৈন্যদের মাঝে হতাশভাব বিরাজ করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.)-এর মত ভুবনখ্যাত রণকুশলী এবং বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতির বিরুদ্ধে সৈন্যদের অসহিষ্ণুতা ও অনীহা চরম বিস্ময়কর ছিল বটে। সৈন্যদের অভিযোগ ছিল যে, আমাদের অশ্বারোহীরা কেন

রণাঙ্গনে নেই। ময়দানে অশ্বারোহীদের না দেখে পদাতিক সৈন্যরা এই ধারণা করতে থাকে যে, হযরত খালিদ (রা.) যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে লড়ে থাকেন এ ময়দানে তিনি তা থেকে রহস্যজনকভাবে বিরত। হযরত খালিদ (রা.) সিপাহীদের মত প্রতিটি হামলায় শরীক হতে থাকেন। কিন্তু তারপরেও তাঁর সৈন্যরা কিসের যেন কমতি অনুভব করতে থাকে। শত্রু সৈন্যদের জনস্রোত দেখে মুসলমানদের প্রেরণা দ্রুত ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। পরাজয় তাদের চোখে ভেসে ওঠে। ভাটা পড়তে থাকে তাদের শক্তিতে। বাহুবল হয়ে আসে শ্লথ।

ইরানীরা এ পর্যন্ত একটি আক্রমণও করে না, আন্দারযগার মুসলমানদের আক্রমণের সুযোগ দিয়ে দিয়ে তাদের ক্লান্ত করতে চায়। অতঃপর ক্লান্ত সৈন্যদের উপর আঘাত হেনে দ্রুত জয় করাই ছিল তার পরিকল্পনা। মুসলমানরা বাস্তবিক অর্থেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর নিকট সৈন্যদের এই নাজুক অবস্থা ধরা পড়ে। তিনি হামলার ধারাবাহিকতা বন্ধ রাখেন। তিনি মনে মনে নতুন কৌশল রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইত্যবসরে ইরান বাহিনী হতে দৈত্যকায় দেহবিশিষ্ট এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। সে এসেই মুসলমানদের থেকে প্রতিপক্ষ আহ্বান করে।

ইরানীদের মাঝে এ লোকটি 'হাজার ব্যক্তি' নামে খ্যাত ছিল। তরবারী চালানাতেও সে বিশেষ দক্ষতা রাখত। ইরানে 'হাজার ব্যক্তি' নামে ঐ বীর বাহাদুরের উপাধি ছিল, যাকে কেউ পরাজিত করতে পারত না। 'হাজার ব্যক্তি' বলে এটা বুঝানো হত যে, এই এক ব্যক্তিই হাজার ব্যক্তির বরাবর।"

মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে আন্দারযগার এই দৈত্য পাঠিয়ে তাদের সাথে কৌতুক করতে চায়। মুসলমানদের মধ্যে তার মোকাবিলা করার মত কেউ ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামেন এবং **নাঙ্গা তলোয়ার** উচিয়ে "হাজার ব্যক্তি'-র সামনে গিয়ে দাড়ান। কিছুক্ষণ উভয়ের তরবারির সংঘর্ষ চলে এবং কৌশল পরিবর্তন করে করে তারা লড়তে থাকে। 'হাজার ব্যক্তি' উপাধিধারী এ লোকটি মাতাল মোষের মত ছিল। তার দেহে এত শক্তি ছিল যে, তার এক আঘাতেই যে কোন মানুষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত । হযরত খালিদ (রাঃ) এ দৈত্যের সাথে লড়তে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যে, তিনি আঘাত করতেন কম; প্রতিহত করতেন বেশী। বেশী বেশী তাকে আঘাত করার সুযোগ দিতেন, যাতে সে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। সাথে সাথে তিনি তার সামনে নিজের এ অবস্থা প্রকাশ করেন যে, তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ইরানী দৈত্য হযরত খালিদ (রা.)-কে দুর্বল এবং ক্লান্ত দেখে তার সাথে মনের আনন্দে খেলতে থাকে। তরবারি ঘুরিয়ে উপর থেকে নীচে কখনো আক্রমণ করে, মাঝপথে আক্রমণ ফিরিয়ে নিতে থাকে। ব্যঙ্গোক্তি এবং উপহাসমূলক উক্তিও ছুঁড়তে থাকে। নিজের শক্তির উপর সীমাহীন আস্থা থাকায় সে কিছুটা

অসতর্ক হয়ে যায়। একবার সে তরবারি এমন ভঙ্গিতে ঘুরায় যেন হযরত খালিদ (রা.)-এর গর্দান উড়িয়ে দিবে। হযরত খালিদ (রা.) এই আক্রমণ তরবারি দ্বারা প্রতিহত করার পরিবর্তে দ্রুত পিছে সরে যান। দৈত্যের হামলা শূন্যে মিলিয়ে গেলে সে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। দৈত্যের মত শরীর নিয়ে ঘুরে যায়। তার এক পার্শ্ব হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে এসে যায়। হযরত খালিদ (রা.) নয়া চাল চেলে এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন। ইরানী দৈত্যের পার্শ্বদেশে তিনি বর্শার মত করে তরবারি সবেগে ঢুকিয়ে দেন। এ আঘাতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে থাকলে হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত তরবারি টেনে বের করে এমনি আরেকটি আঘাত করেন এবং তরবারি তার পার্শ্বদেশ ভেদ করে শরীরের অনেক ভেতরে চলে যায়।

আল্লামা তবারী ও আবু ইউসুফ লেখেন যে, পরপর দু' আঘাতে ইরানী দৈত্য মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং মারা যায়। হযরত খালিদ (রাঃ) তার বুকের উপর উঠে বসেন এবং তার সৈন্যদের খানা আনার নির্দেশ দেন। খানা আনা হলে তিনি 'হাজার ব্যক্তি'-এর লাশের উপর বসে সেই খানা খান। এই মল্লযুদ্ধ মুজাহিদদের প্রেরণা আরেকবার উজ্জীবিত করে।

ইরানী সালার মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিল। যখনই সে অনুধাবন করে যে, মুসলমানরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই সে তার বাহিনীকে ক্ষুব্ধ শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়। জয়লাভের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল। ইরান সৈন্যরা মুসলিম বাহিনীর লক্ষ্যে সমুদ্রের উর্মিমালার মত গর্জন করতে করতে আসে। পিষে যাবার সময় এসে গিয়েছিল মুসলমানদের। তারা জীবন বাঁচাতে মরণপণ যুদ্ধ করে। এক একজন মুসলমানের প্রতিপক্ষ ছিল ১০/১২ জন ইরানী। স্বীয় নৈপুণ্য ও চমক দেখিয়ে মুসলমানরা লড়ছিল। চরম সংকটে পড়েও তারা হাল ছাড়ে না। নিজেদের বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না।

মুজাহিদদের অন্তরে এ সময় আরেকবার এ প্রশ্ন উদয় হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) এখনো কেন তার কৌশলী আক্রমণে যাচ্ছেন না? কেন তিনি অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহার করছেন না? হযরত খালিদ (রা.) নিজেও সিপাহীর মত লড়ছিলেন। তাঁর কাপড়ে রক্তের দাগ ছিল, যা তাঁর আহত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে ইরানীদের সৈন্য সংখ্যা বেশী হওয়ায় অধিক প্রাণহানী তাদের ঘটে।

আন্দারযগার আক্রমণে নিয়োজিত সৈন্যদের পিছে সরিয়ে নিয়ে পিছনের তাজাদম বাহিনী আক্রমণভাগে আনে। শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ে আক্রমণ। এ হামলায় অধিক সৈন্য অংশ নেয়। বিশাল ইরানীদের মাঝে মুসলমানদের চোখে পড়ছিল না। আন্দারযগারের এই অঙ্গীকার পূরণ হতে থাকে যে, একজন

মুসলমানকেও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দিব না। সে দ্রুত বিজয়ের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বাহিনীকেও আক্রমণে নেমে পড়ার নির্দেশ দেয়। ধেয়ে আসা প্লাবন মাড়িয়ে পলায়ন করার পথও মুসলমানদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। তারা এখন আহত সিংহের ন্যায় লড়তে থাকে।

মুজাহিদ বাহিনী যখন ইরানীদের চতুর্মুখী ঘেরাওয়ে ক্রমেই সংকটের গভীর আবর্তে নিক্ষেপ হতে থাকে তখন তাদের সেনাপতি হযরত খালিদ (রাঃ) সেখানে ছিলেন না। ইরানী বাহিনী যখন সমস্ত শক্তি নিয়ে ময়দানে নেমে আসে তখন তিনি সকলের অগোচরে রণাঙ্গন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের ঝাণ্ডা বাহী তাঁর সাথেই ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) ঝাণ্ডা নিজে হাতে গ্রহণ করে প্রথমত উপরে অতঃপর একবার ডানে আরেকবার বামে ঘুরান, এরপর ঝাণ্ডা যার কাছ থেকে নিয়েছিলেন তাকে দিয়ে দেন। ঝাণ্ডাকে এভাবে ডানে বামে হেলানো একটি ইঙ্গিত ছিল। একটু পরেই ধূলিঝড় উড়িয়ে রণাঙ্গনের পার্শ্বস্থ দু' টিলার আড়াল হতে দু'হাজার অশ্বারোহী বেরিয়ে আসে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরা বর্শা ছিল। সবাই ছিল আক্রমণের পজিশনে। দু'হাজার অশ্ব সুশৃঙ্খল গতিতে ছুটে এসে ইরানীদের পশ্চাৎভাগে চলে যায়। ইরানীরা যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়ায় পশ্চাতে এসে যাওয়া বাহিনী সম্পর্কে জানতে পারে না। অশ্বারোহী বাহিনী পশ্চাৎভাগ হতে যখন তাদের উপর বিজলির গতিতে ঝাপিয়ে পড়ে তখন তারা আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে সর্বপ্রথম টের পায়। এটা ছিল ঐ অশ্বারোহী বাহিনী যা যুদ্ধের প্রাক্কালে আন্দারযগার হন্যে হয়ে খুঁজছিল এবং যাদের ব্যাপারে পদাতিক মুজাহিদ বাহিনীর অন্তরে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অশ্বারোহী বাহিনী প্রথমে ব্যবহার না করে তাদের লুকিয়ে রাখা হযরত খালিদ (রা.)-এর একটি চাল ছিল। নিজের বাহিনীর স্বল্পতা বনাম শত্রুর প্লাবন দেখে তিনি এই চাল চেলেছিলেন। তিনি রাতের আধারে অশ্বারোহী বাহিনীকে এত গোপনে টিলার পশ্চাতে পাঠিয়ে দেন যে, পদাতিক বাহিনী পর্যন্ত তা জানতে পারে না। রণাঙ্গনে আসার জন্য পতাকার ডানে বামে হেলা নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অশ্বগুলো শত্রু হতে প্রায় দেড় মাইল দূরে লুকিয়ে রাখা হয়। এত দূর থেকে ঘোড়ার ডাকের আওয়াজ শত্রুর কানে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ছিল না। এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাতে ঘোড়ার মুখ বেঁধে দেয়া হয়েছিল। অশ্বারোহী দলের কমান্ডার ছিলেন হযরত বুসর বিন আবী রহম এবং হযরত সাঈদ বিন মুররাহ। সকালে লড়াই শুরু হলে কমাণ্ডারদ্বয় অশ্বারোহীদের পা রেকাবে রাখার নির্দেশ দেন এবং নিজেরা একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে সুনির্দিষ্ট সংকেতের অপেক্ষায় থাকেন। ইরানী বাহিনীর উপর পশ্চাৎ হতে আকাশ ভেঙ্গে পড়লে হযরত খালিদ (রা.) পরবর্তী চাল চালেন। হযরত খালিদ (রা.) পূর্ব হতেই এ পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডারদ্বয় এ চাল বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন। হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.) লড়ছিলেনও এবং

নিজেদেরকে সতর্কও রাখছিলেন। কারণ তাদের জানা ছিল, নির্দিষ্ট সংকেত পেলে কি করতে হবে পশ্চাৎ হতে অশ্বারোহীরা হামলা করলে পার্শ্বদ্বয়ের কমান্ডাররা নিজ নিজ বাহিনী উভয় পাশে ছড়িয়ে দিয়ে ইরানীদের প্রথম থেকেই যুদ্ধে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন।

মুহূর্তে যুদ্ধের গতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। রণাঙ্গনের চিত্র পাল্টে যায়। ইরানীদের বিজয় উল্লাস করুণ আর্তনাদ আর ক্রন্দনে পরিবর্তিত হয়। মুসলিম অশ্বারোহীদের বর্শা তাদের এ ফোঁড় ও ফোঁড় করতে এবং মাটিতে আছড়ে ফেলতে থাকে। অনভিজ্ঞ হাজার হাজার ইহুদীরাই সর্বপ্রথম হুলস্থুল ছড়িয়ে দেয়। পূর্ববর্তী যুদ্ধের পরাজিত সৈন্যরা এই হুলস্থুলকে আরো ব্যাপক করে তোলে। কারণ, তাদের জানা ছিল যে, মুসলমানরা তাদের জীবিত রাখবে না।

রণাঙ্গনে মুসলমানদের নারাধ্বনির গর্জন ওঠে। যুদ্ধের গতি এমনভাবে পাল্টে যায় যে, যরথুস্ত্রের আগুন সহসা নিভে যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক ওলযার যুদ্ধকে 'ওলযার নরক' বলে অভিহিত করেছেন। আগুন পূজারীদের জন্য এই যুদ্ধ জাহান্নাম থেকে কোন অংশে কম ছিল না। বিশাল বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত ভেড়া বকরীতে পরিণত হয়। তারা পালাতে থাকে আর মুসলমানদের হাতে নিহত হতে থাকে। মুসলমানদের ঘোড়াও সেদিন আজরাইলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইরানীদের পদতলে পিষে মারতে থাকে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ইরানী সৈন্যরা পলায়নের পথ ধরলে আন্দারযগারও পালিয়ে যায়। কিন্তু মাদায়েনের পরিবর্তে সে মরুভূমির দিকে এগিয়ে চলে। কারণ, তার জানা ছিল যে, মাদায়েন ফিরে গেলে উরদূশের তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিবে। তাই সে মরুভূমির পথে চলতে থাকে এবং ক্রমেই বিস্তীর্ণ মরুবক্ষে হারিয়ে যায়। অতঃপর মরুফাঁদে আটকা পড়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে।

অপর ইরানী বাহিনী সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে তখনো ওলযায় পৌঁছে ছিল না। এমনি আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অপেক্ষায় মুসলমানদের থাকতে হয়। উভয়টিই ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

* * *

ইরানীদের প্রখ্যাত সেনাপতি বাহমানকে স্বসৈন্যে ওলযায় পৌঁছানো এবং উরদূশেরের নির্দেশ অনুযায়ী তার ফৌজকে সর্বাধিনায়ক আন্দারযগারের ফৌজের সাথে যোগ করে সম্মিলিতভাবে হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর উপর হামলা করার কথা ছিল। কিন্তু বাহমান তখনো ওলযা হতে কয়েক মাইল দূরে ছিল এবং তার এই বিশ্বাস ছিল যে, সে আর আন্দারযগার মিলে মুসলমানদের একেবারে পিষে ফেলবে। তবে আর এত ব্যস্ততা কিসের—এমন একটা ভাব ছিল তার। তার বাহিনী যখন শেষ ছাউনী গুটিয়ে ওলযা অভিমুখে চলতে শুরু করে তখন চার-

পাঁচজন বাইরের সৈন্য তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়। দু'জন ছিল আহত। আর যারা অক্ষত ছিল তাদের শ্বাস জোরে উঠা-নামা করছিল। তারা এতই ক্লান্ত ছিল যে, পা টেনে টেনে চলছিল। চেহারায় বিনিদ্র রজনী এবং ভীতির ছাঁপ ছিল। এই ছাঁপের মাঝে ধুলোবালির ছিটাও লেপ্টে ছিল।

"তোমরা কারা?" তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় "কোত্থেকে আসছ?"

"সেনাপতি আন্দারযগারের ফৌজের সৈন্য আমরা" তাদের একজন ক্লান্ত জড়িত এবং ভীতিমিশ্রিত কম্পিত কণ্ঠে বলে।

"সবাই মারা পড়েছে" আরেকজন বলে।

"তারা মানুষ নয়?" আরেকটি কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ "তোমরা বিশ্বাস করবে না।... আমাদের কথা উড়িয়ে দিবে জানি।"

"এরা মিথ্যাচার করছে" এক কমান্ডার খেঁকিয়ে ওঠে "এরা পলায়নপর, সবাইকে ভীত করে নিজেদের সাধু বানাতে চাচ্ছে। তাদেরকে সেনাপতির কাছে নিয়ে চল। আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিব। এরা কাপুরুষ।"

তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে সেনাপতি বাহমানের সামনে উপস্থিত করা হয়। এরই মধ্যে তাদের সম্পর্কে বাহমানকে সংক্ষেপে অবগত করানো হয়।

"তোমরা কোন্ যুদ্ধ লড়ে আসলে?" বাহমান জিজ্ঞাসা করে বলে "লড়াই তো এখনো শুরুই হয়নি। আমার বাহিনী এখনও... ।"

"সম্মানিত সেনাপতি!" একজন বলে "যে যুদ্ধে আপনার অংশগ্রহণের কথা ছিল তা সমাপ্ত। সেনাপতি আন্দারযগার নিখোঁজ। আমাদের কুশলী বীর এবং বাহাদুর 'হাজার ব্যক্তি' মুসলমানদের সেনাপতির হাতে নিহত হয়েছে।...আমরা যুদ্ধ জয়ের দ্বারপ্রান্তে ছিলাম। মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিলই না। আমাদের প্রতি নির্দেশ আসে, আরবের এই বুদ্দুদের অধিক হারে হত্যা কর। তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য স্লোগান এবং উল্লাস প্রকাশ করতে করতে আমরা সামনে অগ্রসর হতে থাকি। যখন আমরা হামলা করতে করতে তাদের মাঝে ঢুকে পড়ি তখন পশ্চাৎ হতে না জানি কত হাজার অশ্বারোহী আমাদের ঘাড়ে আছড়ে পড়ে। এরপর আমরা বিদিশা হয়ে যাই। আমাদের কারো কোন হুশ থাকে না।"

"শ্রদ্ধাস্পদ সেনাপতি!" আহত এক সিপাহী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে "সর্বাগ্রে আমাদের ঝাণ্ডার পতন হয়। কমান্ড দেয়ার কেউ ছিলনা। নিজ নিজ জীবন বাঁচানোর প্রচেষ্টায় সবাই ড়্যাস্ত ছিল। হুলস্থুল আর হুটোপুটি চলছিল গণহারে। চারদিকে কেবল আমাদের সৈন্যের লাশ পড়েছিল।"

"আমি কিভাবে এ কথা বিশ্বাস করব যে, বিশাল এক বাহিনীকে মুষ্টিমেয় কিছু লোক পরাজিত করেছে?" বাহমান সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে।

এ সময়ে তাকে জানানো হয় যে, আরো কয়েকজন সিপাহী এসেছে। তাদেরও বাহমানের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। ১৩/১৪ জনের একটি দল

ছিল। তাদের অবস্থা এত বিপর্যস্ত ছিল যে, ৩/৪ জন সিপাহী উপুর হয়ে পড়ার মত ধপ করে বসে পড়ে।

"তোমাকে সবচেয়ে প্রবীন সিপাহী মনে হচ্ছে।" বলিষ্ঠ দেহের আধাবয়সী এক সিপাহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাহমান বলে "যা শুনলাম তা কতদূর সত্য তুমি আমায় বলতে পার? ... তোমরা নিশ্চয় জানো, কাপুরুষতা, পশ্চাদাপসারণ এবং মিথ্যা বলার শাস্তি কেমন কঠোর হয়ে থাকে।"

আপনি যা শুনছেন তা যদি এই হয়ে থাকে যে, সেনাপতি আন্দারযগারের সৈন্যরা মদীনার বাহিনীর হাতে নিহত ও পরাজিত হয়েছে, তবে কথাটি এমন সত্য যেমন সত্য আপনি সেনাপতি আর অমি সাধারণ সিপাহী।" প্রবীণ সিপাহী বলে "আকাশেতে ঐ যে সূর্য আর আমাদের এই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকাটা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাটাও সঠিক।... মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটা আমার তৃতীয় লড়াই। তিন যুদ্ধেই মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল।... খুব কম।...

যরথুস্ত্রের কসম দিয়ে বলছি! আমার কথার এক বর্ণও যদি মিথ্যা হয় তবে যে আগুনের আমি পূজা করি তা যেন আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। নিশ্চয় তাদের মাঝে এমন শক্তি যা চোখে দেখা যায় না। তাদের এই অদৃশ্য শক্তি আমাদের উপর ঐ সময় চড়াও হয় যখন পরাজয় তাদের দিকে ধেয়ে আসতে থাকে।"

"আমাকে যুদ্ধ বৃত্তান্ত খুলে বল" সেনাপতি বাহমান বলে "বুঝাও, কিভাবে তোমাদের পরাজয় ঘটল।"

আন্দারযগারের বাহিনী ওলযায় পৌছার পরপরই কিভাবে মুসলিম ফৌজের হঠাৎ আগমন হয়, তাদরেকে বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে কিভাবে দ্রুত আক্রমণ করে এবং লড়াই শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ সময় মুসলমানরা কোন্ পন্থায় যুদ্ধ করে–বিস্তারিতভাবে সবই সেনাপতি বাহমানকে অবগত করে।

"তাদের যে মূলশক্তির কথা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি" সিপাহী বলে চলে– "এ যুদ্ধে তা অশ্বারোহী বাহিনী রূপে আসে। এ বাহিনীতে হাজার হাজার ঘোড়া ছিল। আক্রমণের পূর্বে তাদের ঘোড়া ময়দানের কোথাও দেখা যায়নি। আর একসাথে এত হাজার ঘোড়া কোথাও লুকিয়ে রাখাও যায় না। আমাদের পশ্চাৎভাগে দরিয়া ছিল। ঘোড়াগুলো এই দরিয়ার দিক থেকেই আসে। আমরা তাদের সম্পর্কে তখন অবগত হই। যখন তারা পাইকারীভাবে হত্যা এবং ঘোড়া নির্দয়ভাবে পিষতে থাকে। ...আলমপনা! এটাই ঐ অদৃশ্য শক্তি যা নিয়ে আলোচনা চলছে এবং যার কাছে আমরা বরাবর ব্যর্থ হচ্ছি।

* * *

"তোমাদের মধ্যে ঈমানী শক্তি আছে" হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে সম্বোধন করে বলছিলেন "এটা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'য়ালার ঘোষণা যে, মাত্র ২০ জন হলেও তোমরা ২০০ কাফেরের উপর বিজয়ী হবে।"

ইরানী সৈন্য এবং তাদের সহগামী ইহুদিরা পালিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। রণাঙ্গন জুড়ে শুধু লাশ আর লাশ। একদিকে গণীমতের মাল স্তূপকৃত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার পিঠে বসে ঐ স্তূপের নিকটে সৈন্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলতে থাকেন "কুরআনী ঘোষণার বাস্তবায়ন তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ। ইরানীদের সৈন্যস্রোত দেখে তোমরা ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলে নয় কি? ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ইতিহাস বলবে যে, এটা হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর অনুপম সমর কুশলতা ছিল যে, তিনি অশ্বারোহী বাহিনী লুকিয়ে রেখে তাদেরকে ঐ সময় ব্যবহার করেন যখন শত্রুবাহিনী মুসলমানদের হত্যা এবং পিষে ফেলতে প্লাবনের রূপে এসেছিল।... কিন্তু আমি বলব, এটা আমার কোন কৃতিত্ব নয়, বরং ঈমানী শক্তি এবং নৈপূণ্যের ফসল ছিল। যারা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর উপর বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্ তাদের সাথে থাকেন।...

"প্রিয় বন্ধুগণ! এখন পিছু হটার কোন সুযোগ নেই। শুধুই এগিয়ে যেতে হবে। এই ভূখণ্ড ইরানীদের নয়। সকল ভূখণ্ডের মালিক আল্লাহ্‌তা'য়ালা। জমিনের শেষভাগ পর্যন্ত আল্লাহর বাণী আমাদের পৌঁছাতেই হবে।"

সমবেত সৈন্যরা নারায়-নারায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করতে থাকে। তারা এভাবে হযরত খালিদ (রা.)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে।

এরপর হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের মাঝে গণীমতের মাল বন্টন করে দেন। এবারকার গণীমতের মাল পূর্বের দু'যুদ্ধের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নিয়মানুযায়ী এক পঞ্চমাংশ মাল বাইতুল মালে জমা দিতে মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

॥ তের ॥

প্রবীন সিপাহীর বর্ণনায় বাহমান ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আন্দারাযগারের সৈন্যরা সত্যই মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে এবং আন্দারযগার এমনভাবে পালিয়েছে যে, এখন তার কোন পাত্তা নেই। বাহমান যাবান নামী তার এক সালারকে ডেকে পাঠায়।

"আন্দারযগারের পরিণতি নিশ্চয় তুমি শুনেছ" বাহমান বলে "আমাদের প্রতি কিসরার নির্দেশ ছিল, ওলযায় গিয়ে আন্দারযগারের সৈন্যের সাথে মিলিত হওয়া। এ পরিকল্পনা এখন শুধুই অতীত। আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তুমি কিছু ভেবেছ?"

"যা কিছুই করি না কেন" যাবান বলে "আমাদের ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না।" "কিন্তু যাবান!" বাহমান বলে "বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিকল্পিত কোন

পদক্ষেপ নেয়াও ঠিক হবে না। তৃতীয়বারের মত মুসলমানরা আমাদের পরাজিত করে ফেলেছে। তুমি এখনো অনুধাবন করনি যে, সে সময় অতীত হয়ে গেছে, যখন আমরা মদীনার বাহিনীকে মরুডাকাত কিংবা বুদ্দু বলে উড়িয়ে দিতাম? এখন আমাদের ভেবে চিন্তেই কদম ফেলতে হবে। প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দেয়ার সময় এসে গেছে।"

"আমাদের পূর্ববর্তী তিন পরাজয়ের কারণ এই একটাই যে, আমাদের সেনাপতিরা প্রতিপক্ষকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। এবং মরু লুটেরাদের এক বিক্ষিপ্ত কাফেলা মনে করে তাদের সামনে গিয়েছে" যাবান বলে " প্রত্যেক সেনাপতিই তাদের অমূল্যায়ন এবং তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। প্রথম পরাজয়ের পরেই আমাদের চোখ খুলে যাওয়া দরকার ছিল। শত্রুকে গুরুত্ব দিতে হত। কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয়নি।... আপনি নিশ্চয়ই কিছু ভেবেছেন পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে।"

"এ চিন্তা আমাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে" বাহমান বলে "কিসরা উরদূশের অসুস্থ। আমি জানি, প্রথম দুই পরাজয়ের আঘাত তাকে শয্যাশায়িত করে দিয়েছে। এ মুহূর্তে আরেক পরাজয়ের খবর তাকে চিরদিনের জন্য স্তিমিত করে দেবে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, পরাজয়ের সংবাদ বাহককেও সে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিবে।"

"কিন্তু বাহমান!" যাবান বলে "আমাদের লড়াই আর প্রাণ বিসর্জন ব্যক্তি উরদূশের জন্য নয়; যরথুস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা এবং সম্মানের জন্যই আমাদের এই রথযাত্রা এবং আত্মবিসর্জন।"

"তোমার সাথে একটি বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই যাবান!" বাহমান বলে "এখন স্পষ্ট যে, আমাদের প্রতি কিসরার যে নির্দেশ ছিল তা এখন অর্থহীন। আমি মাদায়েন যেতে চাই। সেখানে গিয়ে নয়া হুকুম কি তা জেনে আসব। এছাড়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে চাই। তারও এখন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, যাও এবং মুসলমানদের তুলোধুনা করে আস। তাকে এ পর্যন্ত কেউ বলেনি যে, সমরশক্তির অধিকারী কেবল আমরাই নই। প্রতিপক্ষও মজবুত। তাদের শক্তিও অগ্রাহ্য করার নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, যুদ্ধ দক্ষতা এবং ভরপুর প্রেরণা মুসলমানদের মাঝে যতটুকু আছে তা আমাদের মধ্যে নেই।... যাবান! শক্তির বলে কাউকে পরাজিত করা যায় না।"

"আমি আপনাকে প্রস্তাব করছি" যাবান বলে "সৈন্যদের যাত্রা স্থগিত ঘোষণা করুন এবং এখন আপনি মাদায়েন চলে যান।"

"সৈন্যদের যাত্রা স্থগিত করে দাও" বাহমান নিদের্শের সুরে বলে "তাদের এখানেই তাঁবু স্থাপন করতে বল। আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তুমি এ বাহিনীর প্রধান সালার থাকবে।"

"আপনার অনুপস্থিতিতে মুসলমানরা এদিকে এলে কিংবা পরস্পরের সম্মুখীন হলে তখন আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি?" যাবান জিজ্ঞাসা করে "তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হব নাকি আপনার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব?"

"তুমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবে, যেন আমার প্রত্যাবর্তনের আগে কোন সংঘর্ষ না হয়" বাহমান বলে।

ইরানী বাহিনীর অগ্রযাত্রা স্থগিত ঘোষণা করে সেখানেই তাদের ছাউনী ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়। সৈন্যরা হাফ ছেড়ে বাঁচে। অন্তত কয়েক দিনের জন্য তারা বিশ্রামের সুযোগ পায়। এদিকে বাহমান কয়েকজন অশ্বারোহী বডিগার্ড পরিবেষ্টিত হয়ে মাদায়েনের উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

বকর বিন ওয়ায়েলের বসতিতে এক সাথে দুই রকম পরিবেশ বিরাজ করছিল। একদিক ক্রন্দন আর বিলাপের মাতম ছিল আর অপরদিকে আবেগ-উত্তেজনা এবং প্রতিশোধের জযবার উল্লাস ছিল। ইহুদী গোত্রের যে হাজার হাজার লোক হুংকার এবং উল্লাস করতে ইরানী বাহিনীর সাথে মুসলমানদেরকে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা ছাড়া করতে গিয়েছিল তারা রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। তাদের কয়েক সাথী নিহত হয়েছিল। কিন্তু আহতও ছিল। তারাও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল জীবনটুকু নিয়ে ঘরে ফিরতে। কিন্তু পথিমধ্যেই তারা মারা যায়।

ইহুদীরা মাথা নীচু করে ফিরে আসতে থাকলে বাড়ী-ঘর থেকে নারী, শিশু আর বৃদ্ধরা ছুটে আসে। পরাজিত দলের মাঝে নারীরা তাদের ছেলে, ভাই এবং স্বামীদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। ছেলে পিতাকে আর পিতা ছেলেকে খুঁজে ফিরে। সৈন্যদের পরাজিত হয়ে ফিরে আসাটাই ছিল তাদের জন্য এক চপেটাঘাত। দ্বিতীয় আঘাত পড়ে তাদের অন্তরে যাদের প্রিয়জন রণাঙ্গন হতে ফেরেনা। বসতিতে এমন মহিলাদের বিলাপ আর মাতম চলছিল। তারা উঁচু আওয়াজে কাঁদছিল।

"তবে তোমরা জীবিত ফিরলে কেন?" এক মহিলা পশ্চাদাপসারণকারীদরে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বলছিল, "তোমাদের ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তোমরা কেন থেকে গেলে না?"

এই আওয়াজ কয়েকটি কণ্ঠের আওয়াজে পরিণত হয়। অতঃপর মহিলাদের এই তীর্যক ভর্ৎসনা ওঠে "তোমরা বনূ বকরের নাম ডুবিয়েছ। তোমরা ঐ সমস্ত মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছে যারা একদিন এ গোত্রেরই লোক ছিল।... যাও এবং প্রতিশোধ নাও।... মুসান্না বিন হারেসার মুণ্ডু কেটে নিয়ে আন। সে একটি গোত্রকে কেটে দু'খণ্ড করেছে।"

মুসান্না বিন হারেছা ইহুদী গোত্রেরই একজন সর্দার ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার প্রভাবে এই গোত্রের অনেক লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকে হযরত খালিদ (রা.)-এর ফৌজে শামিল হয়ে গিয়েছিল। এভাবে একই গোত্রের লোক পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখী হয়।

আল্লামা তবারী এবং ইবনে কুতাইবা লেখেন, পরাজিত ঈহুদীরা স্ত্রীদের ভর্ৎসনা এবং উত্তেজনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে আবার প্রস্তুত হয়ে যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লেখেন, ইহুদীদের এ কারণেও রক্ত গরম ও চঞ্চল হয়ে ওঠে যে, সমাজে যাদের কোন মূল্য ও গুরুত্ব ছিল না তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণোত্তর ইসলামী ফৌজে শামিল হয়ে তারা এমন শক্তিধর হয়ে ওঠে যে, পারস্যের মত শক্তিশালী সাম্রাজ্যকে কেবল হুঙ্কার নয়, ইতোমধ্যে তিন তিনবার শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

"পূর্বধর্মে এখন তাদের ফিরিয়ে আনা বড়ই কঠিন" বকর বিন ওয়ায়েলের এক নেতা–আব্দুল আসওয়াদ আযালী বলে "এখন এর একটাই প্রতিষেধক; আর তা হলো নির্বিচারে তাদের হত্যা করা।"

আব্দুল আসওয়াদ আযলান গোত্রের নেতা ছিল। এটাও বনূ বকরের একটি শাখা। এই হিসেবে আব্দুল আসওয়াদকে আযালীও বলা হত। সে নামকরা ইহুদী বীর ছিল।

"মুসলমানদের হত্যা করা এতই সহজ মনে করেছ?" এক বৃদ্ধ ইহুদী বলে "রণাঙ্গনে তোমরা তাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ।"

"আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি" ইহুদীদের আরেক নেতা বলে "আমাদের এলাকায় অবস্থানরত মুসলমানদের হত্যা করা হোক। এর পূর্বে তাদের একটি শেষ সুযোগ দিতে হবে ইহুদী ধর্মে ফিরে আসার। এতে রাজি না হলে গোপনে তাদের হত্যা করা হবে।"

"না" আব্দুল আসওয়াদ বলে "আমাদের গোত্রের মুসলমানরা গেরিলা হামলার মাধ্যমে ইরানী বাহিনীর মাঝে যে বিপর্যয় ও ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তার কথা কি তোমরা ভুলে গেছ? তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সাথে ইরানীদের উর্ধ্বতম সামরিক অফিসারদের হত্যা করে। এখানকার একজন মুসলমানকেও যদি তোমরা গোপনে হত্যা কর, তাহলে মুসান্নার গেরিলা গ্রুপ প্রতিশোধ হিসেবে তোমাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করবে এবং ঘরে-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিবে। তোমাদের সতর্ক ও প্রতিরোধের পূর্বেই তারা নিমিষে সফল অপারেশন চালিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে।"

"তাহলে প্রতিশোধ আমরা কিভাবে নিতে পারি?" একজন উদ্বেগের সাথে জানতে চায় "ওলযা রণাঙ্গনে তোমার দু'পুত্র নিহত হওয়ায় তাদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নেয়া তোমার জন্য অনিবার্য।"

"ইরান সম্রাট আর মুসলমানরা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় লড়াইরত" আব্দুল আসওয়াদ বলে "আমাদেরও নিজস্ব ও জাতিগত স্বার্থে যুদ্ধ করেত হবে। তবে ইরানী ফৌজের সরাসরি সাহায্য ব্যতীত আমাদের পক্ষে তাদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তোমরা ভাল মনে করলে আমি মাদায়েন গিয়ে সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ

করতে চাই। আমার বিশ্বাস আমাদের অনুরোধ তিনি ফেলবেন না। সেনাবহর দিয়ে সাহায্য করবেন। তিনি সাহায্য না করলে আমরা নিজেরাই ফৌজ তৈরি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তুমি ঠিকই বলেছ, মুসলমানদের থেকে দু'পুত্র হত্যার প্রতিশোধ অবশ্যই আমাকে নিতে হবে। তাদের পরাজিত করে পুত্র হত্যার বদলা আমি নিবই।"

উক্ত বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সক্ষম যত ইহুদী রয়েছে তাদেরকে ফোরাত নদীর উপকূলে উলাইয়িস নামক স্থানে সমবেত করা হোক। সর্বাধিনায়ক হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে সর্ববাদী নেতা আব্দুল আসওয়াদ আযালীর নাম পাস হয়। বকর বিন ওয়ায়েল এবং তার শাখা গোত্রসমূহের প্রেরণা ভীষণ চাঙ্গা ও উজ্জীবিত ছিল। ক্ষতও ছিল তাজা। নিহতদের পরিবারে মাতম চলছিল। এমতাবস্থায় ফের যুদ্ধের আহ্বানে নওজোয়ন এবং বয়স্ক লোকেরাও যুদ্ধের নেশায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সারা বসতিতে যুদ্ধের হাওয়া বইতে থাকে। প্রতিশোধের প্রশ্নে তারা এত উন্মাদ ও আবেগী হয়ে ওঠে যে, যুবতী নারীরাও পুরুষের বেশে সৈন্যের সারিতে চলে আসে।

* * *

ইরাকী ইহুদীদের মনোভাব, যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং উলাইয়িস নামক স্থানে ফৌজের আকারে তাদের জমা হওয়ার সংবাদ হযরত খালিদ (রা.)-এর অজানা ছিলনা। হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যরা অনেক দূরে অবস্থান করলেও শত্রুদের প্রতিটি আচার-আচরণ উঠা-বসা যথাসময়ে রেকর্ড হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হযরত খালিদ (রা.) সাথে সাথে পেতে থাকেন। তার গোয়েন্দা টিমও চতুর্দিকে ছড়ানো ছিল। ইহুদীদের পাশে আরব মুসলমানরাও অবস্থান করত। মদীনার মুসলমানদের সাথে ছিল তাদের গভীর সম্পর্ক। আন্তরিক টান। উপর্যুপরি মুসলমানদের বিজয় দেখে অগ্নিপূজকদের হাত থেকে নাজাত এবং নির্যাতন থেকে মুক্তির সূর্য চোখের তারায় ঝলমল করতে থাকে। তারা অকৃত্রিমভাবে মুসলমানদের বন্ধু ছিল। তাদের হৃদয়-মন মুসলমানদের সাথেই মিলিত ছিল। ফলে তারা কারো কোন নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুসলমানদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরবৃত্তি করতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যদের মানসিক অবস্থা ও মনোবল ছিল অত্যন্ত চাঙ্গা এবং দুরন্ত। এক বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে উপুর্যপরি তিনবার বিরাট জয়লাভ এবং প্রচুর মালে গণীমত অর্জনের দরুণ মুজাহিদ বাহিনীর দৃঢ়তা ও মনোবল ছিল তুঙ্গে। প্রতিটি সৈন্য সাহসে বলীয়ান ছিল। তবে হযরত খালিদ (রা.) ঠিকই জানতেন যে, তাঁর সৈন্যরা দৈহিক দিক দিয়ে দারুণ বিধ্বস্ত। উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না পাওয়ায় দুর্বলতা তাদের গ্রাস করে ফেলছে। ইরান সাম্রাজ্যে পা দেয়ার পর থেকে এখনও তারা বিশ্রামের সুযোগ পায়নি। সতত মার্চ এবং

শত্রুর উদ্দেশে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই কেটেছে তাদের এতদিনের ব্যস্ততম দিনগুলো। এছাড়া তিনটি বিশাল রণাঙ্গনে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করা তো ছিলই।

"তাদেরকে পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দাও" হযরত খালিদ (রা.) এক বৈঠকে কমান্ডারদের উদ্দেশে বলছিলেন "তাদের অস্থি-মজ্জাও চূর্ণ-বিচূর্ণ। যতদিন সম্ভব আমি তাদেরকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে চাই।... শত্রুর উপর নজরদারি করতে যাদেরকে আমরা দজলার উপকূলে রেখে এসেছিলাম তাদেরও এখানে ডেকে পাঠাও।...কই, মুসান্না বিন হারেছাকে তো দেখছি না! সে কোথায় গেল?"

"তাকে গতকাল রাত থেকে দেখছি না" এক সালার জবাবে বলে। এ সময় দূর থেকে একটি ঘোড়ার ঘন্টির আওয়াজ শোনা যায়। আওয়াজ ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছিল। একটু পরেই আরোহীসহ ঘোড়া হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুর নিকটে এসে থামে।

"মুসান্না বিন হারেছা এসেছেন" বাইরে থেকে এক ব্যক্তি হযরত খালিদ (রা.)-কে অবগত করায়।

হযরত মুসান্না (রা.)-ঘোড়া থামিয়ে একপ্রকার লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে প্রবেশ করেন।

"আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না (রা.) অত্যন্ত আবেগঝরা কণ্ঠে বলেন এবং বসার পরিবর্তে তাঁবুতে পায়চারি করতে থাকেন।

"খোদার কসম, ইবনে হারেসা!" হযরত খালিদ (রা.) স্মিত হেসে বলেন "তোমার হাব-ভাব এবং খুশির উত্তেজনা বলছে যে, নিশ্চয়ই তুমি কোন গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছ।"

"ধন-ভাণ্ডারের চেয়েও দামী তথ্য নিয়ে এসেছি আমি" মুসান্না বিন হারেসা (রা.) বলেন "আমার গোত্রের ইহুদীরা একটি ফৌজ তৈরি করে উলাইয়িসে সমবেত হতে রওয়ানা হয়েছে। তাদের নেতৃবৃন্দ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আমাদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আমি তা অন্তরে অন্তরে অবগত।"

"এই তথ্য লাভ করতেই কি তুমি গত রাত থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"হ্যাঁ" মুসান্না জবাব দেন "তারা আমার গোত্রীয়। আমি জানতাম আমার গোত্রের লোকেরা প্রতিশোধ না নিয়ে স্বস্তিতে বসে থাকবে না। বেশ বদল করে আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম। যে স্থানে বসে তারা আমাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা তৈরি করে আমি তার পার্শ্বস্থ কক্ষে বসে ছিলাম। আমি সেখান থেকে পুরো খবর সংগ্রহ করে রওয়ানা হয়েছি।... দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবরটা হলো, তাদের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সেনাসাহায্য চাইতে মাদায়েনে উরদূশেরের দরবারে গিয়েছে।"

"তাহলে তো এর অর্থ এটাই যে, আমার সৈন্যদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারব না।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন " এ মুহূর্তে এটা করলে ভাল হয় না যে, যেভাবে আমরা ওলযায় ইরানীদের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দিই নি, ঠিক তেমনি এখানেও আমরা ইহুদী ও ইরানীদের সমবেত হওয়ার পূর্বেই তাদের উপর আক্রমণ করব?"

"আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না বলেন " শত্রু মাথা উঁচু করার পূর্বেই তার ঘাড় মটকে দেয়াই সর্বোত্তম।"

হযরত খালিদ (রা.) উপস্থিত অন্যান্য সালারদের থেকে পরামর্শ চাওয়ার ভঙ্গিতে এক এক করে সকলের দিকে তাকান।

"এমনটিই হওয়া উচিত" সালার হযরত আছেম বিন আমর (রা.) বলেন "তবে সৈন্যদের শারীরিক অবস্থার প্রতিও নজর রাখা চাই। সৈন্যদেরকে কমপক্ষে দু'টি দিন বিশ্রামের সুযোগ দিলে কি ভাল হয় না।?"

"হ্যাঁ, জনাব খালিদ!" অপর সালার হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন "যেন এমনটি না হয় যে, প্রথম তিন বিজয়ের নেশায় সার্বিক দিক বিবেচনা না করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম, অতঃপর পরাজয়ের শিকার হতে হল।"

"ইবনে হাতেম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "সুন্দর এ পরামর্শ দানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এটাও ভাবতে হবে যে, সৈন্যদের বিশ্রামের উদ্দেশে দু'টো দিন ব্যয় করলে এরই মধ্যে ইরানী বাহিনী ইহুদীদের সাথে এসে মিলিত হবে না তো?"

"এমনটি হতে পারে" হযরত আদী (রা.) বলেন "ইরানী বাহিনীর আসতে দেয়াই আমার মতে ভাল। কেননা, এর আগেই বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে হতে পারে ইতোমধ্যে ইরানী বাহিনী এসে পশ্চাৎ হতে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। যে রণাঙ্গনে যারা যারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে ইচ্ছুক তাদেরকে সেখানে সমবেত হওয়ার সুযোগ দেয়াকেই আমি ভাল মনে করি।"

"জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না (রা.) বলেন "ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ রচনার অনুমতি প্রার্থনা করছি আমি।"

"এ পরিকল্পনার ফায়দা কি?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"ফায়দা হলো তাদেরকে আমি যেভাবে চিনি আর কেউ এমন চেনে না।" হযরত মুসান্না (রা.) জবাবে বলেন."আর এ জন্যও অগ্রবর্তী হয়ে আমি তাদের উপর আক্রমণ করতে চাই যে, তাদের পরিকল্পনার মধ্যে এটিও একটি বিশেষ দিক ছিল যে, তাদের গোত্রের যারা মুসলমান হয়েছে তাদেরকে তারা হত্যা করবে। তাই আমি আক্রমণের অগ্রভাগে থেকে তাদের বলতে চাই যে, দেখ কারা কাদের হত্যা করছে।

"বর্তমানে আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান। "আঠারো হাজারের কিছু বেশী এক সালার জানান।"

"পারস্যের সীমানায় পা রাখার সময় আমাদের সৈন্যসংখ্যা আঠারো হাজারই ছিল।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "এই এলাকার মুসলমানরা আমার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পেতে দেয়নি।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ইতোপূর্বে সংঘটিত তিন যুদ্ধে প্রচুর মুসলমান শহীদ এবং অনেকে মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ এটাও লিখেছেন, তিন যুদ্ধের পর সৈন্যদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মুসান্না (রা.)-এর গোত্র নিজেদের জনবল দিয়ে এই কমতি পূরণ করে দিয়েছিল।

* * *

আগুনপূজারী বাহিনীর সেনাপতি বাহমান উরদূশেরের সাথে সাক্ষাৎ করে তার থেকে নতুন নির্দেশ লাভের জন্য মাদায়েন পৌঁছেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক তাকে সম্রাট পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ পৌঁছতে দেয়নি।

"ভাল খবর আনলে ভেতরে যাও" চিকিৎসক বলে "আর ভাল খবর না এনে থাকলে আমি তোমাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দিব না।"

"খবর ভাল নয়" বাহমান বলে "আমাদের বাহিনী তৃতীয়বারের মত পরাস্ত হয়েছে। আন্দারযগার তো অন্তর্ধানই হয়ে গেছে।"

"বাহমান!" চিকিৎসক বলে "উরদূশেরের জন্য এর চেয়ে খারাপ খবর আর হতে পারে না। আন্দারযগারকে সম্রাট উরদূশের তাঁর সমরশক্তির সবচেয়ে মজবুত স্তম্ভ মনে করতেন। এই সেনাপতি যাওয়ার পর থেকে প্রতিদিন কয়েকবার করে তিনি জিজ্ঞাসা করতে থাকেন যে, আন্দারাযগার মুসলমানদেরকে পারস্য সীমানা থেকে তাড়িয়ে ফিরে এসেছে কিনা। এই একটু পূর্বেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

"সম্মানিত ডাক্তার!" বাহমান বলে "একটি বাস্তবতা লুকিয়ে আমরা কোন ভুল তো করছি না। কিসরা একদিন না একদিন অবশ্যই এ তথ্য জেনে যাবেন।"

"বাহমান!" চিকিৎসক বলে "আমি তোমাকে এই মর্মে সতর্ক করছি যে, তুমি এ খবর সম্রাটকে শুনালে নিজের গলা কেটে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

বাহমান সামনে পা বাড়ায় না। সেখান থেকেই ফিরে আসে। তবে সৈন্যদের কাছে ফিরে আসার পরিবর্তে মাদায়েনে কোথাও এই আশায় অবস্থান করতে থাকে যে, সম্রাটের অবস্থা একটু ভাল হলে সে নিজেই সম্রাটকে পরাজয়ের খবর জানাবে এবং তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে গত তিন পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে।

এ দিন কিংবা এর একদিন পর ইহুদিদের এক প্রতিনিধি দল উরদূশেরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক কিংবা রাজ পরিবারের কেউ ইতোপূর্বে জানতে পারে না যে, এই প্রতিনিধি দল কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছে। উরদূশের যেহেতু জানত যে, আন্দারযগারের বাহিনীতে ইহুদীরাও যোগ দিয়ে

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাই সে সানন্দে ইহুদী প্রতিনিধি দলকে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়। এই প্রতিনিধি দল সম্রাটকে প্রথম সাক্ষাতে যে খবর শুনায় তাহলো আন্দারযগার পরাজিত হয়েছে।

"আন্দারযগার পরাজিত হতে পারে না।" উরদূশের গা ঝাড়া গিয়ে উঠে বসে বলে "তোমারা আমাকে এই মিথ্যা খবর শুনাতে এসেছ?... কোথায় আন্দারযগার? তার পরাজিত হওয়ার সংবাদ সঠিক হয়ে থাকলে এটাও নিশ্চিত যে, যেদিন সে মাদায়েনের মাটিতে পা রাখবে সে দিনই তবে তার জীবনের শেষ দিন।"

"আমরা মিথ্যা খবর শুনাতে আসিনি।" প্রতিনিধিদল প্রধান বলে।

"আপনার এই তৃতীয় পরাজয়কে জয়ে পরিবর্তন করার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এসেছি। কিন্তু আপনার সাহায্য ব্যতীত আমরা সফল হতে পারবনা।"

উরদূশের নীরবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকে। তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে। ঔষধ তাকে সুস্থ করে তোলার পরবর্তে দীর্ঘ অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়। তৃতীয় পরাজয়ের খবরে তার আশার আলো ধপ করে নিভে যায়। হতাশা আর ব্যর্থতা তাকে চরমভাব গ্রাস করে ফেলে। সুস্থ হওয়ার যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল তাও হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ডাক্তার তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

"মহামান্য সম্রাটের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।" চিকিৎসক বলে " সম্মানিত মেহমানগণ এখন বিদায় নিলে সম্রাটের জন্য ভাল হত।"

ইহুদী প্রতিনিধিদল প্রস্থানের জন্য আসন ত্যাগ করে। চিকিৎসকের মনোভাব বুঝতে পেরে তারা ক্ষণকাল দেরী করে না।

"দাঁড়াও!" উরদূশের দুর্বল আওয়াজে বলে "পরাজয়কে জয়ে পরিবর্তন করার কথা তোমরা বলছিলে। তা তোমরা কি চাও?"

"কিছু ফৌজ চাচ্ছি মহামান্য সম্রাট। তবে অধিক সংখ্যক অশ্বারোহী হলে ভাল হয়।" প্রতিনিধি প্রধান বলে "আমাদের পুরো গোত্র উলাইয়িসে পৌঁছে গেছে।"

"যা চাবে পাবে" উরদূশের বলে "বাহমানের কাছে চলে যাও এবং তার বাহিনীকে সাহায্য হিসেবে নিবে। বাহমান ওলযার ধারে কাছেই কোথাও থাকবে।"

"বাহমান এখন মাদায়েনে জনাব!" কেউ উরদূশেরকে জানায় "সে সম্রাটের কাছে এসেছিল। কিন্তু চিকিৎসক তাকে আপনার কাছে আসা ভাল মনে করেনি।"

"তাকে ডাক" উরদূশের নির্দেশ দেয়" আমাকে কোন কিছু লুকিয়ো না। নতুবা সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।"

॥ চৌদ্দ ॥

বাহমান যখন সম্রাটকে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে বলছিল যে, রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগই তার হয়নি তখন ওদিকে উলাইয়িসের চিত্র কিছুটা ভিন্ন ছিল। বাহমান মাদায়েনে আসার সময় যাবানকে ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি নিয়োগ করে এসেছিল এবং তাগিদ দিয়ে বলেছিল, সে যেন তার আসা পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়ানো হতে দূরে থাকে।

যাবান উলাইয়িসের নিকটবর্তী কোথাও অবস্থানরত ছিল। সে এক সূত্রে এই সংবাদ পায় যে, ইহুদীদের একটি ফৌজ উলাইয়িসের আশে-পাশে জমা হচ্ছে। অপর এক সূত্রে সে এ তথ্যও পায় যে, মুসলমান বাহিনী উলাইয়িসের দিকে ক্রমে এগিয়ে আসছে। যাবানের প্রতি নির্দেশ কিছুটা ভিন্ন রকম থাকলেও মুসলমানদের মার্চ করার সংবাদ শুনে সে চুপটি মেরে বসে থাকতে পারে না। নিজ বাহিনীকে মার্চ করার নির্দেশ দিয়ে উলাইয়িসের পথ ধরে।

উলাইয়িস অভিমুখে মুসলমানদের এগিয়ে যাবার খবর যাবানকে বিচলিত করে তুলেছিল। বাহমান সেখানে ছিল না। যাবান ছিল দায়িত্বে। মুসলমানদের ঠেকাতেই এতদূর আসা। তাই কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করেই সে ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং ইহুদীদের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়।

উলাইয়িসে সমবেত ইহুদীদের সংখ্যা মোট কতজনে গিয়ে পৌঁছে ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাদের সর্বাধিনায়ক ছিল আব্দুল আসওয়াদ আযালী। সে ফৌজের সাথে থেকে মাদায়েন থেকে প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিল।

হযরত খালিদ (রা.) অপেক্ষা করার মত সেনাধ্যক্ষ ছিলেন না। তিনি স্বীয় বাহিনীকে সামান্য বিশ্রাম দেয়া জরুরী মনে করেছিলেন। এরপর তাদেরকে উলাইয়িস অভিমুখে মার্চ করার নির্দেশ দেন। গতি স্বাভাবিকতার চেয়ে অনেক দ্রুত ছিল। হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে একটু পৃথক হয়ে চলছিলেন।

"আল্লাহর সৈনিকেরা!" হযরত মুসান্না (রা.) পথিমধ্যে তাঁর বাহিনীর উদ্দেশে বলেন "সামনের লড়াই আমরা এমনভাবে লড়ব. যেভাবে ইরানের সীমান্ত এলাকার সেনাছাউনিতে তোমরা লড়েছিলে।... গেরিলা হামলা।... গুপ্ত আক্রমণ।... তোমরা যাদের সাথে লড়তে যাচ্ছ যারা এ প্রক্রিয়ায় লড়তে অভ্যস্ত নয়। তাদেরকে তোমরা চেন। তারা তোমাদেরই গোত্রের ইহুদী। তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে লড়াই করতে বাধ্য করব। এজন্য আমি তোমাদের মূল বাহিনী হতে পৃথক রেখেছি। তবে মনে রাখবে, আমরা মূল বাহিনীর সেনাপতিরই অধিনস্থ। সাথে সাথে এটাও মনে রাখবে যে, এটা ধর্ম সমুন্নত এবং মাজহাবী চেতনা রক্ষার লড়াই। তোমাদের প্রতিপক্ষ দুই ভ্রান্ত মতবাদী। আল্লাহ্ যে আমাদেরই সাথে তা যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের প্রমাণ করতে হবে।... মনে রেখ এই ইহুদী তারাই যারা

সর্বক্ষণ আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করেছে এবং অগ্নিপূজকদের হাতে আমাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমরা তাদের থেকে আজ প্রতিশোধ নিব।"

সৈন্যরা ঈমানী দীপ্ততায় শ্লোগান তুলতে থাকে। কিন্তু হযরত মুসান্না (রা.) তাদের থামিয়ে দেন এবং নীরবে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের ভাল করে জানিয়ে দেন যে, আমরা অতি সন্তর্পণে পথ অতিক্রম করব। শত্রুরা আমাদের আগমণের খবর তখন টের পাবে যখন আমাদের তরবারি তাদের হত্যা করতে থাকবে।

* * *

ইহুদী ফৌজ উলাইয়িসে তাঁবু স্থাপন করে মাদায়েন থেকে প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিল।

"হুশিয়ার! শত্রু আসছে" ইহুদী ফৌজের নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত সাথীরা একসাথে চিল্লিয়ে ওঠে "খবরদার! সাবধান! প্রস্তুত হও।"

আকস্মিক এ আওয়াজে রীতিমত হুলস্থুল পড়ে যায়। নেতৃপর্যায়ের লোকেরা উঁচু উঁচু বৃক্ষে উঠে খবরের সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা করে। একদল সৈন্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আটকে যায়। তাদের দিকে একটি বাহিনী এগিয়ে আসছিল। নেতারা বৃক্ষে বসেই তীরন্দাজ বাহিনীকে প্রথম সারিতে আসার নির্দেশ দেয়। ইহুদীরা নিয়মিত সৈন্য না হওয়ায় তাদের মাঝে নিয়মতান্ত্রিকতা, সুশৃঙ্খলা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অভাব ছিল। তারা পরিকল্পিত ও কৌশলী হামলার পরিবর্তে এক স্থানে দাঁড়িয়ে টানা হামলায় অভ্যস্ত ছিল। তারপরেও নেতাদের নির্দেশে ইহুদীরা সারিবদ্ধ হতে থাকে।

আগন্তুক বাহিনী কাছে এসে পড়েছিল প্রায়। সৈন্যরা আরো এগিয়ে এলে নেতাদের মাঝে কিছুটা সংশয়ের উদ্রেক হয়। এক সালার বলে যে, এটা মুসলিম বাহিনী হতে পারে না। কারণ এরা সেদিক থেকে আসছে যেদিকে বাহমানের বাহিনী থাকার কথা ছিল। সেনাপতি দু'অশ্বারোহীকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আগন্তুক বাহিনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বলে।

"এরা শত্রু নয়; বন্ধু" এক অশ্বারোহী দ্রুত ফিরে এসে উঁচু আওয়াজে বলে "আগত বাহিনী পারস্যের ফৌজ।"

"ঈসা মসীহের পূজারীগণ!" বৃক্ষের উপর থেকেই সেনাপতি চিৎকার করে বলে "তোমদের সাহায্যার্থে মাদায়েন থেকে ফৌঝ এসে গেছে।"

ইহুদীরা আনন্দে শ্লোগান তুলতে থাকে এবং এ শ্লোগান চলা অবস্থাতেই যাবানের বাহিনী ইহুদীদের ছাউনীতে এসে প্রবেশ করে। যাবান পুরো বাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে নেয়। এবং ইহুদী নেতাদের বলে তারা এখন থেকে তার নির্দেশ এবং নির্দেশনা মোতাবেক চলবে। যাবান ইহুদীদের সাহস বৃদ্ধির জন্য একটি গরম ভাষণ দেয়। তার এ ভাষণের সার-সংক্ষেপ এটাই ছিল যে, এবার তাদেরকে পূর্বের তিন পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নিতেই হবে।

"...তোমরা তন্বী তরুণীদের সাথে এনেছ" যাবান বলে "তোমরা হেরে গেলে এই কোমল নারীরা মুসলমানদের মালে গণীমত হবে। তাদেরকে তারা বাঁদী বানিয়ে নিয়ে যাবে। তাদের ইজ্জত-আবরুর দিকে চেয়ে জীবন বাজি রেখে লড়বে।"

সারিবদ্ধ ইহুদীদের মুখে শ্লোগানের খই ফুটছিল। তারা তো প্রথম থেকেই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল এখন সাথে ইরানীদের সুশৃঙ্খল বাহিনী দেখে তাদের সাহস ও মনোবল শত ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়।

মদীনা বাহিনীর গতিতে বেশ দ্রুততা ছিল। হযরত মুসান্না (রাঃ) তার দুধর্ষ বাহিনী নিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। সেটা শ্যামলিমা এবং সবুজাভ এলাকা ছিল। বৃক্ষের পর বৃক্ষ দাঁড়িয়ে ছিল। বিভিন্ন ঝোঁপ ঝাড় এবং উচুঁ উচুঁ ঘাসও ছিল প্রচুর । এলাকাটি এত ঘন গাছ-গাছালি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল যে, কেউ এখানে একটু এগিয়ে গেলেই সে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যেত। এলাকাটি বিনোদোন কেন্দ্রও ছিল। ইরানের বড় বড় সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা অফিসার এখানে ভ্রমণ এবং শিকার করতে আসত। উলাইয়িসের পরে হীরা নামে একটি শহর ছিল। বাণিজ্য ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ শহরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী ছিল। এটা ছিল সম্পূর্ণ ইহুদী বসতিপূর্ণ এলাকা সার্বিক দিক দিয়ে এ শহরটি রুচিশীল, দৃষ্টিনন্দন এবং সমৃদ্ধশালী ছিল।

"আর এটাও খেয়াল রাখবে" যাবান কমান্ডারদের উদ্দেশে বলছিল "যে, সামনে হীরা শহর। তোমরা জান যে, হীরা শহরটি আমাদের সাম্রাজ্যের একটি অমূল্য রত্ন– হীরা।মুসলমানরা এ শহর পদানত করলে শুধু সম্রাটের অন্তর ভেঙ্গে যাবে তা নয়; বরং পুরো সেনাবাহিনীর মনোবল ভেস্তে যাবে। হীরা রাজধানী মাদায়েন অপেক্ষাও মূল্যবান এবং গুরত্বপূর্ণ।

সবুজের সমারোহ চিরে এক অশ্বারোহী সাঁতরে আসছিল। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের মাঝভাগে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ঐ অশ্বারোহীর প্রতি আটকে যায়। অন্য কাউকে তার কাছে পাঠানোর পরিবর্তে হযরত খালিদ (রা.) নিজেই তার উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং তার সাথে গিয়ে মিলিত হন। অশ্বারোহী হযরত মুসান্না বাহিনীর এক সদস্য ছিল।

"ইবনে হারেছার পয়গাম নিয়ে এসেছি আমি" অশ্বারোহী হযরত খালিদ (রাঃ) কে বলে "উলাইয়িসের ময়দানে ইরানী ফৌজও এসে গেছে। ইবনে হারেছা খুব সাবধানে সামনে এগুতে বলেছেন।"

"এখনই ফিরে যাও" হযরত খালিদ (রা.) অশ্বারোহীকে বলেন "এবং মুসান্নাকে উড়ে আমার কাছে আসতে বলবে।"

হযরত মুসান্না (রা.)-এর দূত এমনভাবে গায়েব হয়ে যায় যেন জমিন তাকে গিলে ফেলেছে। তার ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত শোনা যেতে থাকে।

অতঃপর তা এক সময় বাতাসের শা শা শব্দে মিলিয় যায়। হযরত খালিদ (রাঃ) নিজে সৈন্যদের মাঝে ফিরে এসে সালারদের ডেকে পাঠান এবং তাদের বলেন যে, সামনে কেবল বনূবকরই নয়; মাদায়েনের সৈন্যরাও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। তিনি তাদের এ কথাও বলেন যে, মুসান্না বিন হারেছা আসছে। তিনি পূর্বের মত এবারও সালার হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)-কে ডান এবং বাম বাহিনীতে রাখেন।

একটু পরেই হযরত মুসান্না (রা.) এমনভাবে এসে পৌছান যেন তিনি সত্যই উড়ে এসেছেন।

"ইবনে হারেছা?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তুমি নিজ চোখে ইরান বাহিনীকে ইহুদীদের সাথে দেখেছ?"

হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.) কেবল দেখেই ছিলেন না, তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক কিছু অবগত হয়েছিলেন। তিনি গুপ্তচর আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারাই সর্বপ্রথম তাকে জানায় যে, ইরান বাহিনী ইহুদীদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে। হযরত মুসান্না (রা.) তখনই বিস্তারিত জানার সংকল্প করেন। রাতে তিনি তিন অশ্বারোহী সাথে নিয়ে শত্রুর তাঁবুর নিকটে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং ঘোড়াগুলো একটি বৃক্ষের সাথে বেঁধে রাখেন। সেখান থেকে তারা সন্তর্পনে এবং প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন স্থানে ক্রলিং করে করে তাঁবুর নিকটে গিয়ে পৌছান। ইরানী মন্ত্রীরা তাঁবুর চারপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল। তাদের এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান ছিল ১২ হিজরীর সফর মাসের মধ্যবর্তী কোন এক রাতে। আকাশে চাঁদ ছিল পূর্নিমা ভরা। এই রাত একদিকে অনুকূল ছিল আবার অপরদিকে প্রতিকূল হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। তারা যেমন চাদের আলোয় সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল তেমনি প্রহরীরাও তাদের দেখে ফেলার সম্ভাবনা ছিল।

দুই প্রহরী তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। পশ্চাৎ হতে তাদের জাপটে ধরা অতি সহজ ছিল। কিন্তু তাদের পেছনে এক অশ্বারোহী আসছিল। সে জোর গলায় ডেকে প্রহরীদের থামায় এবং তাদের কাছে এসে তাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক এবং হুশিয়ার থাকতে বলে। লোকটিকে একজন কমান্ডারের মতই মনে হচ্ছিল।

"মুসলমানরা রাতে তো আর আক্রমণ করবে না।" এক প্রহরী বলে "তার পরেও আমরা পূর্ণ সজাগ এবং সতর্ক ।"

"তোমরা সাধারণ সিপাহী" অশ্বারোহী নির্দেশের ভঙ্গিতে বলে "আমরা কমান্ডাররা যা জানি তা তোমরা জাননা। মুসলমানদের সম্পর্কে বলা যায় না যে, তারা কখন কি করে বসে। তাদেরকে গোবেচারা কোন শত্রু মনে কর না। তোমরা মুসান্না বিন হারেছার নাম শোন নি? তোমাদের জানা নেই যে, সম্রাট মুসান্নার মাথার দাম কত ঘোষণা করে রেখেছে? তাকে মৃত অথবা জীবিত ধরতে পারলে কিংবা যদি কেবল তার কল্লা কেটে উপস্থিত করতে পার তবে ধনৈশর্যে

ভরপুর হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা তাকে ধরতে পারবে না। সে জ্বিন বৈ নয়। কারো দৃষ্টিতে আসে না। সামনে যাও এবং নিজ পয়েন্টে সতর্ক দৃষ্টি রাখ।"

প্রহরী সামনে চলে যায় আর অশ্বারোহী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। হযরত মুসান্না (রা.) তিন জানবাযসহ এক ঘন ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। প্রহরীর গমন পথের দিকে না গিয়ে অশ্বারোহী উল্টো পথে সামনে এগুতে থাকে। ঘোড়ার পিঠে থাকা অবস্থায় তাকে বন্দী করা ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। হযরত মুসান্না (রাঃ) এক জানবাযের কানে কানে কিছু বলেন এবং অশ্বারোহীর দিকে তাকান। অশ্বারোহী কমান্ডার তখন ধীর গতিতে চলছিল।

হযরত মুসান্না (রা.) নিকটবর্তী একটি বৃক্ষে চড়ে বসেন। তার এক সাথী জোর আওয়াজে কি যেন বলে। কমান্ডার ঘোড়া দাঁড় করায়। জানবায সাথী তাকে ফিরে আসতে বলে। সে ঐ আহ্বানের জবাবে ফিরে আসতে থাকে। আচমকা হযরত মুসান্না (রাঃ) বৃক্ষ থেকে ঘোড়ার উপর লাফিয়ে পড়েন এবং কমান্ডারকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দেন। মুসান্নার এক সাথী দৌড়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে আর অপর দু'জন কমান্ডারকে পাঁজাকোলা করে উঠিয়ে নেয়। এবং তার মুখ বেঁধে দেয়। এরপর দ্রুত কমান্ডার ও তার ঘোড়া সেখান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। হযরত মুসান্নার জানবাযরা নিজেদের ঘোড়ার বাঁধন খোলে এবং সবাই এত দূরে চলে যায়। যে, কেউ চিৎকার দিলেও সে আওয়াজ শত্রুর তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছবে না।

"প্রাণে বাঁচতে চাইলে তোমাদের সৈন্যরা কোত্থেকে আসছে" হযরত মুসান্না (রা.) তলোয়ারের অগ্রভাগ তার শাহরগে চেপে জিজ্ঞাসা করেন।

সে বাহমান বাহিনীর কমান্ডার ছিল। প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে সে সব কিছু বলে দেয়। সে ভয়ে ভয়ে এটাও জানিয়ে দেয় যে, বাহমান এখন মাদায়েনে । তার স্থলে বাযান সেনাপতি। বনূ বকরের ফৌজের সাথে তারা ঘটনাক্রমে মিলিত হয়েছে। কমান্ডার এ তথ্যও জানায় যে, ইহুদী গোত্রের কিছু নেতা মাদায়েন থেকেও সৈন্য নিয়ে আসবে।

"মদীনার সৈন্যদের অবস্থান তোমরা জান কি?" হযরত মুসান্না (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন।

"তারা অনেক দূরে" কমান্ডার জবাবে বলে "আমরা তাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছি।... সম্ভবত দু'দিন পরেই।"

যা কিছু জানার দরকার তা জানা হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে তার লাশ সেখানেই মাটিচাপা দেয় হয়।

* * *

হযরত মুসান্না (রা.) যখন হযরত খালিদ (রা.)- কে এই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনাতে থাকেন তখন ইতোমধ্যে সূর্য উঠে গিয়েছিল।

"সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"সঠিক স্যখ্যা নিরুপণ করা কঠিন জনাব খালিদ?" হযরত মুসান্না (রা.) বলেন "আমাদের আর তাদের স্যখ্যার আনুপাতিক হার তেমনই যেমনটি পূর্বে ছিল। তারা আমাদের থেকে চারগুণ না হলেও তিনগুণ থেকেও অনেক বেশী হবে।"

সময় অপচয় না করে অগোচরেই শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়তে হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের পথ চলা অব্যাহত রাখেন। তিনি চলতে চলতেই সালারদের সাথে পরামর্শ সেরে নেন, নিজেও চিন্তা করেন এবং নির্দেশ দেন।

আরব মুসলমানদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইরানীদের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ সেনাপতি আন্দারযগার বলেছিল, এরা বর্বর মরুচারী, মরুভূমিতেই কেবল তারা লড়তে পারে। আন্দারযগার আরো বলেছিল সে তাদেরকে দজলা এবং ফোরাতের ঐ স্থানে লড়াই করতে বাধ্য করবে যে স্থানটি বৃক্ষ, ঝোপ-ঝাড় এবং ঘাসে ভরপুর, এবং কোথাও কোথাও অগভীর জলাভূমিও আছে। কিন্তু আন্দারযগারের সকল স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ঐ উর্বর এবং শ্যামলিমা সবুজাভ মনোরম স্থানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেস্তে গিয়েছিল।

"খোদার কসম! তোমরা এখন পানি পথে এবং বন জঙ্গলেও লড়তে পারবে" হযরত খালিদ (রা.) সালার উদ্দেশে বলেন "বিদেশের মাটিতে তোমরা এত শক্তিধর শত্রুকে তিনবার পরাস্ত করেছ। শত্রুদের লড়াইয়ের কৌশল ভঙ্গি তোমরা দেখেছ। মুসান্না বলেছে, শত্রুরা বর্তমানে যে স্থানে অবস্থান করছে তা দুই দরিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থান ময়দান সমতল, তবে বৃক্ষ এবং সবুজে পরিপূর্ণ। ঘোড়া ছুটানোর সময় এ সমস্ত বৃক্ষ ও তার ঝুলে থাকা ডালপালার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুবা এ সকল ডালে ধাক্কা খেয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে।...

ময়দান খুব প্রশস্ত নয়; সংকীর্ণ। শত্রুকে কোনরকম ফাঁদে ফেলা কিংবা নয়া কৌশল অবলম্বনের সুযোগ আমাদের হবে না। এবার মুখোমুখী সংঘর্ষ হবে। ইবনে আমর এবং ইবনে হাতেম পার্শ্ব বাহিনীর সালার থাকবে। তারা নিজ নিজ বাহিনী ব্যবহারের ব্যাপারে স্বাধীন। যখন পরিস্থিতি সামনে আসে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যেক সালার তার কমান্ডারদের বলে দেবে, মুখোমুখী সংঘর্ষে সর্বোচ্চ প্রেরণা, ফুরফুরে মন এবং দৃঢ় হিম্মতের প্রয়োজন সর্বাধিক।...

ইবনে হারেছা! এ লড়াইয়ে তুমি আমার অধীনস্থ নও। তোমার সাথে পূর্বেই কথা হয়েছে যে, তুমি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে লড়বে। তবে খেয়াল রাখবে তোমার বাহিনী যেন আমাদের পথে এসে না পড়ে। তোমার বাহিনীকে তুমি যেভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছ সেভাবেই তাদের ব্যবহার করবে। তবে তা কোনভাবেই উল্টোপাল্টা এবং অন্ধভাবে নয়। সুশৃঙ্খল এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী।"

"জনাব খালিদ।" মুসান্না বিন হারেছা বলেন, "আল্লাহ আপনাকে রহম করুন আপনি যেমনটি বলেছেন ঠিক তেমনটিই দেখবেন।... আমার অশ্বারোহী বাহিনীর মাঝে এখন আমি ফিরে যেতে পারি কি?"

"আমি তোমাকে আল্লাহর ভরসায় ছেড়ে দিচ্ছি ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "যাও, যুদ্ধের ময়দানে দেখা হবে। নতুবা হাশরের ময়দানে।"

হযরত মুসান্না (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং চোখের পলকে দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। তিনি আসার সময় ইরানী ঐ কমান্ডারের ঘোড়াও সাথে নিয়ে এসেছিলেন, যাকে তিনি ফিল্মি কায়দায় অপহরণ করে নিয়ে এসে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে হত্যা করেছিলেন। তিনি যাবার বেলা সে ঘোড়াটি হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যদের দিয়ে যান।

সৈন্যসংখ্যার সল্পতা এবং রণসম্ভারের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও মদীনা বাহিনী ঐ ফৌজের উপর আক্রমণ করতে এগিয়ে চলছেন। যাদের সংখ্যা তাদের চেয়ে তিনগুণ থেকেও বেশী। যুদ্ধাস্ত্রও উন্নত । তাদের প্রত্যেক সৈন্যের মাথা শিরস্ত্রাণ এবং চেহারা লৌহ শিকলে ঢাকা । তাদের পা পশুর মোটা এবং শুষ্ক চামড়ার আবরণে আচ্ছাদিত।

॥ পনের ॥

মুজাহিদদের মনে কোন শংকা ছিল না। মাথায় কোন দুশ্চিন্তা কিংবা বদ মতলব ছিল না। তাদের সামনে এক মহান উদ্দেশ্য ছিল। তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মাজহাবের সম্মান ও মর্যাদা ছিল। বেঁচে থাকার প্রশ্নটি তাদের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তারা এই মনোভাব পোষণ করত যে, জীবন আল্লাহ প্রদত্ত, তাই তাকে আল্লাহর রাহে কুরবান করতে হবে। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তারা ইসলাম রক্ষার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিল। আল্লাহর রাহে বের হবার পর থেকে তারা বাড়ী-ঘর স্ত্রী, মা বাপ, ভাই বোন এবং পুত্র-কণ্যা হতে কেবল দূরেই সরে যেতে থাকে। তাদের দিন রাত রক্ত-মাটির মাঝেই ব্যয়িত হতে থাকে। জমিন ছিল তাদের বিছানা আর উপরে ছিল আসমান। বাতিলের প্রাসাদ গুড়িয়ে দেয়া, কুফরের বুক চিরা এবং ইসলামের শক্রদের আশা আকাঙ্ক্ষা পদলিত করাই ছিল তাদের ইবাদত । তাদের মুখে জারী থাকত সর্বদা আল্লাহর নাম। আল্লাহর নাম নিয়েই তারা তলোয়ার চালাত। প্রতিপক্ষের তলোয়ারের আঘাতে লুটিয়ে পড়ার সময়ও তাদের মুখে শোনা যেত আল্লাহর নাম। আহত হয়ে তারা আল্লাহকে স্মরণ করত। নিঃসন্দেহে ঈমানের দৃঢ়তা এবং তাজা প্রেরণাই ছিল তাদের অস্ত্র । আর এটাই ছিল তাদের ঢাল।

* * *

মুজাহিদ বাহিনী সর্পিল গতিতে এগিয়ে প্রতিপক্ষের সামনে তখন উদয় হয় শক্রদের দুপুরের আহার প্রস্তুত যখন সদ্য শেষ হয়েছে। সর্বাধিনায়কের নির্দেশে সৈন্যদের জন্য বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক আল্লামা তবারী, ইবনে হিশাম এবং মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল লেখেন, পারস্য সৈন্যদের ষাড়ের মত প্রতিপালন করা হত। সৈন্যদের স্বাস্থ্যসম্মত এবং পুষ্টিকর খানা খাওয়ানো হত।

পারস্যপতিদের বদ্ধমূল বিশ্বাস এই ছিল যে, শক্তিশালী এবং কর্মঠ সেনাবাহিনীই সাম্রাজ্য এবং সিংহাসন নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

ইরান সেনাপতি যাবান অন্য সময়ের চেয়েও এ সময় উত্তম ও মজাদার খানা তৈরি করায় তার অধীনস্থ বাহিনী রীতিমত এ মজাদার খানা পাচ্ছিল । এই খাদ্যের বর্ণনা ইতিহাসেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রচুর পশু জবাই করা হয়। গোস্ত ছাড়াও আরো কয়েক আইটেমের খানা ছিল। ঐতিহাসিকগণ লেখেন, যাবান এ উদ্দেশ্যে ভাল ভাল খানার ব্যবস্থা করে যে, তার সৈন্যরা যেন আন্তরিকতার সাথে লড়াই করে এবং এরকম ভাল ভাল খানা খাওয়ার জন্য জীবিত থাকে।

খানা যেহেতু উন্নত এবং বিশেষ ধরনের ছিল তাই তা রাঁধতেও একটু বেশী সময় লেগে যায়। খাদ্য রন্ধন যখন সমাপ্ত তখন ক্ষুধায় সৈন্যরা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল। যখন ঘোষণা দেয়া হয় যে খানা প্রস্তুত এবং সবাই যেন নিয়মমত খানা খেতে বসে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে নিরাপত্তা প্রহরী জলদগম্ভীর স্বরে জানিয়ে দেয় যে, মুসলিম বাহিনী নিকটে এসে পড়েছে।

হযরত খালিদ (রাঃ) এ লক্ষ্যে পূর্ণ সফল হন যে, শত্রু বাহিনী তার আগমনের সংবাদ পূর্ব হতে জানতে পারে না। তিনি শত্রুর মাঝে তাদের আগোচরেই হাজির হন। প্রহরীর মতকে ইরানী ফৌজ এবং ইহুদীদের মাঝে ভীতি ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। সালার এবং কমান্ডাররা গলা ফাঁটিয়ে সৈন্যদেরকে যুদ্ধে প্রস্তুতি এবং সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিতে থাকে। কিন্তু সৈন্যদের সামনে যে সুঘ্রাণ ও মজাদার খানা ছিল তা ছেড়ে তারা উঠতে রাজি হয় না।

আল্লামা তবারীর বর্ণনা প্রমাণ করে যে, সৈন্যদের থেকে বড় জোরালো এই আওয়াজ ওঠে যে, মুসলমানরা এখনও দূরে আছে। আমরা ক্ষুধায় কাতর।

তাদের আসার পূর্বেই আমরা খানা খেয়ে নিতে পারব। অনেক সৈন্য সালারদের আহ্বান কানে না তুলে খাওয়া শুরু করে দেয়।

হযরত খালিদ (রা)-এর সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা পৌছেই যুদ্ধের জন্য উন্মুখ ছিল। ইরানী বাহিনী ও ইহুদীদের মাঝে তারাও ছিল, ইতোপূর্বে যারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছিল। তারা নিজেদের ফৌজ মুসলমানদের তলোয়ার এবং বর্শায় নির্মমভাবে নিহত হতে দেখেছিল। এ সমস্ত লোকেরা মুসলমানদের কথা শুনেই ভীত হয়ে পড়ে।

"পানাহার ত্যাগ কর" পূর্ব পরাজিত সৈন্যদের কয়েকজন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকে "এই মুসলমানদের সুযোগ দিওনা।... তারা নির্বিচারে হত্যা করবে। পালানোর সুযোগ দিবে না...প্রস্তুতি নাও।"

* * *

আহাররত সৈন্য অগত্যা মাঝপথেই উঠে পড়ে। তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। যারা তখনও পানাহার করেনি তারা সালার এবং কমান্ডারদেরও নির্দেশ মানছিল না। ক্ষুধায় তাদের জীবন খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম ছিল। কিন্তু যারা

মুসলমানদের রণমূর্তি দেখেছিল, তাদের গণহত্যার বিষয় অবগত ছিল তাদের আতংক এবং উদ্বেগ দেখে সকলেই খানা ছেড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

মুজাহিদ বাহিনী আরো সামনে এগিয়ে আসে। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দান করছিলেন।

শত্রুবাহিনী তখনও ঘোড়ায় জ্বিন স্থাপন এবং দেহে বর্ম ধারণে ব্যস্ত ছিল। যাবান আরেকটু সময় হাতে পেতে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইহুদী নেতা আব্দুল আসওয়াদ আযলীকে মল্লযুদ্ধ করতে সামনে পাঠায়।

"আমার মোকাবিলা করার হিম্মত কারো আছে কি?" আব্দুল আসওয়াদ ইহুদীদের সারি ডিঙ্গিয়ে সামনে গিয়ে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলে "আমার তলোয়ারে দ্বিখণ্ডিত হয়ে কারো মৃত্যুর সাধ হয়ে থাকলে সে সামনে আস।"

"আমি ওলীদের পুত্র।" হযরত খালিদ (রাঃ) খাঁপ থেকে তরবারী টেনে বের করে উপরে তুলে ধরেন এবং একথা বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন "আমার তলোয়ার তোর মত ব্যক্তির খুনের পিয়াসী থাকে সদা।... ঘোড়ার পিঠেই থাক এবং নিজের নাম বল।"

"আমি আব্দুল আসওয়াদ আযলী" সে বড় আওয়াজে বলে "আযলান গোত্রের নাম সমুন্নত থাকবে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া তার পাশ কেটে বেরিয়ে যায়। একটু আগে গিয়ে আবার পিছে ফিরে আসেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর তলোয়ার কোষমুক্ত ছিল। আব্দুল আসওয়াদও মুক্ত তরবারি হাতে ধারণ করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) ছুটন্ত ঘোড়ার উপর থেকেই তার প্রতি আঘাত করেন। কিন্তু আঘাত ব্যর্থ হয়ে যায়। আব্দুল আসওয়াদও হযরত খালিদ (রা.)-এর মত ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং আরেকবারের মত পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখী হয়। এবার আব্দুল আসওয়াদ আক্রমণ করে। হযরত খালিদ (রা.) তার আঘাত এভাবে প্রতিহত করেন যে, অব্দুল আসওয়াদের হাত তলোয়ারের যেখানে ধরা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর তলোয়ার সেখানে গিয়ে লাগে। ঝলকিত তলোয়ারের তীব্র আঘাতে তার বাটে ধরা হাতের দুই আঙ্গুলের মাথা কেটে পড়ে যায়। এবং সেই সাথে তার তলোয়ারও হাত থেকে ছিটকে পড়ে।

আব্দুল আসওয়াদ পালিয়ে যাবার পরিবর্তে চিৎকার করে বর্শা চায়। তার বাহিনী হতে এক ব্যক্তি বর্শা হাতে এগিয়ে আসে। সে প্রায় দৌড়ে তার নেতার কাছে আসতে চায়। হযরত খালিদ (রা.) তাকে বাঁধা দিতে ঘোড়ার মুখ ঐ ব্যক্তির দিকে ঘুড়িয়ে নেন। লোকটি পদাতিক ছিল। সে হযরত খালিদ (রা.) এর কোপানল থেকে বাঁচতে বর্শা নেতার দিকে ছুঁড়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) তার কাছে পৌছে গিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে বর্শাও আসতে শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথার উপর দিয়েই এ বর্শার গতিপথ ছিল। আব্দুল আসওয়াদ ঠিকমত বর্শা ধরতে দু'হাত প্রসারিত করে রেখেছিল। হযরত খালিদ (রা.) বর্শার দৌড় ঠেকাতে না পেরে সর্বশেষ উপায় হিসেবে তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে মাথার

উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বর্শায় তরবারীর আঘাত হানেন। বর্শার কোন ক্ষতি না হলেও উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। বর্শার গতি মাঝপথেই থমকে যায়। এবং সে ভূতলে আছড়ে পড়ে।

হযরত খালিদ (রা.) মুহূর্তে আব্দুল আসওয়াদের দিকে ঘোড়া ঘুরিয়ে আনেন এবং তার পালানোর পথ রুদ্ধ করেন। তলোয়ারের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মত শক্তি ও উপায় তার ছিল না। হযরত খালি (রা.) নিছক কৌতুকের উদ্দেশ্যে তাকে এদিক ওদিক ঘুরাতে থাকেন।

"জনাব খালিদ!" এক সালার জোর আওয়াজে বলেন "তাকে হত্যা করে ফেল। শত্রু এদিকে প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে।"

হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার গতি তীব্র করে এবং আব্দুল আসওয়াদের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হতে তলোয়ার বর্শার মত মারেন। আব্দুল আসওয়াদ ঘোড়ার এক পার্শ্বে ঝুকে পড়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর তলোয়ার তার অপর পার্শ্বদেশ ভেদ করে যায়। আব্দুল আসওয়াদ আহত হয়েও নিজেকে সামলে নেয়। কিন্তু সে পালায় না। হযরত খালিদ (রা.) এবার পিছন থেকে এসে তার উপর এমন আঘাত করে যে, তার মাথা কেটে এক কাঁধের দিকে চলে যায়। গর্দান সম্পূর্ণ কাটে না।

* * *

এদিকে যখন আব্দুল আসওয়াদের দেহ ঘোড়ার পিঠ থেকে জমিনে আছড়ে পড়ে ঠিক তখন ফোরাতের দিক হতে অসংখ্য ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে আসে। ঘোড়া দ্রুত ছুটে আসে। ঘোড়াগুলো যেদিক থেকে আসে সেদিকে ইহুদীদের সৈন্যরা ছিল। অশ্বারোহীদের হাতে বর্শা ছিল। ঘোড়া বিদ্যুতগতিতে ছুটে এসে সোজা ইহুদীদের সারি ভেদ করে যায়। অশ্বারোহীদের হাতের বর্শা এ সময় ইহুদীদের এ ফোঁড় ও ফোঁড় করতে থাকে। ইহুদীদের দৃষ্টি ছিল মুসলমানদের দিকে। তারা পশ্চাৎ আক্রমণ প্রতিহত করার সুযোগ পায় না।

"আমি হারেছার পুত্র মুসান্না!" গেরিলা আক্রমণের হৈ চৈ এর মাঝে একটি কণ্ঠ সকলের কানে আঘাত করে "আমরা তোমাদেরই গোত্রের লোক।... আমি মুসান্না বিন হারেছা।"

এই অশ্বারোহীরা হযরত মুসান্নার অধীনস্থ বাহিনী ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ)-এর অনুমতিক্রমে তিনি এ বাহিনীকে মূল বাহিনী হতে পৃথক রেখেছিলেন। তারা গেরিলা হামলায় অত্যন্ত দক্ষ ও পটু ছিল। বর্তমান যুদ্ধে কৌশল হিসেবে গেরিলা হামলা চালানোর প্রয়োজনও ছিল খুব। কারণ, এ রণাঙ্গন সর্বোচ্চ দু' মাইল দীর্ঘ ছিল। ডানে-বামে ছিল দু'টি নদী। হযরত খালিদ (রাঃ) যুদ্ধের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এ রণাঙ্গনে বিশেষ কৌশল অবলম্বন তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এ যুদ্ধে যে সম্পূর্ণ মুখোমুখী হবে তা তিনি স্পষ্ট ভাষায় সালারদের অবগত করিয়েছিলেন, এহেন যুদ্ধে সফলতার একটিই মাত্র পথ; আর তা হলো, শত্রুর উপর ভারী এবং প্রচণ্ড গতিতে হামলা চালানো, আরো ভাল হয় ঢেউয়ের গতিতে

হামলা চালাতে পারলে। আর তা এভাবে যে, ছোট ছোট ইউনিট থাকবে। একটি দল আক্রমণ করে ফিরে আসলে আরেকটি দল যাবে। এভাবে নিয়মতান্ত্রিক এবং ধারাবহিক আক্রমণ চালালে জয় করায়ত্ত হতে সময় লাগবে না। হযরত খালিদ (রা.) বর্তমান যুদ্ধে সৈন্যদেরকে এভাবেই প্রশিক্ষণ দান করেন। সৈন্যরাও দিন-রাত এই প্র্যাকটিস চালিয়ে আক্রমণের কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

হযরত খালিদ (রা.) মল্লযুদ্ধ শেষ হতেই একযোগে ঝাপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। তিনি পার্শ্ব বাহিনীকেও যুদ্ধে শামিল করে দেন। প্রথম আক্রমণের নেতৃত্ব হযরত খালিদ (রাঃ) নিজেই দেন । পার্শ্ববাহিনীর সালাররাও নিজ নিজ বাহিনীর সাথে গিয়ে আক্রমণে শরীক হন। ইরানীরা দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করে।

তবে মুসলমানরা ইরানীদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগায় যে, তারা লড়াইয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে যে, ইরানী বাহিনী মানসিকভাবেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা ছিল ক্ষুধার্ত। প্লেটে পরিবেশিত ঐ সুস্বাদু ও মজাদার খানা ছেড়ে তাদের তলোয়ার হাতে তুলে নিতে হয়, যা তাদের জন্য বিশেষভাবে রান্না করা হয়েছিল। ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে তো মুসলমানদের আক্রমণেরও পরোয়া করেনা। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক জানের কুরবানী দিতে হয়। ইরানী বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত না হওয়া সত্ত্বেও প্রথম চোটেই অনেক মুসলমানকে শহীদ করে দেয়। হযরত খালিদ (রাঃ) পিছে সরে আসেন এবং অন্য গ্রুপ সামনে পাঠান। ইরানীরা সংখ্যাধিক্যে প্রবল ছিল। একজন মুজাহিদের প্রতিপক্ষ ছিল চার-পাঁচ ইরানী এবং ইহুদী। শত্রুকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে মুসান্নার দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী শত্রু শিবিরে ঝড়-তুফান সৃষ্টি করতেই থাকে। হযরত মুসান্না তাঁর বহিনীকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে দেন। তারা পালাক্রমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শত্রুদের পশ্চাতে, পাশে যমদূতের মত হাজির হতে থাকে। এবং চোখের পলকে বর্শার আঘাত কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে তীরবেগে বেরিয়ে যেত। এভাবে শত্রুর দৃষ্টি পশ্চাতেও ফিরে যায়। কিন্তু মুসান্না বাহিনীর নাগাল তারা পায় না। হঠাৎ এক এক প্রান্ত হতে উল্কার বেগে এসে সৈন্যসারি লণ্ডভণ্ড করে দিত। হযরত মুসান্নার এই ঝড়োগতির হামলা থেকে হযরত খালিদ (রা.) পূর্ণ ফায়দা উঠাতে থাকেন। পাশ্চাৎ আক্রমণে যখন তারা বিব্রত তখন হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে মানসিকভাবে আঘাত করতে সম্মুখ হতে চাপ আরো বৃদ্ধি করেন।

"বনূ বকর!" যুদ্ধের ময়দানে একটি ঘোষণা শোনা যায়। "এবং যরথুস্ত্রের পূজারীরা ! দৃঢ়পদে লড়াই চালিয়ে যাও। মাদায়েন থেকে বাহমান সৈন্য নিয়ে আসছে।"

ঘোষক থেকে থেকে ঘোষণাটি বারবার সম্প্রচার করতে থাকে। ঘোষণাটি হযরত খালিদ (রা.)-কে বিচলিত করে তুলছিল। তিনি দূত মারফৎ পার্শ্বদ্বয় বাহিনীর সালারদের সবদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলেন। হযরত খালিদ (রা.)

রিজার্ভ বাহিনীকেও পূর্ণ সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, পাশ্চাৎ হতে আক্রমণের আশংকা রয়েছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত, বাহমান মাদায়েন থেকে কোন সৈন্য আনছিল না। কোন ঐহিতাসিক এ তথ্য লেখেন নাই যে, বাহমান যাবানের সাহায্যার্থে কেন এগিয়ে আসে নাই। ঐতিহাসিক ইয়াকূত লেখেন, বাহমান নিজ বাহিনীতে ফিরে আসছিল। পথিমধ্যে পলায়নরত কতক সৈন্যের সাথে তার দেখা হয়ে যায়। তারা উলাইয়িসের বর্তমান অবস্থা তাকে অবহিত করে । বাহমান সৈন্যদের মাঝে ফিরে যাবার পরিবর্তে সেখানেই যাত্রা বিরতি করে। তার উদ্দেশ্য ছিল, পরাজয়ের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। ভর্ৎসনার গ্লানি থেকে নিজেকে দূরে রাখা। মোটকথা, রণাঙ্গনের ঐ উপর্যুপরি ঘোষণার বাস্তবতা যাই হোক না কেন মুসলমানদের মাঝে তা নয়া প্রেরণা সৃষ্টি করে। হযরত খালিদও (রা.) ঘোষণা করেন যে, মাদায়েনের সৈন্য এসে পৌঁছানোর পূর্বেই তোমরা এ বাহিনীর কোমর ভেঙ্গে দাও। কিন্তু ইরানী বাহিনী এবং ইহুদীরা প্রস্তরময় প্রান্তের মত দৃঢ়, অটল অবিচল হয়ে থাকে।

হযরত খালিদ (রাঃ) প্রতি রণাঙ্গনে দু'আ করতেন । কিন্তু এই সর্বপ্রথম যুদ্ধ, যেখানে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে হাঁটু ফেলে এবং হাত তুলে দোয়া করেন "হে পরওয়ারদেগার। আমাদের শক্তি বৃদ্ধি এবং অটুট মনোবল দান করুন যেন আমরা শত্রুদের পিছপা করাতে পারি। আমি অঙ্গিকার করছি যে, আপনার দ্বীনের শত্রুদের রক্তে আমি নদী বইয়ে দিব।"

হযরত খালিদ (রা.) দোয়া শেষে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হামলা চালাতে থাকেন। ইতোমধ্যে দু'পার্শ্বের সালারদ্বয় দু'দিক থেকে শত্রুদেরকে প্রায় ঘেরাও করে ফেলে। হযরত মুসান্নার বাহিনী অব্যাহত গেরিলা হামলা চালিয়েই যেতে থাকে। চতুর্মুখী পরিকল্পিত তীব্র হামলার মুখে শত্রুদের পা টলটলায়মান হয়ে উঠছে। শত্রুসংখ্যা বেশি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে তারাই অধিকহারে আহত ও নিহত হতে থাকে। স্বপক্ষীয় সৈন্যদের এ ব্যাপক হত্যার চিত্র দেখে ইতোপূর্বের বিভিন্ন যুদ্ধে যারা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং রণাঙ্গন থেকে নিজেকে দূরে সরাতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের দেখাদেখি অন্য সৈন্যরাও পলায়নের পথ ধরে। শত্রুদের পিছু হটার দৃশ্য দেখে মুসলমান বাহিনী আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে। তাদের তলোয়ার এখন অগ্নিস্ফূলিঙ্গ আর বিদ্যুৎ বর্ষণ করতে থাকে। এরপর হঠাৎ করে কাফেররা রণে ভঙ্গ দিতে শুরু করে।

* * *

"পশ্চাদ্ধাবন কর" হযরত খালিদ (রা.) এই পয়গাম দিয়ে বাহিনীতে দূত পাঠান এবং উচ্চ আওয়াজে এই ঘোষণাও করান যে, তাদেরকে পালিয়ে যেতে দিও না। হত্যাও কর না। জীবিত বন্দী কর।"

এই ঘোষণার তাৎক্ষণিক ফল এই দেখা দেয় যে, কাফেররা পালানোর পরিবর্তে গণহারে অস্ত্র সমর্পণ করতে শুরু করে। অনেকে পলায়ন করাকেই ভাল

মনে করে সটকে পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত মুসান্নার বাহিনী তাদের ইচ্ছায় বাঁধ সাধে। এ বাহিনী পশ্চাতে ছিল। যারা পালাতে পিছে ভেগে যায় মুসান্নার বাহিনী তাদেরকে ঘেরাও করে করে ফিরিয়ে আনতে থাকে। যুদ্ধ সমাপ্ত। রণাঙ্গণ লাশ এবং অজ্ঞান ও ছটফটরত আহতদের দ্বারা ভরা ছিল। এক কোণে ঐ খানা অবহেলায় পড়েছিল যা শত্রুরা দুপুরে খেতে প্রস্তুত করেছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে মুজাহিদরা খানা খেতে বসে যায়। পলায়নপর সৈন্যদের ধরে ধরে আনছিল তারাও পালাক্রমে আহার সেরে নেয়।

হযরত খালিদ (রা.) এ সময় মুজহিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন "খানা আল্লাহ্পাক তোমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়েছেন। প্রাণভরে খাও।" মুসলমানরা বিভিন্ন পদের খানা দেখে বিস্মিত হচ্ছিল। তারা ইতোপূর্বে এমন খানা খাওয়া তো দূরে থাক দেখেও নাই। তারা যবের রুটি, উটের দুধ এবং খেজুর খেতে অভ্যস্ত ছিল। আর খাদ্য বলতে তারা এগুলোকেই বুঝত।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা, যে সমস্ত শত্রু জীবিত ধরে আনা হচ্ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে তাদেরকে খুসাইফ নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের মাথা ধড় থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় যে, মাথা সোজা নদীতে গিয়ে পড়ত। অতঃপর মুণ্ডুহীন ধর নদীর কূলে এভাবে নিক্ষেপ করা হত যে, রক্ত যা পড়ার তার সবই নদীতে গিয়ে পড়ত। এভাবে নিহতদের সংখ্যা হাজারেরও বেশী ছিল।

অমুসলিম ঐতিহাসিক এবং বিশেষজ্ঞরা হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নির্দেশকে জুলুমাত্মক বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর এই নির্দেশের কারণ ছিল স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ। তিনি যুদ্ধের এক পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যুদ্ধে বিজয় করায়ত্ত করতে পারলে রক্তের নদী বইয়ে দেবেন।

যে নদীর কূলে এই হত্যাকাণ্ড চলে সেখানে একটি বাঁধ ছিল। এই বাঁধের ফলে নদীর পানি থমকে ছিল; পানির প্রবাহ ছিল না। যার দরুণ রক্তও জমে থাকছিল পানিতে বয়ে যাচ্ছিল না। এক ব্যক্তি হযরত খালিদ (রা.)-কে পরামর্শ দেয় যে, এই বাঁধ খুলে দিলে তবেই রক্তের নদী বইবে; নতুবা বইবেনা। অতঃপর হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে নদীর বাঁধ খুলে দেয়া হয়। হাজার হাজার মানুষের রক্ত নদীতে পড়লে পানি লাল হয়ে যায় এবং পানি বাঁধ মুক্ত হয়ে স্রোতের বেগে বইতে থাকে। এ কারণে ইতিহাসে এ দরিয়াকে 'খুনের দরিয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কোন কোন ঐতিহাসিকদের অভিমত, পলায়নপর এবং আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদেরকে হযরত খালিদ (রা.) এ কারণে গণহারে হত্যা করেন যে, এই সৈন্যরা এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার পরবর্তী রণাঙ্গনে উপস্থিত হত। এর প্রতিষেধক হিসেবে হযরত খালিদ (রা.) সিদ্ধান্ত নেন যে, এবার একজন সৈন্যকেও জীবিত রাখা হবেনা। বলা হয়, একাধারে তিন দিন পর্যন্ত ইরানী এবং ইহুদীদের গণহত্যা চলতে থাকে। এভাবে নিহতদের সংখ্যা যোগ করে এ যুদ্ধে ইরানী এবং ইহুদী সৈন্যদের নিহতের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ হাজার।

॥ ষোল ॥

ন্যায় বিচারক নওশেরওয়াঁর পৌত্র সম্রাট উরদূশের এমন রোগের কবলে পড়ে যার চিকিৎসা রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকদের সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। এই রোগের সূচনা হয় পরপর তিন পরাজয়ের কঠিন মানসিক আঘাত থেকে। কিন্তু এই মানসিক অসুস্থতা এখন দৈহিক অসুস্থতার রূপ পরিগ্রহ করে। ঔষধেই এ রোগের চিকিৎসা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, যেন সে ঔষধ নয়; বরং ঔষধই তাকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

উরদূশেরের উপর নীরবতা ছেয়ে যায়। নিজ যুগের প্রতাপশালী ফেরাউন হওয়া সত্ত্বেও এখন তার অবস্থা মরুভূমির আলোর মত নিভু নিভু। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসক এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিল, যেন যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন খারাপ সংবাদ উরদূশের পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা সম্ভব ছিল না। কারণ, কখনো মুখ খুললে প্রথমে সে এ কথাই বলত যে, রণাঙ্গনের কোন খবর এল কি?

"সুসংবাদই আসছে জাঁহাপনা!" সর্বদা পাশে উপস্থিত চিকিৎসক তাকে জবাব দিত এবং তাকে বাঁচাতে কখনো বানিয়ে বলত "মুসলমানরা এভাবে পিছু হটছে যেন কোন দৈত্যের মুখোমুখি হয়েছে তারা।" আবার কখনো বলত "পারস্য সাম্রাজ্য একটি অজেয় প্রান্তর। এ প্রান্তরে যেই মাথা ঠুকতে চেষ্টা করেছে তার মাথা ছিদ্র হয়েছে।" আবার কখনো তার প্রাণের রাণী এই বলে তাকে প্রবোধ দিত যে, "আরবের বুদ্দুরা কিসরার শৌর্য-বীর্যের প্রতাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।"

এই প্রবোধ ও সান্ত্বনামূলক বাক্য কিসরার উপর ঔষধের মত উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। কোন কিছুতেই তার নীরবতা ভঙ্গ হয় না। এবং চেহারায় উদাসীনতার ছাঁপ হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমে তা গভীর থেকে গভীর হতে থাকে।

তার একান্ত পছন্দের নর্তকী তার সামনে গিয়ে রূপ-নাগিনীর মত দেহে ঢেউয়ের উত্তাল তরঙ্গ তোলে। শরীর অর্ধনগ্ন করে দেয়। উরদূশেরের ম্রিয়মান চেহারার উপর সুগন্ধিযুক্ত রেশমের মত মোলায়েম কেশদাম ছড়িয়ে ছায়া বিস্তার করে। অতঃপর সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে নাচের ঝড় তোলে। রূপ-লাবন্যে মোহিত করে কিসরার রুগ্ন সন্তানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়াস পায়। কিন্তু ফলাফল জিরো। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, যেন নর্তকী বিজন জঙ্গলে নেচে চলছে আর তার নাচের নৈপুণ্য জঙ্গলের হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

একসময় তার প্রিয় শিল্পীরা যারা তাকে গানে গানে মাতিয়ে দিত এবং দারুণ বিমোহিত করত এ সময় তাদের প্রাণ মাতানো গানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সকল নর্তকী এবং শিল্পীরা পারস্য খ্যাত ছিল। পারস্যের ভুবনখ্যাত সুন্দরী-রূপসীরা হরমে ফুলের মত প্রস্ফুটিত ছিল। এদের কতক আবার অর্ধ-উন্মিলিত ফুলকলিও ছিল। উরদূশের এ সমস্ত প্রস্ফুটিত উন্মিলিত ফুল ও তার কলির নাদুস-নুদুস শরীরের ঘ্রাণে দিন-রাত বিভোর থাকত। কিন্তু এখন তাদেরই এক একজন করে তার নির্জন সঙ্গীরূপে গেলেও সে কাউকে মনোরঞ্জনের সাথীরূপে

বরণ করেনা। কেউ তার দেহ মনে নয়া যৌবনের তুফান তো দূরে থাক বিন্দুমাত্র উষ্ণ শিহরণও জাগাতে পারে না।

"ব্যর্থ, সকল চেষ্টা ব্যর্থ" পারস্য-রাণী বাইরে এসে ঐ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসকের কাছে ব্যর্থতা প্রকাশ করে বলে, যার সম্পর্কে সবাই জানত যে, তাকে দেখে মৃত্যুও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রাণী দরাজগলায় চিকিৎসককে বলে "আপনার জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও ফেল হয়ে গেল? এটা কোন রং তামাশা নয় তো? কিসরার ঠোটে মুচকি হাসির আভা আনতেও কি আপনি পারেন না? কে বলে, আপনার ছোঁয়ায় মৃত্যুও জেগে ওঠে?"

যরথুস্ত্র আপনার প্রতি সদয় হোন পারস্য-সম্রাজ্ঞী।" বয়োবৃদ্ধ চিকিৎসক মুখ খোলে "কারো জীবন-মৃত্যু আমার হাতে নয়। আমি জীবন-মৃত্যুর মধ্যবর্তী এক দুর্বল প্রাচীর মাত্র। মৃত্যুর হাত এত মজবুত ও শক্তিশালী যে, সে ঐ প্রাচীরকে দরজার খিলের মত খুলে ফেলে এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায়। মৃত্যুর এই শক্তির সামনে আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা তুচ্ছ হয়ে রয়ে যায়।"

"শব্দ, কেবল শব্দ" সম্রাজ্ঞী গালিচায় পা জোরে ছুঁড়ে বলে "নিষ্প্রাণ শব্দ মাত্র।... শুধু গালভরা বুলি কোন দুঃখীর দুঃখ মুছে দিতে পারে? কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে তার রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারে? আপনার মুখে এমন শক্তি আছে যে, কিসরার রোগ চুষে নিতে পারে?"

"না মাননীয় সম্রাজ্ঞী!" চিকিৎসক বড় ধৈর্যের সাথে বলে এবং কম্পিত হাতে সম্রাজ্ঞীর বাহু ধরে তাকে বসিয়ে বলে "কেবল বুলি কারো দুঃখ এবং কারো রোগ নিরাময় করতে পারে না। তবে দুঃখ এবং রোগের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব করে থাকে। বাস্তবতার সামনে শব্দের কোন অর্থ নেই। আর বাস্তবতা যদি রূঢ় ও বিস্বাদ হয় তবে জ্ঞানীর মুখ থেকে নির্গত শব্দ মনে হয়, যেন হেমন্তের গোধূলিতে বৃক্ষের হলুদ পাতা ঝরে ঝরে পড়ছে। শুকনো ঐ পাতা আবার বাতাসের দোলায় হেলে-দুলে নাচতে থাকে।"

"আমরা কিসরাকে বাস্তব থেকে দূরে রাখছি" সম্রাজ্ঞী বলে "আমি তাকে গান বাদ্যে ভুলিয়ে...।"

"কিন্তু কতদিন নাগাদ? "বৃদ্ধ চিকিৎসক তার কথার মাঝপথে কেটে দিয়ে বলে "মাননীয় সম্রাজ্ঞী! আপনারা কিসরা হতে রূঢ় বাস্তবতা কতদিন গোপন করে রাখবেন। এই নৃত্য, গান এবং মখমলের মত নরম ও যৌবনদীপ্ত শরীর কিসরা উরদূশের মন ভুলাতে পারবে না। কিসরা কেবল সম্রাট হলে তিনি নিজেকে চমৎকারভাবে প্রতারিত করতে পারতেন। পালিয়ে গা বাঁচাবার সুগম পথ ধরতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেবল সম্রাটই নন; বীরযোদ্ধাও বটে। তাঁর ঘোড়ার পদভারে জমীনের তলদেশে কম্পন তুলেছিল। পারস্যের এই বিশাল সাম্রাজ্য কিসরার বাহুবলেরই ফসল। এই সাম্রাজ্য তিনি রোমীয়দের শক্তিশালী সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।" কিসরা নিজেও অস্ত্র ধারণ করেছেন। ভয়ানক যুদ্ধ করেছেন। ঘুমন্ত সেই সিংহ এখন জাগ্রত। এতদিন তিনি বিলাসিতায় বিভোর

থাকলেও এখন তিনি সতর্ক। ফলে নৃত্য, গান এবং জাদুরূপী নারী সবই তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এখন তিনি কোন নর্তকী কিংবা কণ্ঠশিল্পী নয়; বরং হুরমুজ, আন্দারাযগার, বাহমান এবং আনুশাযানকে ডেকে ফিরছেন।... কোথায় এখন তার এ সকল শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা? আপনি তাকে কিভাবে ধোঁকা দিবেন?"

"না, না," সম্রাজ্ঞী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে "ধোঁকা দিয়ে আর কি লাভ।... আপনি ঠিকই বলেছেন।... কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় কি? আমার মাথায় কিছুই আসছে না। আমাদের প্রতিপক্ষ ঐ মুসলমানদের সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন? কয়েকজন ইহুদী এসেছিল। তারা মন্তব্য করছিল, মুসলমানদের এমন এক ভরপুর শক্তি আছে যার মোকাবিলা করার সামর্থ্য কারো নেই।... আর আমি লক্ষ্য করেছি যে, দজলা আর ফোরাতের সংগমস্থলে যে সকল মুসলমানকে পুনর্বাসিত করে তাদেরকে আমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিলাম এবং যাদেরকে আমরা কীট-পতঙ্গের উর্ধ্বে জানতাম না, তারাই আজ মদীনাবাসীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের সৈন্যরা তাদের সামনে দিয়ে বকরীর মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"এটা চেতনা-বিশ্বাসের শক্তি মাননীয় সম্রাজ্ঞী!" বৃদ্ধ চিকিৎসক বলে "একটি কথা বলতে চাই, যদিও তা আপনার ভাল লাগবে না। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, বাদশাহীর অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার। পৃথিবীর সকল মানুষ তাঁরই আজ্ঞাবহ।... তারা আরো বলে যে, সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।... আপনি এই রহস্যের গূঢ় তথ্য বোঝেন মাননীয় সম্রাজ্ঞী?

"না, জনাব চিকিৎসক!" সম্রাজ্ঞী জবাবে বলে "আমি আপনার কথার মর্মার্থ সম্বন্ধে অবগত নই। আমি সাধারণভাবে যা বুঝি তা হলো, বাদশাহী একটি খান্দানী ব্যাপার। খান্দানের সদস্যরাই পর্যায়ক্রমে বাদশাহ হয়।"

এই খান্দানী রীতির করুণ পরিণতি আপনি নিজে চোখে দেখছেন মাননীয় সম্রাজ্ঞী!" চিকিৎসক বলে "যিনি নিজেকে জনগণের সম্রাট বলে মনে করতেন আজ তিনি নির্জীব, নিস্প্রাণ হয়ে ভেতরে পড়ে আছেন। স্বীয় রাজত্ব শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। তার সেনাবাহিনী শুধু পিছপাই হচ্ছে। বেচারা সিপাহীদের এত কি দায় ঠেকেছে যে, একটি খান্দান এবং ব্যক্তির রাজত্বের জন্য নিজেদের জীবন-যৌবন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে? হাজার হাজার যারা মারা যাচ্ছে অধিকাংশই পালাতে গিয়ে মরছে। তারা যখন দেখছে যে, এখানে যুদ্ধে জয়ী হবার বেলায়ও মালে গণীমত নেই তখন তারা লড়তে দ্বিধা করছে। তারা আপনাদের সরকারী কোষাগার হতে মাসিক বেতন লাভের উদ্দেশ্যে জীবিত থাকতে চায়।"

"আর মুসলমানরা?" সম্রাজ্ঞী উৎসুক হয়ে জানতে চায়।

"মুসলমানরা!" চিকিৎসক বলে "তারা কোন ব্যক্তিস্বার্থে লড়ে না। তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় লড়ে এবং সেনাপতির নির্দেশ মেনে

চলে। বস্তুত এ কারণেই সংখ্যায় স্বল্প হয়েও তারা তুফানের গতিতে ধেয়ে আসছে।... মাননীয় সম্রাজ্ঞী! প্রত্যেকের চেতনা-বিশ্বাস এবং মাজহাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমি জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার কথা বলছি। যখন কোন খান্দান কিংবা কোন ব্যক্তি নিজেকে রাজাধিরাজ জ্ঞান করে এবং অন্য মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করা ভুলে যায় তখন একদিন এমন আসে যখন সে সমস্ত সৈন্য এবং জনগণকে ধ্বংস এবং বিপর্যয়ের গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে।"

"আমি এসব সূক্ষ্ম কথা বুঝি না" সম্রাজ্ঞী বলে "এবং বুঝতেও চাই না। আমি শুধু চাই, যে কোন উপায়ে কিসরা সুস্থ হয়ে উঠুক। এর জন্য যা যা দরকার তা করুণ মাননীয় চিকিৎসক।

"কোন কিছুতেই কিছু হবে না। মাননীয় সম্রাজ্ঞী!" ডাক্তার বলে–"কোন কিছু করে লাভও নেই। মুসলমানদেরকে পারস্যের সীমানা হতে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে–এই খবরটুকু শুধু এনে দিন। কিংবা খালিদ বিন ওলীদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কিসরার সামনে এসে উপস্থিত করুন, দেখবেন কিসরা উঠে দাঁড়িয়েছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।"

"এমন খবর কোথা থেকে আনব!" সম্রাজ্ঞী আশাহত এবং পরাজিত কণ্ঠে বলে, "মদীনার এই সেনাপতিকে কিভাবে জিঞ্জিরে বেঁধে আনব?... আমার সেনাপতি যদি পরাজিত হয়ে জীবিত ফিরে আসত, তবে আমি তার পা মাটিতে পুঁতে তাকে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিতাম।"

অতঃপর সে মাথা নীচু করে সেখান থেকে প্রস্থান করে। চিকিৎসকের কথার রূঢ় বাস্তবতা সে সহ্য করতে পারে না।

* * *

একটি ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে এবং শাহী মহলের বহির্ভাগে এসে থামে। সম্রাজ্ঞী অশ্বের খুরধ্বনি শুনেই বাইরে বেরিয়ে আসে। বৃদ্ধ চিকিৎসকও তার পিছনে পিছনে ছুটে আসে। আগত অশ্বারোহী একজন কমান্ডার। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই সে সম্রাজ্ঞীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তার মুখ খোলা এবং চোখ সাদা হয়ে গিয়েছে। চেহারায় শুধু ক্লান্তিই নয়; আতঙ্কও বিরাজ করছিল।

"কোন সুসংবাদ এনেছ?" সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করে এবং রাজকীয় দাপটের সাথে বলে "উঠে বস এবং জলদি বল।"

"কোন ভাল খবর নেই" কমান্ডার বড় বড় শ্বাস ফেলে বলে "মুসলমানরা সমস্ত সৈন্যকে হত্যা করেছে। তারা আমাদের হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে খুসাইফ নদীর পাড়ে এমনভাবে হত্যা করেছে যে, নদীতে রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। নদী শুষ্ক ছিল। মুসলমানদের সেনাপতি উপর থেকে নদীর বাঁধ খুলে দিলে নদীতে রক্তের প্রবাহ শুরু হয়ে যায়।" "আপনি কেন জীবিত ফিরে এলেন?" সম্রাজ্ঞী ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি আমার হাতে নিহত হতে এখানে এসেছেন?"

পরবর্তী যুদ্ধে লড়ার জন্য আমি জীবিত ফিরে এসেছি" কমান্ডার জবাবে বলে "আমি লুকিয়ে আমাদের সৈন্যদের মস্তক ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছি।"

"সাবধান!" সম্রাজ্ঞী নির্দেশের সুরে বলে "এই সংবাদ আর কোথাও যেন রাষ্ট্র না হয়। পারস্য সম্রাটকে...।"

"পারস্য সম্রাট এই খবর শোনার জন্যই কেবল জীবিত আছে" উরদূশেরের আওয়াজ ভেসে আসে।

সম্রাটের আওয়াজ পেয়ে সম্রাজ্ঞী এবং চিকিৎসক উভয় বিস্ফোরিত নেত্রে আওয়াজের উৎস পথে চায়। একটি পিলারে ভর দিয়ে তাদের অদূরেই সম্রাটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। দুই অপূর্ব সুন্দরী এবং তম্বী যুবতী সম্রাটের হাত নিজেদের কাঁধে স্থাপন করে রেখেছিল।

"এখানে এস" সম্রাট কমান্ডারকে নির্দেশ দেয় "অমি অনুমান করেছিলাম হয়ত বা কোন দূত এসেছে।...বল, কি খবর এনেছ?"

কমান্ডার পালাক্রমে সম্রাজ্ঞী এবং চিকিৎসকের দিকে তাকায়।

"এদিকে তাকাও" উরদূশের গর্জে উঠে বলে "সংবাদ শুনাও।"

কমান্ডার নিরুপায় হয়ে এক এক করে সকল ঘটনা খুলে বলে। পরাজয়ের সংবাদ শুনার সাথে সাথে উরদূশেরের মাথা সামনের দিকে হেলে যায়। বাহু ধরে রাখা দু'নারী সম্রাটকে ভর দিয়ে রাখে। সম্রাজ্ঞী ছুটে এসে সম্রাটের হেলে পড়া মাথা উপরে তুলে ধরে। বৃদ্ধ চিকিৎসক সম্রাটের নাড়িতে হাত রাখে। সম্রাজ্ঞী অসহায়ভাবে চিকিৎসকের দিকে তাকায়। চিকিৎসক নিরাশার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়।

"পারস্য সাম্রাজ্য কিসরা উরদূশের থেকে চির বঞ্চিত হয়ে গেছে" চিকিৎসক কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে চোখ মুছে।

মুহূর্তে শাহী মহলে হুলস্থুল পড়ে যায়। কান্নার রোল ওঠে। উরদূশেরের লাশ হাতে হাতে তার ঐ কামরায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে বসে সে কয়েকবাব বলেছিল আরবের ঐ লুটেরা বুদ্দুদের ইরান সাম্রাজ্যে পা রাখবার সাহস কিভাবে হল। সে এই কামরায় বসে হযরত খালিদ (রা.) এবং হযরত মুসান্না (রা.) কে জীবিত অথবা মৃত্যু উপস্থিত করার নির্দেশ দিয়েছিল। এ নির্দেশ প্রতিপালিত হওয়ার পূর্বেই তার লাশ পড়েছিল এই কামরায়। পরাজয়ের ক্রমাঘাতেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

সম্রাজ্ঞী নির্দেশ জারী করে যে, লড়াইরত সৈন্যরা যেন কিসরার মৃত্যুর খবর জানতে না পারে। মুসলিম শিবিরে একটি ঘোড়া ছুটে এসে প্রবেশ করে। অশ্বারোহী জোরে চিৎকার করে বলছিল।

"জনাব খালিদ কোথায়?" ঘোড় সওয়ার দু'হাত উঁচু করে নাড়াতে নাড়াতে আসছিল "বাইরে আসুন জনাব খালিদ!"

হযরত খালিদ (রা.) দ্রুতবেগে বাইরে আসেন।

"জনাব খালিদ" আরোহী বলতে বলতে আসছিল, "আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আপনার আতঙ্ক উরদূশেরের জীবন সংহার করেছে।" "তুমি উন্মাদ

হয়ে গেলে ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন। আগত আরোহী ছিলেন মুসান্না ইবনে হারেসা। তিনি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামেন এবং এত আনন্দে হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন যে, হযরত খালিদ (রা.) পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে রক্ষা পান। "মাদায়েনে শোক বইছে" হযরত মুসান্না (রা.) আনন্দের আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বলেন "শাহী মহল এখন কান্নার মহলে পরিণত। উরদৃশের মারা গেছে চার দিন আগে। আমার দু'ব্যক্তি মাদায়েনের শাহী মহলে ছিল। সেখানে কড়াভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, যেন সৈন্যদেরকে কিসরার মৃত্যুর সংবাদ জানানো না হয়।" হযরত খালিদ (রা.) দু'হাত আসমান পানে তোলেন। আমার মাওলা!" তিনি বলতে থাকেন "আপনার শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই। বিজয়ের গর্ব-অহংকার থেকে আমাকে দূরে রাখুন। পরওয়ারদেগার! সকল প্রশংসা আপনার। আপনিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত।হযরত খালিদ (রা.) হাত নীচে নামান এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেন "সমস্ত সৈন্যকে এ সংবাদ জানিয়ে দাও যে, পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েছে। আর এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র অনুগ্রহ। সবাইকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের ভীতি ও আতঙ্ক কিসরার প্রাণ হরণ করেছে।"

হযরত খালিদ (রা.) হযরত মুসান্না (রা.)কে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সামনে কোন শহর আছে কিনা জানতে চান।

"কিছুদূর পরেই ইরানের একটি বড় শহর আমিনিশিয়া আছে" হযরত মুসান্না বলেন "পারস্যের ফৌজ এখানে থাকার কারণে শহরটিকে বড় একটি সামরিক ঘাটি বলা যেতে পারে। শহরটি বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রও বটে। এর আশে-পাশের ভূখণ্ড অত্যন্ত উর্বর। বাণিজ্য তরি-তরকারি এবং বাগিচার ফল-মূলের কারণে আমিনিশিয়া শাহী শহর বলে খ্যাত। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। শহরের ফটকও ইস্পাতদৃঢ়। প্রাচীরের কাছে ভিড়তে চেষ্টা করলে তীরবৃষ্টি হয়।... জনাব খালিদ এই শহর পদানত করতে ব্যাপক জান-মালের কুরবানী দিতে হবে। আপনি এই শহর করায়ত্ত করতে পারলে মনে করবেন, শত্রুর একটি মোটা রগ আপনার হাতে মুষ্টিবদ্ধ।""এখনও সেখানে সৈন্য আছে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান– "যদি থাকে তাহলে তারা সংখ্যায় কত হবে?"

"যে পরিমাণ পূর্বে ছিল তেমনটি এখন নেই" হযরত মুসান্না (রা.) জবাবে বলেন "আমার জানা মতে উলাইয়িস যুদ্ধে এ শহর থেকেও কিছু সৈন্য নেয়া হয়েছিল।"

একটি ছোট নদী এঁকে-বেঁকে ফোরাত নদীতে গিয়ে মিলত। নদীটির নাম ছিল বাদকলি। এই নদীর সঙ্গমস্থলের উপকূলে অমিনিশিয়া শহরটি অবস্থিত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) মর্মে মর্মে অনুধাবন করেন যে, তাঁর প্রতিটি অগ্রবর্তী কদম পূর্ববর্তী কদম থেকে কঠিন হয়ে উঠছে। তদুপরি তিনি নির্দেশ দেন যে, এখনই আমিনিশিয়া অভিমুখে মার্চ কর। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দানের পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ইরানীদের সামনে এগুবার সুযোগ না দেয়া।

॥ সতের ॥

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন। খালিদ বাহিনী এ দিনে উলাইয়িস থেকে রওনা হয়। মদীনার মুজাহিদগণ বিজয়ী ফৌজের মর্যাদায় অভিষিক্ত। পরবর্তী মঞ্জিল সবুজ-শ্যামলিমা এবং যথেষ্ট উর্বর ছিল। মানুষ এবং অশ্বের খাদ্যের কোন ঘাটতি ছিল না। তবে আমিনিশিয়ার প্রতিরক্ষার দিকটি হযরত খালিদ (রা.)কে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছিল।

শহরের প্রাচীর আর কেল্লাশৃঙ্গ নজরে আসতে থাকলে হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের থামার নির্দেশ দেন। হযরত মুসান্না (রা.) মূল বাহিনী থেকে আগেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি গেরিলা আক্রমণে অত্যন্ত পটু ছিলেন। অনুগত বাহিনীও তার সাথে সাথে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর কাঁধে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, যে কোন বেশে কিছু লোক আমিনিশিয়া পাঠিয়ে সেখানে কত সৈন্য আছে তা যেন জানতে চেষ্টা করে।

একটু পরেই হযরত মুসান্না (রা.) ফিরে আসেন।

"জনাব খালিদ!" তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন "আমার বিশ্বাস এটা ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে হয়, ইরানিরা সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে এখন থেকে ধোঁকা এবং প্রতারণামূলক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"আগে তো বল, তুমি কি দেখে এসেছ?" হযরত খালিদ (রা.) ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন "আর সে ধোঁকা কেমন, যা ইরানীরা আমাদের দিচ্ছে?"

"পুরো শহর ফাঁকা" হযরত মুসান্না (রা.) বলেন "শহরের ফটক উন্মুক্ত। কেল্লাশৃঙ্গ এবং প্রাচীরে একজনেরও পাত্তা নেই।"

"তোমার লোকেরা শহরের ভেতরে গিয়েছিল?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"না, জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না (রা.) জবাবে বলেন "তারা ফটক পর্যন্ত গিয়েছিল। শহর কবরস্থানের মত খাঁ খাঁ করছিল। তারা বলছে দরজা দিয়ে তারা কোন মানুষ কিংবা পশুর দেখা পায় নি।... আপনার মতে এটা কি প্রতারণা বা ফাঁদ নয়?"

"হ্যাঁ ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তোমার লোকদের ব্যাপারে আমি এই সন্দেহ করতে পারি না যে, তারা মিথ্যা বলছে। তারা স্বপ্ন না দেখে থাকলে আমাদেরকে সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে হবে।"

"খোদার কসম! তারা মিথ্যা বলার মত লোক নয়" হযরত মুসান্না (রা.) দৃঢ়তার সাথে বলেন "তাদের ঈমান এত দুর্বল হলে ইরানীদের জুলুম- নির্যাতন থেকে বাঁচতে তারা অনেক পূর্বেই ইসলাম ত্যাগ করত।... আর শুনে রাখুন জনাব খালিদ! সবার পূর্বে আমার লোকেরাই শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। যদি এটা ধোঁকা, ফাঁদ কিংবা প্রতারণা হয়ে থাকে তবে এর শিকার প্রথমে আমার লোকেরাই হবে। আপনার সৈন্যরা নিরাপদ থাকবে।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে অবহিত করেন যে, আমিনিশিয়া ফাঁকা; জনশুণ্য। এটা প্রতারণা হতে পারে।

"ধোঁকা এই ছাড়া আর কি হবে যে, শহরের ফটক খোলা দেখে আমরা তার মধ্যে ঢুকে পড়ব" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "সবাই ঢুকে পড়লে হঠাৎ দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর আমরা অবরুদ্ধ হয়ে যাব।...আমরা শীঘ্রই শহরে আক্রমণ করতে যাচ্ছি।... ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) হযরত মুসান্না (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন "তোমার বাহিনী মূল সৈন্যদের থেকে দূরে থাকবে। তোমার দৃষ্টি সর্বদা সৈন্যদের উপর থাকবে। দুশমন কোথাও হতে বের হয়ে এলে তোমার বাহিনী নিজেদের যোগ্যতানুযায়ী হামলা করবে। গেরিলা ধরনের আক্রমণ তারা করতেই থাকবে। তোমাকে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"

অবশিষ্ট সৈন্যকে তিনি তিনভাগে ভাগ করে ফেলেন। পূর্বের মত ডান এবং বাম বাহিনীর নেতৃত্বে হযরত আছেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)-কে রাখেন। তবে এবার তাদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন। শহরের দরজা খোলা থাকায় শহরের অভ্যন্তরে যাওয়া হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য জরুরী ছিল। হযরত আছেম (রা.)-কে তাঁর সাথে সাথেই থাকতে হয়। যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। হযরত আদী (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে কেল্লার চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখতে বলা হয়।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত এবং সকলের পজিশন ও দায়িত্ব বন্টন শেষে হযরত খালিদ (রা.) সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

* * *

তিনভাগে বিভক্ত বাহিনী একসাথে শহরের নিকট পর্যন্ত গিয়ে এরপরে সবাই পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। হযরত মুসান্নার জানবায সৈনিকেরা শহরের বাইরের এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছিল। পাশেই একটি বন ছিল। কিছু এলাকা ছিল খাঁ খাঁ প্রান্তর। হযরত মুসান্না (রা.) তার বাহিনীকেও কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এসব ক্ষুদ্র টিম ঐ সকল স্থান তল্লাশি করে ফেরে যেখানে শত্রুর লুকানোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কোথাও শত্রুর নাম-গন্ধ পাওয়া যায় নি। অতঃপর তারা দূর দূর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

সৈন্যদের তিনও অংশ শহরের প্রাচীরের নিকট পৌঁছলে সালার হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) তার বাহিনীকে শহরের চতুর্দিকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করান যে, শহরের লোকজন যেন বাইরে বেরিয়ে আসে। "শহরবাসী বেরিয়ে না এলে একটি ঘরও আস্ত রাখা হবে না। সব ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হবে।" "অগ্নিপূজারীরা ! বাঁচতে চাইলে বেরিয়ে এস।"

"সালারদের বল, তারা যেন কাপুরুষতার পরিচয় না দেয়।"

এভাবে একের পর এক ঘোষণা হতে থাকে। কিন্তু দরজার ওপাশে পূর্ববৎ নীরবতা বিরাজ করতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করেন। উচ্চ আওয়াজে বলেন, "আমার পিছনে পিছনে এস।" এরপর তিনি

ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। যে সমস্ত সৈন্য তাঁর সাথে ছিল তার বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মত শহরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সর্বাগ্রে অশ্বারোহী বাহিনী ছিল।

ভেতরে ঢুকেই ঘোড়াগুলো ছড়িয়ে পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) প্রতিটি ঘরে তল্লাশী চালাতে বলেন। তিনি নিজে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে যান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে থাকেন। তিনি সালার হযরত আছেম (রা.)-এর বরাবর এই পয়গাম দিয়ে দূত পাঠান যে, তিনি যেন নিজ বাহিনীকে ভিতরে নিয়ে আসে এবং পদাতিক তীরন্দাজদেরকে শহর প্রতিরক্ষা প্রাচীরে ছড়িয়ে দেন।

মুহূর্তে হযরত আছেম (রা.)-এর তীরন্দাজ ইউনিট সমস্ত প্রাচীরের উপর ছড়িয়ে যায়। তারা ভিতর-বাহির উভয় দিক খেয়াল রাখছিল। হযরত খালিদ (রা.) প্রাচীরের উপরে ওঠেন এবং শহরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে আসেন। শহরের অভ্যন্তরে নিজের সৈন্য ছাড়া অন্য কেউ তার নজরে আসেনা। বাইরে হযরত আদী (রা.)-এর বাহিনী পূর্ণ সতর্কাবস্থায় ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি যতদূর যায় শত্রুর কোন নাম-নিশানা তাঁর চোখে পড়ে না। বহু দূরে দু'তিন অশ্বারোহী দল তিনি দেখতে পান। তারা হযরত মুসান্নার বাহিনী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) উপর থেকে ভেতর বাহির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নীচে নেমে আসেন। এ সময় তাকে জানানো হয় যে, এক দুর্বল লোক একটি ঘরের খাটে শুয়ে কাতরাচ্ছে। হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত সে ঘরে গিয়ে হাজির হন। লোকটি ছিল অত্যন্ত বৃদ্ধ। তার চোখ আধা খোলা ছিল। মুখও খোলা। খাটে পড়ে থাকা লাশ মনে হচ্ছিল। তার আওয়াজ ছিল ফিসফিস। সে কিছু বলছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর এক দেহরক্ষীকে বৃদ্ধ লোকটির মুখের কাছে কান লাগিয়ে তার কথা শুনতে বলেন।

"যাদের ভয়ে শহর জনশূন্য তোমরা কি তারা?" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে।

"আমরা মুসলমান" দেহরক্ষী বলে।

"মদীনার মুসলমান? বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে এবং জবাবের অপেক্ষা না করেই বলতে থাকে "আমি এখানকার একজন ইহুদী। ধুকে ধুকে মরার জন্য তারা আমাকে এখানে রেখে গেছে। শহরের সবাই চলে গেছে।"

"কোথায় চলে গেছে?" দেহরক্ষীর প্রশ্ন।

"পালিয়ে গেছে" বৃদ্ধ বলে "সালার, সৈন্যরা পালিয়ে গেলে সাধারণ জনতা না পালিয়ে যাবে কোথায়? খালিদ বিন ওলীদ কি তোমাদের সেনাপতি?... এখানকার সবাই তাকে জিন এবং দৈত্য মনে করে।...হ্যাঁ, ঠিকই।... কিসরার শক্তিশালী ফৌজকে যে এভাবে পরাস্ত করতে পারে সে মানুষ হতে পারে না।" হযরত খালিদ (রা.) পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাকে বলেন না যে, যাকে তারা জিন বা দৈত্য মনে করে সে তার সামনে দাঁড়ানো। তিনি তথ্য সংগ্রহের পর তাকে দুধ পান করানোর নির্দেশ দেন।

"সৈন্যরা গেল কোথায়?" বৃদ্ধের কাছে জানতে চাওয়া হয়।

"সামনে হীরা নামে একটি শহর আছে" বৃদ্ধ জবাবে বলে "আমাদাবাহ তার শাসক। হয়ত সেই নির্দেশ দেয় যে, লোকজন যেন সব হীরায় চলে আসে।... আমাদের এই শহরের যুবকরা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিল। অধিকাংশ মারা গিয়েছে। যারা প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল তারা সবাই হীরা চলে গিয়েছিল। বৃদ্ধ, নারী এবং শিশুরা ছিল এখানে। এখানকার লোক খালিদ বিন ওলীদের নামে ভয়ে কম্পমান। পলায়নপর যুবকরা এই ভীতি আরো ব্যাপকতর করে। তারা বলত, মুসলমানরা রক্তের নদী বইয়ে দেয়। তারা এদিকেই এগিয়ে আসছে।... এরপর সবাই পালিয়ে যায়। কেউ এখানে থাকার সাহস করেনি। পালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি দাঁড়াতেও পারি না। তারা এখানে আমাকে মরার জন্য ফেলে রেখে গেছে।"

এই বৃদ্ধকে উটনীর দুধ পান করিয়ে নিজের অবস্থার উপর তাকে রেখে দেয়া হয়।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, পুরো শহর এভাবে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল যে, গৃহস্থালী আসবাবপত্র এবং মূল্যবান বস্ত্র-সামগ্রী ঘরেই পড়েছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ঘরের বাসিন্দারা ক্ষণিকের জন্য সদ্য কোথাও যেন গেছে। মানুষ পালানোর ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়ো করে যে, টাকা-পয়সা এবং সোনা-রূপাও ফেলে যায়।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে সমস্ত সৈন্যকে শহরে ডেকে পাঠানো হয় এবং তাদেরকে গণীমতের মাল সংগ্রহ করার অনুমতি দেয়া হয়। এটা যেহেতু আমীর শ্রেণীর লোকদের অধ্যুষিত শহর ছিল, তাই ঘরে ঘরে মূল্যবান সম্পদ এবং বস্ত্রের সম্ভার ছিল। মুজাহিদরা কিছু কিছু জিনিস দেখে রীতিমত অবাক হচ্ছিল। এ সকল দামী বস্ত্র তারা স্বদেশে নিয়ে যাবার আগ্রহ ব্যক্ত করতে থাকে।

মাল-সম্পদ জমা করা হলে হযরত খালিদ (রা.) অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে থাকনে।

"আগুনে জ্বালিয়ে দাও এসব বস্ত্র-সামগ্রী" হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দিয়ে বলেন "এগুলো ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও উপকরণ। এ সব সম্পদই মানুষকে কাপুরুষ বানায়। তাদের পরিণতি দেখ। তাদের মহল এবং ঘর-বাড়ী দেখ। খোদার কসম! আল্লাহ্ যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে ভোগ-বিলাসিতায় নিক্ষেপ করেন।...

আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।... এ সকল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। আর স্বর্ণ, হীরা অলঙ্কার, টাকা-পয়সা আলাদা জমা কর।"

আল্লামা তবারী (রহ.) বিশেষভাবে লিখেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) এ দিক লক্ষ্য করে মূল্যবান পাত্র, রেশমী কাপড় এবং শাসক শ্রেণীর গৃহস্থালীর আসবাবপত্র জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, যেন এ সকল বস্তুর আকর্ষণ সৈন্যদের মনে প্রভাব ফেলে তাদেরকে যুদ্ধ হতে বিরত না রাখে। তবারী ছাড়াও অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন যে, এই শহর থেকে যে পরিমাণ গণীমতের মাল পাওয়া যায় যা অন্য কোন স্থান থেকে এরপূর্বে অর্জিত হয় নাই। হযরত খালিদ (রা.) নিয়মানুযায়ী চার

অংশ সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেন। আর বাকী এক অংশ মদীনার বাইতুল মালের উদ্দেশে খলীফা হযরত আবুবকর (রা.)-এর বরাবর পাঠিয়ে দেন।

মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের সূত্রে লেখেন, মালে গণীমতের যে পঞ্চমাংশ মদীনায় প্রেরণ করা হয তার নেতৃত্বে ছিল আযাল গোত্রের যানদাল নামক এক ব্যক্তি। ইরানীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইতোপূর্বে তিন যুদ্ধে যে সকল ইরানী যুদ্ধবন্দী হয়েছিল মদীনায় প্রেরিত কাফেলায় তারাও ছিল। খলীফা হযরত আবুবকর (রা.) যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হতে এক রূপসী বাঁদীকে যান্দালকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন।

আল্লামা তবারী লেখেন, খলীফা মদীনার মুসলমানদেরকে মসজিদে ডেকে তাদেরকে হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে অর্জিত বিভিন্ন বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনান। তিনি বলেন "হে কুরাইশ জাতি! তোমাদের সিংহ আরেক সিংহের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে কুপোকাত করে ফেলেছে। এখন কোন নারী খালিদের মত সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম নয়।"

"জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না (রা.) হযরত খালিদ (রা.) কে সম্বোধন করে বলেন, "সামনে পারস্য সাম্রাজ্যের আরেকটি বড় শহর হীরা রয়েছে। এ শহরটি পারস্যের সত্যিকার 'হীরা' বলা যায়। কিন্তু এটা পদানত করা সহজ হবে না।"

"ঠিকই বলেছ ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমিনিশিয়ার সমস্ত সৈন্য এবং সকল ইহুদী যুবক হীরায় আশ্রয় নিয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে আমাদের মোকাবিলায় নেমে আসবে। আর তাদের আসাটাই স্বাভাবিক।... তা মাদায়েনের কি খবর?"

"আজই আমার এক গুপ্তচর ফিরে এসেছে" হযরত মুসান্না (রা.) বলেন "তার বর্ণনা কিসরার প্রাসাদে এখনও মাতম চলছে।... সুসংবাদ হলো এখন আর সেখান থেকে কোন বাহিনী আসবে না।"

"এরা কি এখনো অনুধাবন করতে পরিনি যে, সিংহাসন, রাজমুকুট এবং ধন-দৌলত এমন শক্তি নয়, যা শত্রুর হাত থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে?" হযরত খালিদ(রা.) বলেন "এটা কি আমাদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী নয় যে, এ সকল লোকের কানে আল্লাহ্র সত্য রাসূল (সা.)-এর এই বাণী পৌঁছে দেব যে, শক্তি এবং প্রাচুর্য কেবল আল্লাহর হাতে। ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ্ই। তাঁর কোন অংশীদার নেই।"

"হ্যাঁ জনাব খালিদ!" হযরত মুসান্না বলেন "আল্লাহর পয়গাম তাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

"এর সাথে সাথে আমি ঐ সম্ভাবনারও শিকড় উপড়ে ফেলতে চাই, যা ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "কুফরের মূলোৎপাটন আমাকে করতেই হবে।"

ইসলামী ইতিহাসের এই প্রাথমিক যুগটি বড়ই স্পর্শকাতর ছিল। ইসলামের সমরেতিহাসের ঐতিহাসিক ভিত্তি রচনার যুগ ছিল। এটি রাসূল (সা.)-এর প্রতি

উম্মতের প্রগাঢ় ভালবাসা ও তার গভীরতার নজির স্থাপনের সময় ছিল এটি। এ ইতিহাসের ভিত্তি এই অকাট্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যে, সংখ্যায় নগণ্য এবং শক্তির স্বল্পতা পরাজয়ের কারণ হতে পারে না। আদর্শিক চেতনা-প্রেরণা আর ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এই শূন্যতা পূরণ করতে পারে।

হযরত খালিদ (রা.) গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন এবং সূক্ষ্ম দূরদর্শীতার মাধ্যমে অনুধাবন করেন যে, তার সৈন্যদের স্বদেশ তথা মদীনা হতে ক্রমে দূরে সরে পড়া, প্রতিটি যুদ্ধের পর সৈন্যের হ্রাস এবং একের পর এক লড়াইয়ে সৈন্যদের ক্লান্তি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে তাদের নিয়ে লড়াই অব্যাহত রেখেছেন এটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলন্ত ইতিহাস ও নজির হয়ে রবে। অভিযানের মাঝপথে সমস্যা দেখা দিলে কিংবা লৌহবৎ প্রাচীর সম অন্ত রায়ের সম্মুখীন হলে সেনাপতি তার বাহিনীকে ফেরৎ আনবে। হযরত খালিদ (রা.) এমন দৃষ্টান্ত, ইতিহাস ও নজির সৃষ্টি করতে চান না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সপক্ষে খেলাফতের পূর্ণ সমর্থন এবং সার্বিক সহযোগিতা ছিল। তৎকালীন যুগের রাষ্ট্রীয় পলিসিতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব কিংবা সমঝোতার কোনই অবকাশ ছিল না। শত্রুকে শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করা হত। শত্রু কত দূরে এবং কত শক্তিশালী তা মোটেও বিবেচ্য ছিল না। একমাত্র মৌলনীতি এটাই ছিল যে, দুশমনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড় এবং তার জন্য ত্রাস ও আতঙ্ক হয়ে যাও।

পারস্য সাম্রাজ্য কোন যেনতেন শক্তি ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) এই বিশাল শক্তির পেটে গিয়েও পিছু হটার কল্পনা করেননি। তিনি এটাও বিবেচনায় আনেননি যে, সৈন্যদেরকে একটু বিশ্রামের সুযোগ দিবেন এবং তাদের শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতায় কোন ক্রুটি দেখা দিলে তা দূর করবেন। হযরত মুসান্না (রা.) তাঁকে হীরায় মোকাবিলা বড় কঠিন হবে জানালেও হযরত খালিদ (রা.) নিজের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার চিন্তা মাথায় আনেননি। এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সালারদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে তাদের ডেকে পাঠান।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) সালারদের বলেন "আমার বিশ্বাস তোমরা এ চিন্তা করছ না যে, আমরা যতই অগ্রসর হচ্ছি আমাদের বিপদ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"না জনাব খালিদ!" এক সালার বলেন "আমাদের কেউ এমনটি চিন্তা করছে না।"

"আর আমাদের কেউ এমনটি চিন্তাও করবে না" অপর সালার বলেন।

"আমার এ বিশ্বাস আছে যে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তোমাদের কেউ এ চিন্তা করবে না যে, না জানি শত্রু কত শক্তিশালী।"

"না জনাব খালিদ!" সালার হযরত আছেম (রা.) বলেন "আপনি খুলে বলুন তো, আজ এমন কথা কেন বলছেন?"

"তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত হোক!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল বড়ই দুস্তর। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, আমাদের মধ্য হতে কে জীবিত থাকবে আর কে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। মনে মনে কল্পনা কর যে, নিজ জিম্মাদারী পালন না করে আল্লাহর সামনে গেলে তোমাদের ঠিকানা বড়ই খারাপ হবে।

তোমরা ভাল করেই জান যে, সেই ঠিকানা কি এবং কেমন। যে দৃষ্টান্ত আজ তোমরা রেখে যাবে তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচ্য হবে। আর এই দৃষ্টান্ত ইসলামের অস্তিত্ব সুরক্ষা কিংবা ধ্বংসের কারণ হবে। ইসলামের স্থায়িত্ব এবং তাকে চিরসমুন্নত রাখতে আমাদের লড়তে হবে। কুরআনের নির্দেশ স্মরণ কর, কুফরী ফিৎনা জগতে বিদ্যমান থাকা নাগাদ তোমরা অবিরত লড়তে থাক। আর শত্রু যখন অস্ত্র সমর্পণ করে তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তখন তাদের ক্ষমা করবে। অতঃপর তাদেরকে এমন কঠিন শর্ত পালনে বাধ্য কর, যাতে সে আর ছোবল দিতে না পারে এবং তার অন্তর আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রেমিকদের ভয়ে কাঁপতে থাকে।" সালারদের প্রেরণা নতুনভাবে চাঙ্গা করে হযরত খালিদ (রা.) তাদের বলেন যে, সামনে ইরানীদের একটি বড় সামরিক ঘাটি রয়েছে। এর নাম হীরা। এখানকার শাসক আযাদবাহ প্রচুর সৈন্য সমবেত করে রেখেছে। ইরানীরা প্রথম যুদ্ধে অসংখ্য নৌযান নিয়ে এসেছিল। সেগুলো বর্তমানে মুসলমানদের অধিকারে আছে। হযরত খালিদ (রা.) এ সকল নৌযানে করে মুজাহিদদেরকে হীরায় নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। পানিপথ তুলনামূলক সহজ, নিরাপদ ও নিকটবর্তী ছিল। এটাই ছিল সর্বপ্রথম যুদ্ধ যে যুদ্ধে মরুভূমির সিংহরা দরিয়ার পিঠে সওয়ার হয়।

নৌযানে আরোহিত সৈন্যদের হেফাজতের জন্য হযরত খালিদ (রা.) এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে, নদীর উভয় তীর ধরে একশ থেকে দেড়শ অশ্বারোহীর ব্যবস্থা রাখেন। তারা গার্ড দিয়ে নৌচারীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিবে। বিজয়ে উন্মাদ সৈন্যরা উজ্জীবিত প্রেরণা এবং ইসলামের ভালবাসার টানে ফোরাত নদীর বুকে চেপে চলছিল। রণসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ছিল যা ফোরাতের লহরের তালে তালে ভাব-বিহলতা সৃষ্টি করছিল। পরে এই সঙ্গীত কালেমা তৈয়্যেবায় বদলে যায়। ১৮ হাজার মুসলমানদের এক আওয়াজ, এক অভিলাষ এবং একই প্রেরণা ছিল। তাদের অন্তরে এক আল্লাহ্‌ এবং এক রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা আর প্রেম ছিল।

শত্রু ঘুমিয়ে ছিল না। হীরার শাসনকর্তা আযাদাবাহ রাতেও নিদ্রা যেত না। সম্রাট উরদূশেরের মৃত্যুর খবর হীরায় জানানো হয় না। সে এখনও প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি নির্দেশ দিতে গিয়ে উরদূশেরের নাম উচ্চারণ করত।

একদিন আযাদাবাহ শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। সে শহরের হাজার হাজার সৈন্য সমবেত করেছিল। সে ঘুরতে ঘুরতে যে দলের সামনে যেত তাদেরকে জোরে জোরে বলত "যরথুস্ত্রের কৃপা হোক তোমাদের

প্রতি! যারা কাজিমা, মাজার এবং উলাইয়িসে মরু বুদ্দুদের হাতে পরাস্ত হয়েছে তারা কাপুরুষ ছিল। তাদের মৃত দেহ যরথুস্ত্রের অগ্নিশিখা চাটছে।... হে ঈসা-মসীহের অনুসারীরা। তোমারা আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে এসেছ। স্মরণ কর, তোমাদের ঐ কন্যাদের কথা যারা বাঁদী হয়ে মদীনায় পৌঁছে গেছে। স্মরণ কর ঐ যুবক পুত্রদের, যাদের মরদেহের গোশত নেকড়ে, শিয়াল এবং চিল-শকুন খেয়ে উদরপূর্তি করেছে। যারা বন্দী হয়ে মদীনাবাসীর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের কথাও আজ বিশেষভাবে স্মরণ কর।... মুসলমানরা বিজয়ের নেশায় নির্ভীকভাবে এগিয়ে আসছে। তাদের জন্য এমন ভয়ঙ্কর বিপদে পরিণত হও। যেন তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। মহান সম্রাট উরদূশের নিজেই তোমাদের মোবারকবাদ দিতে আসবেন। তিনি তোমাদেরকে পুরষ্কার ও সম্মানে ভূষিত করবেন।"

শহর প্রতিরক্ষা প্রাচীর ও তার শৃঙ্গ পরিদর্শনের এক পর্যায়ে সে দূর থেকে এক অশ্বারোহীকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসতে দেখে। "দরজা খুলে দাও" আযাদাবাহ চিৎকার করে বলে "এই অশ্বারোহী আমিনিশিয়ার দিক থেকে আসছে।" একসাথে একাধিক আওয়াজ ওঠে "দরজা খুলে দাও, অশ্বারোহীকে ভেতরে আসতে দাও।" আযাদাবাহ অত্যন্ত দ্রুত প্রাচীর থেকে নেমে আসে। অশ্বারোহী পৌঁছার পূর্বেই নগরদ্বার খুলে দেয়া হয়। অশ্বারোহী গতি শ্লথ না করেই ভেতরে প্রবেশ করে। আযাদাবাহ ঘোড়ার পিঠে ছিল। সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় এবং আগত অশ্বারোহীর দিকে এগিয়ে যায়। উভয় ঘোড়া পাশাপাশি এসে থেমে যায়।

"কোন খবর আছে?" আযাদাবাহ উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

"তারা আসছে" অশ্বারোহী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে "সমস্ত সৈন্য নৌযানে চড়ে আসছে।"

অশ্বারোহী হযরত খালিদ বাহিনীর আগমনের খবর দিচ্ছিল।

"নৌযানে?" আযাদাবাহ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে "বাঁধ থেকে কত দূরে?"

"অনেক দূরে" অশ্বারোহী জানায় "এখন পর্যন্ত অনেক দূরে আছে তারা।" আযাদাহবার ছেলে সালার ছিল। সে ছেলেকে ডেকে পাঠায়। ছেলের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 'আযাদাহবার ছেলে' বলে ইতিহাসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"আজ তোমার পরীক্ষার দিন প্রিয় বৎস!" আযাদাবাহ ছেলেকে বলে "এক অশ্বারোহী বাহিনী সাথে নিয়ে তুফানের চেয়েও দ্রুত গতিতে বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাও এবং সেখানে গিয়ে ফোরাতের পানি এমনভাবে চুষে নিবে যাতে ফোরাত শুকিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী নৌযানে করে আসছে। দেখব তুমি সেখানে প্রথমে পৌঁছাও নাকি মুসলমানরা!"

তার ছেলে এক অশ্বারোহী ইউনিট নিয়ে ঝড়ের বেগে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

* * *

হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী বেশ দ্রুত গতিতেই আসছিল। বর্ষার মৌসুম না হওয়ায় নদীতে পানি তুলনামূলক কমই ছিল। তবে নৌযান চলার জন্য যথেষ্ট ছিল। আকস্মিক পানি কমতে শুরু করে। পানি কমতে কমতে এক সময় পূর্ণ শুকিয়ে যায় এবং সকল নৌযান কাঁদায় আটকে যায়। মদীনার মুজাহিদরা এতে শংকিত হয়ে পড়ে। চোখের সামনে এভাবে হঠাৎ করে নদী শুকিয়ে যাওয়া উদ্বেগজনক ব্যাপারই ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন।

"মোটেও ঘাবড়াবেন না জনাব খালিদ!" কূল থেকে হযরত মুসান্না (রা.)-এর আওয়াজ শোনা যায়। "মদীনাবাসী তোমরাও ভীত হয়ো না। নদীর অদূরে একটি বাঁধ আছে। আমাদের শত্রুরা বাঁধের সাহায্যে পানি আটকে রেখেছে।"

খুবই দ্রুত গতিতে নৌযানের আরোহীরা নৌযান থেকে ঘোড়া বের করে এবং একটি অশ্বারোহী দল জলদি বাঁধ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। আযাদাবাহর ছেলে তখনও তার বাহিনীর সাথে সেখানে ছিল। মুসলিম অশ্বারোহী দল তাদের উপর একযোগে চড়াও হয় এবং একজনকেও জিন্দা রাখে না।

শত্রু নিধন শেষে মুসলমানরা পানির বাঁধ খুলে দেয়।

নৌযান পর্যন্ত পানি পৌছে গেলে নৌযানগুলো কাদামুক্ত হতে থাকে। মাঝি মাল্লারা হাল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। নৌযান ভাসতে এবং সাতরাতে থাকে।

আযাদাবাহ সুসংবাদের অপেক্ষায় প্রাচীরে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠছিল। তার এক সালার মাথা নীচু করে নিকটে এসে দাঁড়ায়।

"বড়ই দুঃসংবাদ এসেছে" সালার বলে।

"কোথা হতে" আযাদাবাহ হতচকিয়ে প্রশ্ন করে "তবে কি আমার পুত্র... ।"

"মাদায়েন থেকে" সালার তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে "সম্রাট উরদূশের মারা গেছে। তবে এই খবর গোপন রাখতে হবে। সৈন্যদের জানানো যাবে না।"

ইতোমধ্যে এক অশ্বারোহী তাদের নিকটে আসে এবং ঘোড়া হতে নেমে নিয়মতান্ত্রিক শিষ্টাচার পর্ব শেষ করে।

"কর্তব্য না হলে আনীত সংবাদ মুখে উচ্চারণ করতাম না" আগন্তুক আরোহী বলে।

"আমি তা শুনেছি" আযাদাবাহ বলে "কিসরা উরদূশের... ।"

"না" অশ্বারোহী বলে "আমি এ খবর আনিনি। আমি যে মর্মান্তিক খবর এনেছি তা হলো, আপনার পুত্র বাঁধের ওখানে নিহত হয়েছে। তার সহযাত্রী সকল অশ্বারোহী মুসলমানদের হাতে নির্মমভাবে মারা গেছে।"

"আমার পুত্র!" আযাদাবাহর কম্পিত ঠোঁট থেকে এ শব্দ বের হয় এবং তার চেহারা লাশের মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

অন্তত একবার পড়ুন

ইতিহাস মূক। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা – ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুড়িতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর-কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) যে সকল রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে তা গুরুত্বের সাথে ট্রেনিং দেয়া হয়।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।

যে ধাঁচে এ বীরত্বগাথা রচিত, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী-নির্ভর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত না। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে ঐতিহাসিকতার পথ্য গলধঃকরণ করবেন যেখানে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত কথা। পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির শক্তিমত্তা জানবেন, সাহিত্যরস উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারে প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্য-উদ্বুদ্ধ উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান

ফোন # ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫